হলুদ পাতার সবুজ শির

শচীন্দ্রনাথ মিত্র

বাক্‌ সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, [illegible]–৯

প্রথম প্রকাশ :
শুভ-বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্ সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক : শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য: পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

···নিয়তি কেন বাধ্যতে ?

বুদ্ধিজীবীর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক অস্থির হয়ে ওঠে।

কিন্তু, পুরুষাকার !

আত্মজিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর খুঁজে না-পেয়ে, দিব্যেন্দু বিভ্রান্তের মতো তাকায় পূর্বাকাশের দিকে ! কিন্তু, জ্বলজ্বলে শুকতারাটা তাকে কোন ভরসাই দিতে পারে না !—নিজেই যে নির্বাণোন্মুখ সে কি কোন আশার আলো জ্বালাতে পারে উদ্‌ভ্রান্তের মনে ! অথচ—

এই তো সেদিনের কথা !

শিখ পাঞ্জাবী অধ্যুষিত এই বিরাট বাড়িটার মধ্যে অঞ্জলি তখন বাস করতো, কতকটা ভীরু আশ্রম বালিকাটির মতো। বিবাহিত জীবনে সে তখন ছিল বিপ্লবী স্বামীর সনিষ্ঠ সহধর্মিণী। কিন্তু, পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেরা যখন মদ টেনে হুটোপাটি করতো, তখন, আতঙ্কের যেন আর সীমা থাকত না তার। তারা যখন মছলীখোর বাঙালী জাতটার কেচ্ছা কীর্তন শুরু করতো সরবে, তখন বর্তমানের কথা বিস্মৃত হয়ে, ঠিক সেকেলে মেয়ের মতোই সে কান বাঁচাতো ঘরের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে। বিভূতি মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে রাত করতো তার অফিস ইউনিয়নের কাজের জন্য। তখন, অঞ্জলির অবস্থা হতো ডাঙায় তোলা মাছটির মতো। তখন সে আন্তর্জাতিক আত্মীয়তার আদর্শ ভুলে গিয়ে ছটফট করতো বাঙালীর —রিক পরিবেশ ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায়। তাই, দিব্যেন্দু

কিন্তু,

যাচক হয়ে আলাপ করেছিল তার সঙ্গে। সেদিন-ও ছবির মতো ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।

প্রথম কয়েকদিন, অঞ্জলি তো বুঝতেই পারেনি যে সে বাঙালী! অবশ্য, সাধারণ বাঙালীর তুলনায় সে একটু বেশী লম্বা। অধিকন্তু, নিয়মিত প্যারালাল বার্ আর বারবেল করার ফলে, পেশীগুলোও তার হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। এ ছাড়া, তার পরনের শেরওয়ানী কুর্তা, মুখে রাজস্থানী বুলি আর শিখ প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখে, অঞ্জলির সন্দেহ করা অযৌক্তিক হয়নি—দাড়ি কামানো লোকটা শিখ না হলেও, পাঞ্জাবী নিশ্চয়ই। কিন্তু, ভুলটা ভাঙল একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে।

অঞ্জলিদের ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই তেতলায় ওঠবার সিঁড়ি। যাতায়াতের পথে প্রায়ই ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেত দিব্যেন্দুর। সেদিন আচম্কা ওর পথরোধ করে দাঁড়াল বিভূতি। চড়া গলায় বলল, এই ঠাড়ো—

—আঃ, কি করছো! পেছন থেকে অঞ্জলি বলল, ওদের তুলনায় এ লোকটা ঢের ভদ্র। এ নিশ্চয়ই চুরি করেনি—

—তুমি থামতো। বিভূতি ধমক দিয়ে বলল, এই জাম্বুবান-গুলোকে আমি ঢের বেশী চিনি। এ বেটাদের অসাধ্য কম্মো আছে নাকি কিছু!

—আপনার একটু ভুল হচ্ছে। দিব্যেন্দু অগত্যা বলে ফেলল, আমি পাঞ্জাবীও নই, জাম্বুবানও নই।

—ও মা! অঞ্জলি হকচকিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে পালাল।

—আপনাদের কিছু চুরি গেছে নাকি?

বিভূতিও ভড়কে গিয়েছিল। ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল।

—আমার জন্যে যদি কিছু অসুবিধে বোধ করেন, বলবেন। সুরাহার চেষ্টা করবো।—বলে, দিব্যেন্দু চলে গেল।

পরদিন দুপুর বেলায় সে তার মিনিয়েচার ল্যাবরেটরিটার তদারক করছিল—খিদমদ খাটছিল তার নেপালী কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড বাহাদুর। হঠাৎ টোকা পড়ল সিঁড়ির দরজায়।

—বোধহয়, গ্যাস কোম্পানির লোক এসেছে কনেক্শান দিতে।
—দিব্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে দিতে বলল বাহাদুরকে।

বাহাদুর বেরিয়ে গেল। ফিরে এল অঞ্জলিকে সঙ্গে করে।

দিব্যেন্দু এতখানি আশা করেনি। ভদ্রতা ভুলে চেয়ে রইল আশ্চর্য হয়ে।

অঞ্জলি কুন্ঠিতভাবে একটু হাসল। বলল, আমি এলাম আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে। আপনি যে বাঙালী, আমরা তা বুঝতেই পারিনি।

—না না, তাতে কি হয়েছে! দিব্যেন্দু ভদ্রতা করে একটা টুল এগিয়ে দিল।

অঞ্জলি বসল। তারপর ঘরের অবস্থা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বুঝি সায়েন্টিস্ট?

—না তো।

—না? অঞ্জলি একটু আশ্চর্য হয়ে সামনের টেবিলটার দিকে তাকাল। সেখানে অনেক রকমের যন্ত্রপাতি সাজান ছিল। বলল, তবে? ডাক্তার?

—না, ডাক্তার নই। দিব্যেন্দু যেন একটু কুন্ঠিতভাবেই বলল, দু'একটা ওষুধ তৈরি করবার চেষ্টা করছি, তারই সরঞ্জাম ওগুলো।

—ওঃ, আপনি তাহলে কেমিস্ট! কোথায় চাকরি করেন?

সদ্য পরিচিতের সম্বন্ধে এতখানি কৌতূহল, বিশেষতঃ একজন মহিলার পক্ষে, দিব্যেন্দুকে একটু বিস্মিত করল। বলল, আমি তো কারুর নোক্‌রী করি না।

অঞ্জলি আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, তবে? চাকরি করেন না তো কি করেন?

দিব্যেন্দু বুঝিয়ে বলল, ভাল দাম পেলে ফরমূলা বেচে দি।

ব্যাপারটা যে অঞ্জলি ঠিক বুঝতে পারল, তা তার মুখ দেখে মনে হলো না; কিন্তু, এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না সে!

ল্যাবরেটরি-য়্যাপারেটার্সগুলোর ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে আবার বলল, আপনাকে কিন্তু মোটেই বাঙালী বলে মনে হয় না।

দিব্যেন্দু একটু হাসল। বলল, ওটা বোধহয় জলহাওয়ার দোষ! আমরা রাজপুতানায় থাকতাম কি না!

—তাই নাকি? কোথায় থাকতেন?

দিব্যেন্দু একটা নেটিভ স্টেটের নাম করল।

শুনে, অঞ্জলি অবাক হয়ে চেয়ে রইল মিনিটখানেক। তারপর মুখ নীচু করে টেবিলের তলাটা দেখতে দেখতে বলল, সেইখানেই নিবাস?

দিব্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল, সেখানে নিবাস হতে যাবে কেন? ওখানে গিয়েছিলেন আমার বাবা, কর্মসূত্রে।

অঞ্জলি মুখ তুলল না। নজরটা টেবিলের তলাতে রেখেই আস্তে আস্তে বলল, আপনার বাবা কি করেন সেখানে?

দিব্যেন্দু বলল, করেন নয়, করতেন। প্রথমে গিয়েছিলেন তিনি মহারাজার সভাপণ্ডিত হয়ে; পরে এস্টেটের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন!

—ওঃ! অঞ্জলি আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। মুখ তুলে তাকিয়ে রইল একটা পেতলের দাঁড়ি-পাল্লার দিকে।

—আমার পরিচয় তো সব জেনে নিলেন—দিব্যেন্দু সহাস্যে বলল, নিজের কথা তো কিছু বললেন না!

—আমার পরিচয়! অঞ্জলির ফরসা মুখখানা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দেবার মতো পরিচয় তো আমার কিছু নেই। আচ্ছা—

—বলুন?

—আপনার ছাদে যদি কাপড় শুখতে দি, অসুবিধে হবে?

—দেবেন। অসুবিধে হলে আপনাকে জানাব।

—ধন্যবাদ। নমস্কার।

—নমস্কার।

নমস্কার পর্বটা কিন্তু ওই একদিনেই শেষ হয়ে গেল। পরদিন ভোরে আবার যখন দুজনের দেখা হলো তখন নমস্কার করবার মতো অবস্থা কারুরই ছিল না। অঞ্জলির দু'হাত জোড়া ছিল ভিজে সায়া-শাড়ি-ব্লাউজে ; আর দিব্যেন্দু তখন অধোমুখে পিকক্ হয়েছিল তার বেতের তৈরি প্যারালাল বারটার ওপরে।

পরের দিনও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। তার পরের দিনও—

অঞ্জলি ছাদে আসত ভিজে সায়া-শাড়ি মেলে দেবার জন্যে, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে লক্ষ্য করতো দিব্যেন্দুর বিরাট ছাতি আর অতি আকর্ষণীয় পেশীগুলোর দিকে।

দিব্যেন্দুরও বেশ মজা লাগত অঞ্জলির অবস্থা দেখে। সত্যি কথা বলতে কি, দৈনন্দিন মেহনত করার একঘেয়েমি কেটে যেত তার। বারের ওপর কসরত করতে করতে সে-ও আড়চোখে লক্ষ্য করতো অঞ্জলির চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি, স্মিত মুখের সলজ্জ হাসি। শেষ পর্যন্ত, ওই সলজ্জ হাসিটাই একদিন সংক্রামিত করল তাকে।

সেদিন কসরত থামিয়ে, সংকুচিতভাবে এগিয়ে এল সে অঞ্জলির কাছে। তারপর অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলল, দেখুন, আমি সত্যিই লজ্জিত। কিন্তু, কী করবো, বেশী জামা-কাপড় গায়ে জড়িয়ে কসরত করা যায় না—

—ও মা' অঞ্জলি আশ্চর্য হয়ে বলল, এতে লজ্জা পাবার কি আছে—

—মানে, আমার এই জাঙ্গিয়া-পরা চেহারাটা দেখে, আপনি লজ্জা পাচ্ছেন না তো ?

—কি সর্বনাশ ! অঞ্জলি হেসে উঠল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

বলল, সত্যি, কি মানুষ আপনি। আমার লজ্জার কথা ভেবে আপনি লজ্জিত হচ্ছিলেন!

—তবে হাসেন কেন?

—হাসি? কই, কখন হাসলাম আমি?

—ওই তো মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

—যাঃ,—অঞ্জলি চোখ-মুখ লাল করে বলল, কি দেখতে কি দেখেছেন আপনি! আমি হাসতে যাব কেন?

—বাঃ আমি দেখলাম যে—

—আপনি ভুল দেখেছেন! এখন যান তো—কসরত বন্ধ করে গল্প করতে নেই!—অঞ্জলি ভুরু কুঁচকে, যেন ধমক দিল দিব্যেন্দুকে!

অঞ্জলির মুখের সেই অপরূপ…ধমক, আরও উৎসাহিত করে তুলল দিব্যেন্দুকে, কর্তব্যকর্মে অবহেলা করতে। উৎসাহিত হয়ে সে বলতে গেল—

কিন্তু, বলা হলো না; অঞ্জলি চট করে চলে গেল ছাদ থেকে। দিব্যেন্দুও তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নেমে গেল একতলায়। সেখানে তখন সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এ বাড়ির নতুন বাড়িওয়ালা, ক্রোড়পতি ভগবানদাস ভকৎ এসেছিলেন বাড়ির পুরোন নাম মুছে ফেলে নতুন নামকরণ করতে। সঙ্গে এসেছিল তাঁর অসংখ্য কর্মচারী। মালিককে সামনে রেখে তারা তৎপরতার সঙ্গে কার্যোদ্ধার করে ফেলল। একজন শিখাধারী অবাঙালী ব্রাহ্মণ সাড়ম্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন পুষ্পচন্দন ছিটিয়ে। তারপরই একজন রাজমিস্ত্রী কুড়ুলের এক ঘায়ে চুরমার করে ফেলল পুরোন ট্যাবলেটটা।

নতুন ট্যাবলেটটা ছিল অবিকল পুরোনটার মাপে। সনকা-সদনকে হনুমান হাউসে রূপান্তরিত করতে সময় লাগল মাত্র কয়েক মিনিট।

ভগবানবাবু তাঁর গাড়িতেই বসেছিলেন; ভিড়ের মধ্যে দিব্যেন্দুকে দেখেই ডেকে নিলেন কাছে। বললেন, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্, আমাকে আর সিঁড়ি ভাঙতে হলো না।

দিব্যেন্দু হেসে বলল, সিঁড়ি ভাঙতে আজকাল কষ্ট হয় নাকি ?

ভগবানবাবু বললেন, হয় না ? বয়সটা বাড়ছে না কমছে হে ? যাক্‌, বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথাটা চট করে সেরে নাও ; আমাকে আবার বম্বে যেতে হবে আজ দুপুরে। কি ঠিক করলে ? এ বাড়িতে পোষাবে তোমার ? না, অন্য কোথাও খোঁজ-খবর করাবো !

—পোষাবে।

—ঠিক করে বলো বাপু ! বাড়িটার কেচ্ছা সব শুনেছ তো ?

—শুনেছি। আপনি আমার জন্যে আর নতুন বাড়ির খোঁজ-খবর করাবেন না ; এখানে চমৎকার লাগছে আমার।

—ভেবে-চিন্তে বলো বাপু। মনে রেখ, একতলায় এখনও বেশ্যা বাস করে ; দোতলার শিখগুলোও···

—আপনি কেন ভাবছেন ! আমি কি কচি খোকা ? সব দিক ভাল করে ভেবেই আপনাকে আমি বলছি—চমৎকার আছি আমি এখানে।

—দ্যাটস্‌ রাইট ! বৈজু—

একজন যুবক ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে। ভগবানবাবু বললেন, সেই বাঙালীটাকে ডেকে আন তো—

—কাকে ?

—সেই যে পীয়ারসন কোম্পানির বড়বাবুর লোক—খাতির জমায় একটা ফ্ল্যাট আদায় করে নিলে মাস দুয়েক আগে—

—ওঃ। বৈজুকে আর বাড়ির ভেতর যেতে হলো না ; বিভূতিকে ভিড়ের মধ্যেই পেয়ে গেল।

—নমস্কার মশাই ! বিভূতিকে আপ্যায়িত করে ভগবানবাবু বললেন, হনুমান হাউসে আপনিই হচ্ছেন একমাত্র বাঙালী ভাড়াটে, আমার এই ভাইটির দিকে একটু নজর রাখবেন দয়া করে। এও বাঙালী।

একটা নগণ্য বাঙালী ভাড়াটে ক্রোড়পতি মাড়োয়াড়ির ভাই

হতে পারে কি করে—বুঝতে না পেরে বিভূতি অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ভগবানবাবু আবার আরম্ভ করলেন, কি মশাই, ঘাবড়ে গেলেন কেন? বাঙালীকে বাঙালী না দেখলে আর কে দেখবে বলুন?

—আঃ কি হচ্ছে! দিব্যেন্দু বাধা দিয়ে বলল, ওঁদের সঙ্গে আমার আলাপ-খাতির সব হয়ে গেছে—

—হয়ে গেছে? তবে তো সবই ঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা, মেনি মোর থ্যাঙ্কস্ মশাই, নমস্কার!

পঞ্জিকা মতে দিনটা ছিল শুভদিন। তাই, সনকা সদন রূপান্তরিত হয়ে গেল হনুমান হাউস এ। সামনের রাস্তার নামটাও নামান্তরিত হয়েছিল কয়েক মাস আগে। আগে ছিল আট ফুট চওড়া কানা গলি—সনকা দাসীর গলি। এখন হয়েছে ষোল ফুট চওড়া দু'দিক খোলা রোড। নাম বহন করছে, জনৈক ভূতপূর্ব ইংরাজ-সেবী ও পরবর্তী কালের স্বর্গত দেশপ্রেমিকের। রাস্তার ওপরে আধুনিক ফ্যাশানের বাড়ি একটিও নেই। সবগুলিই দোতলা। সবগুলিই সাক্ষ্য বহন করছে সাবেক আমলের।

এর মধ্যে রূপান্তরের সম্মুখীন হয়েছে তিনখানা পাশাপাশি দোতলা। পাশের দুটো মাঝারি, কিন্তু মাঝেরটা প্রকাণ্ড। আগে নাম ছিল মেনকা-ভবন, সনকা-সদন ও জ্ঞানদা স্মৃতি। বর্তমানে নামান্তরিত হয়েছে, যথাক্রমে, স্বরাজ-ভবন, হনুমান হাউস ও রামচন্দ্র নিকেতন-এ। তিনখানা বাড়িরই বর্তমান মালিক ভগবানবাবু। পাশের দু'খানার নামকরণ করেছেন নিজের ছেলেদুটির নামে। মাঝেরটা উৎসর্গ করেছেন স্বর্গত পিতৃদেব হনুমানদাসের উদ্দেশে।

বিশেষত্ব আছে হনুমান হাউস-এর। বাইরে থেকে ঠিক বোঝা যায় না; কিন্তু, ভেতরে ঢুকলেই জানা যায়, বাড়িটা একেলে নয়, নিতান্তই সেকেলে। আধুনিক পদ্ধতিতে ফ্ল্যাট বাড়িতে রূপান্তরিত

করা হলেও, বাড়ির সত্যি পরিচয়টাকে একেবারে গোপন করে ফেলা সম্ভবপর হয়নি বর্তমান বাড়িওয়ালার পক্ষে।

হনুমান হাউস সেকালের তৈরি চৌবন্দী দোতলা, কিন্তু আলো-বাতাসহীন হারেম নয়। পূর্বদিকে প্রকাণ্ড সাঁতরা পার্ক। দক্ষিণে রামচন্দ্র নিকেতনের ঠিক পরেই প্রশস্ত ট্রাম-রাস্তা, সাঁতরা রোড। উত্তর-পশ্চিমে আগে ছিল ধাঙড় বস্তি ; এখন গড়ে উঠছে বাজার আর আন্তঃপ্রাদেশিক অভিনব ফ্ল্যাট। অধিকন্তু, তিনখানা বাড়ির মধ্যেই জমি ছাড়া আছে অনেকখানি করে। জমিটা কর্পোরেশানের জবরদস্ত প্যালার অন্তর্গত নয়, বাড়িওয়ালারই সম্পত্তি।

সেকালের শুরকি গাঁথুনির দোতলা। একতলার ভিতের আয়তন ছত্রিশ ইঞ্চিরও বেশী। দেখে দিব্যেন্দুর সৃষ্টিছাড়া মন কেমন যেন খুঁতখুঁত করে। অকারণেই, অনেকখানি সময় নষ্ট করে ফেলে সে এ বাড়ির ভূতপূর্বা মালিকানীর কথা ভেবে। ছত্রিশ ইঞ্চি ভিত তৈরি করেছিলেন তিনি, অবশ্যই স্থায়িত্বের কথা ভেবেই। রূপান্তরিত এবং নামান্তরিত হলেও, বাড়িখানার অস্তিত্ব আজও অটুট আছে বটে, কিন্তু যাদের জন্যে এই নিরেট ভিতের বিরাট বাড়ি তৈরি করেছিলেন তিনি, তারা গেল কোথায়! সনকা দাসী কি তখন কল্পনাও করতে পেরেছিলেন, দেশ একদিন স্বাধীন হবে এবং স্বাধীন দেশের প্রগতিশীল শাসকদের ইচ্ছায় একদিন অবৈধ হয়ে যাবে তাঁর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব, ঝাড়ে-বংশে।

কোথায় যেন একটু লাগে! ইচ্ছা সত্ত্বেও চিন্তাটাকে এড়িয়ে যেতে পারে না সে। ওদের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সে ভগবানবাবুর কাছ থেকে। সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু নাট্যসম্পর্কিত প্রবন্ধ, দেশোদ্ধারের স্মৃতিকথা প্রভৃতি পাঠ করেও অনেক কিছু জেনেছে সে ওদের সম্বন্ধে।

সনকা দাসী ছিলেন গিরীশ ঘোষের আমলের একজন প্রথম

শ্রেণীর অভিনেত্রী। তখনকার দিনে তাঁর নাম জানতো না এমন লোক খুব অল্পই ছিল এ দেশে। যেমন ছিল তাঁর রূপ তেমনি ছিল তাঁর অভিনয় প্রতিভা। সনকা দাসীর নাম তাঁর মৃত্যুর পরেও মনে রেখেছিল অনেকে। ভারতবর্ষের দুটি প্রধান তীর্থস্থান, দুটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান আজও তাঁর নিঃস্বার্থ দানের কথা স্মরণ করছে। বেশ্যা ছিলেন তিনি। কিন্তু, তাঁর প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্রেব কল্যাণে, অন্ততঃ বছর দশেক পূর্বে পর্যন্তও অসংখ্য অসহায় ভদ্রকন্যা জীবনধারণ করবার সুযোগ পেতো।

মেনকা দাসী সনকা দাসীর কন্যা। মায়ের মতো অভিনয় প্রতিভা তাঁর বোধহয় ছিল না ; কিন্তু, সঙ্গীত-শিল্পিরূপে একদিন তিনি অনেকের হৃদয় জয় করেছিলেন। অসংখ্য রেকর্ড করেছিলেন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানিতে। প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ স্বর্গত বিশ্বনাথ রাও এক সময় নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন এই হনুমান হাউস-ই—সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে। তখনকার দিনের অনেক গুণী জ্ঞানী, জমিদার, ব্যবসাদার, আইনবিদ্—যাঁদের অনেকেই পরবর্তী কালে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছিলেন দেশের বরেণ্য সন্তানরূপে—গুণমুগ্ধ ছিলেন মেনকা দাসীর। সূর্যাস্তের পর অনেকেই দেখা দিতেন, সেদিনকার সনকা সদনে।

কিন্তু, আজকেকার ওই অন্ধ মেনকা দাসীব ওইটুকু পরিচয়ই সব নয়। মায়ের মতো তিনি ধর্মশালা বা অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেননি ; কিন্তু এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির তহবিলে দান করে এবং তাঁর আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে যাঁরা একদিন দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় চিহ্নিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্ব-সম্প্রদায়ের নেত্রী হিসাবে মেনকা দাসীও ছিলেন অন্যতমা। বাসন্তী দেবী, ঊর্মিলা দেবীর সঙ্গে তিনিও সেদিন পুলিস কবলিতা হয়েছিলেন !

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও স্নেহ অর্জন করেছিলেন মেনকা দাসী।

আচার্যদেবের অধিনায়কত্বে যে সব বন্যাত্রাণ সমিতি গঠিত হতো, তার তহবিলও চিহ্নিত হতো মেনকা দাসীর বিশেষ দানে। সেদিন-কার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের কিছু সংখ্যক ভদ্রসন্তানও যে ওই বেশ্যাটার নিঃস্বার্থ দানে জীবন রক্ষা করতে পেরেছিল, আজকেকার অনেক ভদ্রলোক সে খবরটুকুও রাখেন না। ভগবানবাবু আবার ব্যাপারটাকে মূর্খের ভোজ দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। নাহলে, একটা অবাঞ্ছিত আইনকে স্বপক্ষে পেয়ে এমন নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, লোভী হতে ভরসা করতেন কি!

চুলোয় যাক—

কিন্তু, ভগবানবাবু যদি ও দুষ্কার্যটা না করতেন, তাহলে এত সস্তায় এমন সুন্দর স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সে বোধহয় জীবদ্দশাতে সংগ্রহ করে উঠতে পারতো না। দিব্যেন্দুর খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজটা যেন একটু ধাতস্থ হয়।

কেমন করে, কী কী পন্থা অবলম্বন করে, ভগবানবাবু গত বৎসর সনকা-সদনের মালিক হয়েছিলেন, সে সব ষড়যন্ত্রের বিশদ বিবরণ সে শুনেছে ভগবানবাবুর কর্মচারীদের কাছ থেকে। কাজটা অবশ্যই মনুষ্যজনোচিত হয়নি। কিন্তু—

লোকটাকে বাহাদুরী না দিয়েও তো পারা যায় না! অবৈধ ব্যাপারটাকে বৈধ করে ফেলতে ভগবানবাবুর মাস তিনেকের বেশী সময় লাগেনি। বাড়িটাকে একেবারে ঢেলে সেজেছিলেন তিনি এগারটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটে বিভক্ত করে। বলা বাহুল্য, বাঙালী ভাড়াটেকে তিনি আমল দেননি। বাঙালীর গৃহসমস্যার সুরাহা করবার বিনিময়ে, নিজেকে রেণ্ট কণ্ট্রোলের আসামী করবার মতো উদারতা তাঁর ছিল না; শিখ ভাড়াটে বসিয়েছিলেন তিনি যথোচিত সেলামীর বিনিময়ে। কেবল ব্যতিক্রম হিসাবে, অনুগ্রহ করেছিলেন তিন ঘর বাঙালী ভাড়াটেকে। এ বাড়ির ভূতপূর্বা বাড়িওয়ালী

বৃদ্ধা মেনকা দাসীকে তিনি বিনা সেলামীতেই একতলার তিনটে ফ্ল্যাট্ দিয়ে দিয়েছিলেন—বুড়ি যতদিন না মরে ততদিন পর্যন্ত ন্যায্য ভাড়া দিয়ে থাকবার জন্য। অতঃপর আসে অঞ্জলিরা, খাতির জমায়। তারপর আসে দিব্যেন্দু—মালিকের স্নেহের পাত্র হিসাবে।

তেতলায়, প্রশস্ত ছাদের ওপর আগে ছিল চিলেকোঠা কাম্-মেনকাদাসীর ঠাকুর ঘর। কিন্তু, ভগবানবাবু সেখানেও ফ্ল্যাট্ তৈরি করিয়েছিলেন। চিলেকোঠার গা ঘেঁষে খান তিনেক ঘর তৈরি করে ফেলেছিলেন তিনি প্রথম সুযোগেই। আরও ফ্ল্যাট্ তৈরি করবার বাসনা ছিল তার; কিন্তু, ভরসা পাচ্ছিলেন না কর্পোরেশনের দলাদলির জন্যে। ফলে, হনুমান হাউস-এর এগার নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হিসাবে লাভবান হয়েছিল একমাত্র দিব্যেন্দুই। অত বড় ছাদটা ব্যবহার করবার অধিকার কেবলমাত্র তারই একচেটে হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ এই সুবিধাটুকুই সব চাইতে বেশী প্রলোভিত করেছিল তাকে। তেতলার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিলে, বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটের সঙ্গে আর কোন রকম সংস্রব থাকার সম্ভাবনা থাকে না। অবস্থাটা দাঁড়ায়, কতকটা আস্ত একটা বাড়ির একচ্ছত্র অধিপতির মতো। এবং, তার যথাযথ সুযোগ গ্রহণ করতেও কার্পণ্য করেনি সে।

গেরস্থালীর যাবতীয় সরঞ্জাম গুদোমজাত করেছিল সে—সেকালের সেই ঠাকুর ঘরটায়। সেইখানেই, রান্না ভাঁড়ার থেকে আরম্ভ করে, তার জুতো পালিশের কাজ পর্যন্ত চলে। অধিকন্তু, রাত্রিবাস করে তার নেপালী কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড রণ বাহাদুর। কিন্তু—

মনটা আবার যেন কেমন করে ওঠে দিব্যেন্দুর! সেদিন, বাড়ি-চাপার প্রথম দিনে, শ্বেত-পাথরে বাঁধানো ছোট্ট ঘরটাকে, ঠাকুরঘর বলে চিনতে অসুবিধে হয়নি তার। কিন্তু, সেদিন সে কিছুই জানতো না—কিছুই চিন্তা করেনি মেনকাদাসীদের সম্বন্ধে। তাই, একটা

বেশ্যার ঠাকুরঘরকে ঠাকুরঘরের মর্যাদা দিতে পারেনি সে—রূপান্তরিত করেছিল গুদোমঘরে। কিন্তু—

ওটাকে আবার ঠাকুরঘরে রূপান্তরিত করলে এদিকের ব্যবস্থা কি হবে! উত্তরের দ্বিতীয় কামরাটাতে সে তার মিনিয়েচার ল্যাবরেটরী বসিয়েছিল। দক্ষিণের প্রথম ঘরটা ছিল সব চাইতে বড়। তাই, এই ঘরটাকেই সাজিয়েছিল সে মনের মতো করে। পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে ছিল তার হাজার পাঁচেক বই আর গোটা দশেক বড় বড় আলমারী। সেগুলোকে সে এই ঘরের মধ্যেই সাজিয়ে ফেলেছিল ভাল করে। আর এর পাশের ঘরটাতেই ব্যবস্থা করেছিল রাত্রি-বাসের। সুতরাং গুদোমঘরকে আবার ঠাকুরঘরে পরিণত করলে চলবে কি করে তার!

সামনেই প্রশস্ত ছাদ। অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই একদিন ফ্ল্যাটাকীর্ণ হয়ে মালিকের মুনাফা বাড়াবে। কিন্তু, বর্তমানের সুবিধাটুকুকে সে ষোল আনা উশুল করবার ব্যবস্থা করেছিল। ছাদের একধারে, একটা টিনের চালা তৈরি করে নিয়েছিল তার ব্যায়ামের উপকরণ-গুলোকে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। মধ্যস্থলে পত্তন করেছিল একটা মিনিয়েচার ফুল-বাগান। যথাসাধ্য খরচ করে অনেক রকমের চারা সংগ্রহ করেছিল সে এবং নিরেট টবের ছোট ছোট বন্দিনীগুলিকে ফলবতীও করেছিল ঐকান্তিক সেবা-যত্নে।

প্রশস্ত ছাদের ওপর টবগুলোকে সাজিয়েছিল সে চক্রাকারে। আর সেই অকিঞ্চিৎকর উদ্যানের মধ্যে আয়েস করে শুয়ে-বসে, সে প্রেরণা সংগ্রহ করতো চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীতে। অমানিশার প্রগাঢ়তার মধ্যেও উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতো সে, তার বাবার কথা—

তুমি অমৃতের পুত্র।

ওদিকে—

ওই অদ্ভুত লোকটার বিচিত্র জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করে নিঃশ্বাস চাপে অঞ্জলি। একদিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল, কি হয় ওই সব আহ্নিক-টাহ্নিক করে! স্রেফ্ সময় নষ্ট—

দিব্যেন্দু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

অঞ্জলি বলল, তবে ও সব ভড়ং করেন কেন? বিজ্ঞানের ছাত্র আপনি, ভগবান-টগবান মানেন না নিশ্চয়ই?

দিব্যেন্দু আবার ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ হাঁ-ও হয় না-ও হয়।

অঞ্জলি আবার জিজ্ঞাসা করে, তবে ও সব করেন কেন?

অগত্যা দিব্যেন্দু জবাব দেয়, ভগবান-টগবান আছেন কিনা জানি না; কিন্তু, আমার বাবা যে ছিলেন! তাঁরই ইচ্ছায়, আমার এই কোশাকুশি নাড়া। তাঁরই ভয়ে, আমার এই পৈতের গোছা বয়ে বেড়ানো।

দিব্যেন্দুর যুক্তির দৌড় দেখে অঞ্জলি কিন্তু হাসতে পারে না। সহজভাবেই বলে, ছিলেন—এখন তো নেই! তবে?

তবুও জবাব দেয় দিব্যেন্দু, সংস্কার বড় বালাই।

শুনে, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় অঞ্জলি। অন্যদিকে তাকিয়ে কেমন যেন উদাসভাবেই বলে, আমিও একদিন ভটচায্যি বামুনের মেয়ে ছিলাম; কিন্তু, বামনাই ছাড়তে ইয়ে করিনি—

দিব্যেন্দু হাসিমুখেই জবাব দেয়, সকলেই কি সব কাজ পারে!

—তা ঠিক! অঞ্জলি আস্তে আস্তে বলে, আমার নিজের জীবনটাই দেখুন না! কি ছিলাম আর কি হয়ে গেলাম। ভাবলে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। আমার মতো বিদ্রোহ—বোধহয়, কোন বাঙালীর মেয়েই করেনি আজ পর্যন্ত!

—বিদ্রোহ! দিব্যেন্দু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অঞ্জলির মুখের দিকে!

অঞ্জলি তখন তাকিয়েছিল অন্যদিকে। কেমন যেন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে

ঘরের চতুর্দিক চোখ বোলাচ্ছিল সে। তারপরই, হঠাৎ যেন সেই বিষণ্ণ দৃষ্টি রূপান্তরিত হলো বিরক্তিতে। বলল, ইস্, কি নোংরা করে রেখেছেন বলুন তো। উঠুন—আঃ, উঠুন না—

দিব্যেন্দু ভড়কে গিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল আসন ছেড়ে!

অঞ্জলি তখন গম্ভীরভাবে জলের কুঁজোটা তুলে নিল ঘরের কোণ থেকে। তারপর দক্ষিণের জানলার কাছে, একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে, জলের ছিটে দিতে লাগল।

—আরে—দিব্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল, ও কি করছেন? আপনি কেন, বাহাদুর তো রয়েছে!

—কি জাত আপনার বাহাদুরের?

—জানি না তো।

—তবে? অঞ্জলি বিরক্ত হয়ে বলল, আহ্নিক-টাহ্নিক যদি করতেই হয়, অমন ব্যাগার-ঠেলা কাজ করছেন কেন? নিজের গতরে না কুলোয়, আমাকে বললেও তো পারেন। হাজার হলেও, আমি বামুনের মেয়ে বটে তো—

—যাচ্চোলে! দিব্যেন্দুর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কিছু বেরুল না!

অঞ্জলি আসনটা তুলে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে পেতে দিল। বলল, আশ্চর্য লোক আপনি! বাপ-মা না হয় স্বর্গে গেছেন; কিন্তু, আত্মীয়-স্বজন তো শুনিছি অঢেল। কারুকে এনে কাছে রাখলেই তো হয়। এ উঞ্ছোবৃত্তি কেন?

—তা হয়! দিব্যেন্দু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু, আমার সম্বন্ধে এত খবর আপনি শুনলেন কোথা থেকে?

অঞ্জলি চুপ করে রইল!

দিব্যেন্দু আসন গ্রহণ করে আবার বলল, আমি তো বিদেশী লোক। আমার ঘরের কথা আপনি জানলেন কি করে বলুন তো?

অঞ্জলি আস্তে আস্তে বলল, কেন? আন্দাজ করতে নেই!

দিব্যেন্দু হাসল। বলল, আন্দাজটা কিন্তু আপনার সাংঘাতিক। সত্যিই আমার অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন আছেন; কিন্তু, দোহাই আপনার! আমার রোজগারের খবরটা আন্দাজ করে, তাঁদের যেন খবর দিয়ে বসবেন না। দিলে, আমাকে নিরুদ্দেশ হতে হবে আবার—

—বুঝিছি! অঞ্জলিও হাসল। বলল, তাঁরা বুঝি বড্ড—

—বড্ড কল্যাণ-কামী আমার। আমার ভবিষ্যৎ ভেবেই তো তাঁরা যথাসর্বস্ব নিজেদের নামে করে নিয়েছেন। সম্পত্তিগুলো অবশ্য বাবার টাকায় কেনা।

—থাক, হয়েছে। অঞ্জলি হাসি চেপে বলল, পরচর্চা ছেড়ে এখন একটু নিজের চর্চা করুন দেখি।

—ঠিক বলেছেন। দিব্যেন্দু সোৎসাহে গণ্ডুষ করল।

ক্রমে আলাপ-পরিচয়টা ওদের আরও সহজ সরল হয়ে আসে। অজুহাতটা ছিল দিব্যেন্দুর ঘরের মধ্যেই। অঞ্জলি অবশ্য তার ল্যাবরেটারীর দিকে ঘেঁষতো না; কিন্তু, লাইব্রেরীটার ওপর আক্রমণ ছিল অতিরিক্ত রকমের। দুর্বলতাটা বুঝতে পেরে দিব্যেন্দুও তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেছিল। শুরু হয়েছিল অঞ্জলির বই পড়া। কিন্তু—

দিব্যেন্দুর নারীহীন সংসারের অগোছাল অবস্থা লক্ষ্য করে, অঞ্জলির অনুযোগের পরিমাণ যেন ক্রমাগতই বেড়ে চলে। সেদিন বেশ একটু রাগ করেই সে বলল, এটা ঘর না আস্তাকুড়? পিসী-মাসীদের না আনেন—না আনবেন। কিন্তু, একটা বউ নিয়ে এলেই তো পারেন!

—কোথায় পাবো?

—মেয়ের অভাব আছে নাকি বাঙলা দেশে?

—নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু, বউ কোথায়?

—খুঁজে পাচ্ছেন না ?

—পেলে কি আর আপনার ধমকানি সহ্য করি ?

—আমি খুঁজে দোব ?

—ওঃ, তাহলে তো বেঁচে যাই।

—বেশ, কি রকম বউ হলে আপনার চলবে বলুন দেখি ?

—ওরে বাবা! বি পূর্বক বহ ধাতু ঘঞ্। তার ওপর আছে আবার হালের তৈরী আইন-কানুন। তাড়াতাড়ি বলবো কি করে; রীতিমত চিন্তা করে বলতে হবে তো!

—তাহলে চিন্তাই করুন আপনি বসে বসে। বলে, অঞ্জলি রাগ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, পাশের ঘর থেকে ঝাঁটা আনবার জন্যে!

—এ কি, আমাকে ঝাঁটাপেটা করবেন নাকি ?

—বেরিয়ে যান আপনি ঘর থেকে।

—আরে ছিঃ ছিঃ, এ কি করছেন!—অঞ্জলিকে নিরস্ত করতে না পেরে দিব্যেন্দু অগত্যা বাহাদুরকে হাঁক দিল। বলল, মাইজীর খিদমদ খাট্ ব্যাটা—আখেরে ভাল হবে!

তার রান্নাঘরের ওপরেও হামলা করেছিল অঞ্জলি। বাহাদুরকে অনেক রকম বাঙালী রান্না শিখিয়ে দিয়ে সে তার খাওয়া-দাওয়ারও সুরাহা করে দিয়েছিল।

একদিন তার খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির করতে গিয়েই আর একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলল অঞ্জলি। ভুরু কুঁচকে বলল, আপনি তো দেখছি ভয়ংকর রকমের দুগ্ধপোষ্য জীব—

দিব্যেন্দু মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, তা বলতে পারেন—

—অথচ পয়সা খরচ করে এই জলো দুধ কেনেন ?

—কি করবো, যস্মিন্ দেশে যদাচার!

—বুদ্ধি থাকলে কি আর বেটাছেলের বউ জোটে না!—বলেই অঞ্জলি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল। বাহাদুরকে ডেকে হদিশ

বাতলে দিয়েছিল—বেলতলার একটা খাটালের। বুঝিয়ে দিয়েছিল, খুব ভোরে না গেলে মাল মিলবে না।

এইভাবে, দিব্যেন্দুর অগোছাল ফ্ল্যাটের শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছিল অঞ্জলি—জবরদস্ত গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করে। দেখে—

দিব্যেন্দু অবশ্য তখন বিস্মিত হয়েছিল ; কিন্তু, চিন্তিত হয়নি। কারণ, সুদীর্ঘকাল বাঙলা দেশের বাইরে বাস করলেও, বাঙালীর সামাজিক জীবনের সাংঘাতিক পরিবর্তনটা তার অজানা ছিল না। অবশ্য, এই জানাকে জেনেছিল সে বর্তমানের মুখ চেয়ে—নিতান্তই, সামাজিক সংগতি রক্ষার প্রয়োজনে। কিন্তু, ব্যক্তিগতভাবে মেনে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেনি—অসংখ্য রকমের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও। সে মেনে নিয়েছিল, এটা তার মা-ঠাকুরমার যুগ নয়, নিতান্তই, যুদ্ধোত্তর কালের আণবিক প্রগতির যুগ। সুতরাং, যারা বব ছাঁটতে, ঠোঁট রাঙাতে কুন্ঠিত হয় না ; লজ্জিত হয় সীমন্তে সিঁদুর দিতে বা গুণ্ঠনী তুলতে ; সভ্যতা জাহির করে, রাস্তার লোককে কমনীয় দেহের রমণীয় সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়াতে,—তাদেরই একজনের পক্ষে, অনাত্মীয় পুরুষ প্রতিবেশীর সাংসারিক সাচ্ছন্দ্য নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা—বাড়াবাড়ি নয় নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ অঞ্জলি যখন নিজেই বলেছে, তার মতো বিদ্রোহ, কোন বাঙালীর মেয়েই করেনি আজ পর্যন্ত !

কিন্তু, বিদ্রোহের সঠিক রূপটা ধরতে পারে না দিব্যেন্দু। বোঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই মনঃপূত হয় না তার। আজকের দিনে প্রেমজ-বিবাহটাকে বিদ্রোহ মনে করতে পারে কেবল মাত্র উন্মাদেই। সুতরাং যদিও বা অঞ্জলি প্রেম করে বিবাহ করে থাকে, সেটা বিদ্রোহ নয় নিশ্চয়ই। বিভূতি লোকটার কথাবার্তা শুনে মনে হয় অবশ্য,—একটা ফ্যাশন-দুরস্ত পলিটিক্যাল ডিস্‌পেপ্‌টিক ; কিন্তু, গলার পৈতের গোছাটা তার দিব্যেন্দুর চাইতে

ঢের মোটা। অতএব, বিবাহটা যে ওদের অসবর্ণ হয়নি, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তবে? অঞ্জলির বামনাই ছাড়তে ইয়ে না করাটাই বিদ্রোহ নাকি?

অনেক ভেবেও দিব্যেন্দু কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু এটা জানতে পারে যে, ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসে যারা, তারা সকলেই পাতানো বন্ধু বা পলিটিক্যাল বান্ধব শ্রেণীর নর-নারী—আপনার লোক কেউই নয়। খট্‌কা বাধায় এই রহস্যটা।

রহস্য ঘনীভূত হলো আরও দিন দুয়েক পরে।

হাসপাতাল থেকে বিভূতি খবর পাঠাল অঞ্জলিকে, রক্ত কিনতে হবে. টাকা-কড়ি নিয়ে শীগ্‌গির চলে এস।

অঞ্জলি কিন্তু নড়ল না, পাথর হয়ে বসে রইল নিজের ঘরে।

খবর পেয়ে দিব্যেন্দু নীচে নেমে এল ব্যস্ত হয়ে। ধমক দিয়ে বলল, আপনি তো আচ্ছা লোক! স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে হাসপাতালে, আর আপনি…

কী যে ঘটে গেল মুহূর্তের হেরফেরে—যেন পাথর ফেটে চৌচির হয়ে গেল। দিব্যেন্দুর হাতদুটো আঁকড়ে ধরে অঞ্জলি যেন আর্তনাদ করে উঠল, আপনি—আপনি আমাকে বাঁচান ওই লোকটার হাত থেকে।

দিব্যেন্দুর শাস্ত্রের বিধান, অবস্থা বিপর্যয়ে উচ্ছ্বাসের মূল্য দিতে নেই। তাই সে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হলো না; জোর করে টেনে নিয়ে গেল অঞ্জলিকে হাসপাতালে। নিজের পকেট থেকেই দিল রক্তের দাম। তারপর শুনল এই অঘটনের আসল কারণটা!

বিভূতির অফিসে ধর্মঘট চলছিল। ধর্মঘটীদের অন্যতম নেতাও ছিল বিভূতি। কিন্তু, পরে, অফিস উঠে যাচ্ছে খবর পেয়েই সে একলা আলাদাভাবে দেখা করতে গিয়েছিল মালিকপক্ষের সঙ্গে। এ বাজারে চাকরি গেলে, বাঁচবে কী করে সে! কিন্তু, সহকর্মীরা

তার, এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারেনি। সুযোগ বুঝে, বেদম ঠেঙানি দিয়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল তাকে ময়দানের একধারে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে হাসপাতালে এনে তুলেছে পুলিশ!

বিপদের ওপর বিপদ!

বাড়ি ফেরবার সময় অঞ্জলিও অসুস্থ হয়ে পড়ল। ট্যাকসির মধ্যে দিব্যেন্দুকে কয়েকবার তার বাহু আকর্ষণ করতে হলো পতন নিবারণের জন্য। কিন্তু, অঞ্জলি তার হাতদুটো আঁকড়ে ধরেছিল কিসের জন্য কে জানে!

বাড়িতে এসেও একতলা থেকে দোতলায় ওঠবার সময়, অঞ্জলির দেহটাকে তুলে আনতে হলো দিব্যেন্দুকেই। কিন্তু, সে ইতস্ততঃ করলেও, অঞ্জলি সংকুচিত হলো না এতটুকুও! নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে দিব্যেন্দুর ওপর নির্ভর করেছিল সে···সম্ভবতঃ তার শক্তির জন্যই!

অতঃপর!

শয্যাগ্রহণ করতে হলো অঞ্জলিকে। মুস্কিলে পড়ল দিব্যেন্দু। অঞ্জলির আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই; বন্ধু-বান্ধবীরাও নিপাত্তা হয়েছে হঠাৎ। এ বাড়িতে প্রতিবেশী যারা আছে, তারাও নিজের সম্প্রদায়ের বাইরে কারুর খবর রাখতে অভ্যস্ত নয়। এ হেন অবস্থায় রোগিণীর তদারক করে কে!

দিব্যেন্দুর উৎকণ্ঠা দেখে এবার কিন্তু সংকুচিত হয় অঞ্জলি। বলে, দেখুন তো···ছি ছি, মরণও হয় না আমার—

—ভাবনা কী! দিব্যেন্দু গম্ভীরভাবে বলল, সময় হলেই ইচ্ছে আপনার পূর্ণ হবে। আপাততঃ এই গুলিটা খেয়ে ফেলুন দেখি।

দিব্যেন্দু এমনভাবে এগিয়ে আসে ওষুধ নিয়ে যে অঞ্জলি আর বাধা দিতে পারে না; ট্যাবলেট্‌টা কোঁৎ করে গিলে ফেলেই সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, আপনি ভারি ইয়ে—

—কি য়ে? দিব্যেন্দু জলের গেলাস এগিয়ে দেয়।

—ভারি মিথ্যুক আপনি !

—আমি মিথ্যেবাদী ?

—নয় ? আমি ঠিক ধরেছিলাম, আপনি ডাক্তার। কিন্তু, আপনি সেদিন সটান বলে দিলেন—না তো !

—কিন্তু, সত্যিই আমি ডাক্তার নই। দিব্যেন্দু বুঝিয়ে বলে, আমার যা লাইন, তাতে, একটু-আধটু ডাক্তারি এমনিই জানা হয়ে যায় !

—তা হোক, আপনি কিন্তু একটি চুপ্পু শয়তান ! বলে ফেলেই অঞ্জলি লজ্জিত হয়ে পড়ল।

—আমি শয়তান ?

—নয় ? অঞ্জলি আরক্তমুখে বলল, সব তাতেই আপনার চাপা দেবার চেষ্টা।

—কি আবার চাপা দিলাম আমি ?

—যান, জানি না আমি। অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে শুলো।

অঞ্জলির আসল বক্তব্যটা বুঝতে না পেরে দিব্যেন্দু একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, বেশ বেশ, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন দেখি, আমি চট করে একবার দেখে আসি, বাহাদুর ব্যাটা কি করছে।

ঘর থেকে বেরুতেই দেখা হলো বৈজুর সঙ্গে ! বারান্দার রেলিংএ হেলান দিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল সে—মুখে রহস্যময় হাসির আভাষ।

—তুই ? দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

—শুধু তো দাঁড়িয়ে আছি বাবা ! বৈজু বলল, তোমার কাজকর্মে বাধা তো দিইনি। তবে কেন গড়বড়াচ্ছো দাদা !

—থাম্ ! দিব্যেন্দু ধমক দিয়ে বলল, বাঁদরামি করবি তো ওপরে চল আগে—

—তুমি না এগোলে, আমি যাব কি করে বাবা! চলো—

দিব্যেন্দু এগোল। বৈজু পেছনে চলল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

—খোঁড়াচ্ছিস কেন?

—বাগিয়েছি একটা। বৈজু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, ওপরে চল আগে, তারপর সব শুনবি—

বৈজু সম্পর্কে ভাগনে হয় ভগবানবাবুর—এক সময় এক ক্লাসে পড়ত দিব্যেন্দুর সঙ্গে। মানুষ হিসাবে একালের কোন গুণই সে অর্জন করতে পারেনি। কতকটা, প্রহ্লাদকুলের দৈত্য বিশেষ। মাতুলের মকারান্ত দোষগুলোকে আয়ত্ত করেছে সে ষোল আনার ওপর আঠার আনা। কিন্তু, ব্যবসাবুদ্ধির ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। কাজের মধ্যে, বাড়িভাড়া আদায় করে, বরাৎ খাটে, আর গালাগালি হজম করে নির্বিকারচিত্তে। কিন্তু, আর কিছু পারে না। তবুও, এই দিলখোলা মানুষটাকে দিব্যেন্দু ভালবাসে। এবং, ভালবাসে বলেই, বিগড়ে যায় মাঝে মাঝে।

ওপরে এসে বৈজু তার খোঁড়াবার কারণটা সংক্ষেপে বলল। শুনে দিব্যেন্দু মিনিটখানেক কথাই বলতে পারল না। তারপর, প্রচণ্ড একটা থাপ্পড় মেরে বসল তাকে।

গালে হাত বোলাতে বোলাতে বৈজু বলল, মার-ধোর পরে করিস ভাই, আগে এটার একটা ব্যবস্থা কর। বউ টের পেলে বড্ড কষ্ট পাবে—

—গাড়োল কোথাকার! দিব্যেন্দু খিঁচিয়ে উঠল, তোকে না আমি পইপই করে সাবধান করে দিয়েছিলাম—প্রিকশান না নিয়ে পট্টিতে যাবি না—

—কি মুশকিল! বৈজু অসহায়ের মতো বলল, পট্টিতে যাইনি বলেই তো প্রিকশান নিইনি।

—তবে, কোথায় গিয়েছিলি?

—শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে।

—অ্যাঁ! দিব্যেন্দু আবার হাত তুলল। তারপর বৈজুর চুল টেনে ধরে চিৎকার করে উঠল, ব্যাটা দি র‍্যাম কোথাকার! বেরো, বেরো তুই আমার সামনে থেকে—

—আগে একটা ব্যবস্থা কর, তবে তো! অগত্যা, দিব্যেন্দুই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অপরাধ করে, এ রকম মার-ধোর খাওয়া বৈজুর জীবনে নতুন নয়। তাই, দিব্যেন্দু চলে যেতে বিচলিত হলো না সে; বরং একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চেপে বসল। কিন্তু, আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও যখন বন্ধুর দেখা মিলল না, তখন বাহাদুরকে হাঁক পাড়ল।

—তোর মালিক কোথায় গেল জানিস?

—দোতলায়, মাইজীর ঘরে।

—গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় আমার নাম করে। না এলে বলিস, আমিই সেখানে যাব—

বাহাদুর চলে গেল। দিব্যেন্দুও ফিরল কিছুক্ষণ পরে।

—আমাকে তো দি র‍্যাম বলে গেলি! দিব্যেন্দুর মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে, বেশ গম্ভীরভাবেই বৈজু বলল, কিন্তু, তুমিই বা কোন সিংহরাজের মতো চরে বেড়াচ্ছ ব্রাদার! না না, এসব ভাল নয় বৎস। দরকার হলে, বরং আমাদের লাইন ধর, কিন্তু, গেরস্ত মেয়েদের সঙ্গে···উঁহু, উরে বাবা, সাংঘাতিক বিপদে পড়ে যাবি তুই।

বৈজু দিব্যেন্দুকে উপদেশ দিচ্ছে!

—রাগ করিসনি ভাই। দিব্যেন্দুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে বৈজু একটা ঢোক গিলল। বলল, আমি ঠিক তোর দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু, ও ভদ্রমহিলার মনের কথাটাও যে জেনে ফেলেছি সেদিন—

—তার মানে? দিব্যেন্দু ধমকে উঠল, কি জেনেছিস তুই?

—জেনেছি, যা উনি জানাতে চাননি। বৈজু বলল, সেদিন ভাড়া আদায় করতে গিয়ে বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে—

—ব্যাপারটা খুলে বলবি, না আবার থাপ্পড় খাবি ?

বৈজু খুলেই বলল—

কয়েকদিন আগের কথা। নির্দিষ্ট দিনে ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে পারল না অঞ্জলি। কিন্তু, খুব খাতির করে ঘরে ডেকে এনে বসাল বৈজুকে। বলল, একটু চা করি—

বৈজুর পেটে তখন অন্য জিনিস ছিল। ব্যস্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করল।

অতঃপর আরও দু'চারটে আজেবাজে কথা আলোচনা করে, অঞ্জলি আসল কথাটা পাড়ল। বেশ একটু সংকোচভরেই বলল, যদি কিছু না মনে করেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

বৈজু ভয়ংকর অস্বস্তি বোধ করছিল। ভদ্রমহিলা একে রূপবতী তার ওপর আবার আপ-টু-ডেট্। এই ধরনের মেয়েদের, দূর থেকে দেখে, রুচি-মাফিক কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তৃপ্তি পায় সে ; কিন্তু, কথা কইবার মতো অবস্থা দেখা দিলেই, কেমন যেন কাঠ হয়ে যায়। গলা ভিজিয়ে আড়ষ্ট ভাবে বলল, বলে ফেলুন—

—আচ্ছা, দিব্যেন্দুবাবু ভগবানবাবুর ভাই হলেন কি করে ?

—মামা যে ওকে সত্যিই ভালবাসে ছোট ভাইয়ের মতো।

—কিন্তু কেন ? উনি একজন নগণ্য বাঙালী আর তিনি তো একজন ক্রোড়পতি মাড়োয়াড়ী—

—বাঃ, ওর মতো লোককে ভালোবাসবে না তো কি আমাকে ভালোবাসবে ! বৈজু বুঝিয়ে বলল, ওই যে রামচন্দ্র নিকেতন দেখেছেন—ওই রামচন্দ্র তো এতদিনে মরে ভূত হয়ে যেত, যদি না দিব্যেন্দু জল-পড়া দিতো—

—জল-পড়া ?

—মানে, হোমোপ্যাথি আর কি !

বন্ধুর গুণকীর্তনের সুযোগ পেয়ে বৈজু যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালের কথা। তখনও স্বরাজ জন্মায়নি— রামাই ছিল মামার সবেধন নীলমণি। হঠাৎ একদিন জ্বর হলো তার। প্যারাটাইফয়েডের চিকিৎসা চলল কিছুদিন। কিন্তু, কিছুই হলো না। তখনও, পেনিসিলিন-ফিলিন চালু হয়নি এ দেশে; যা চলতো, তাই দিয়ে দিয়ে হাল্লাক হয়ে গেলেন ডাক্তাররা। ট্রপিক্যালেও কিছুদিন রাখা হলো রুগীকে। কিন্তু, দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে গেল, রুই-কাতলারা কেউই হালে পানি পেলেন না। তবে, একটা কাজ তাঁরা করেছিলেন। জ্বরের অজুহাতে পেটে মারেননি রামাকে। বরং, ভালো-মন্দ খাইয়ে যাচ্ছিলেন বেশী বেশী করেই। তারপর হত্যে দেওয়ার কথা তুললেন দিদিমা। ঠিক হলো, আমাদের ওদিককার আজমীর সরিফে গিয়েই প্রথম ট্রাই নেওয়া হবে।—পুষ্করটা হবু বিধবাদের ব্যাপার কি না, তাই আজমীর ঠিক হলো। রামাকে নিয়ে দেশে গেলেন সকলে। দিব্যেন্দু তখন ওর বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর যা ইচ্ছে তাই করে—

—যা ইচ্ছে তাই—মানে? অঞ্জলি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

—মানে, ওদের বাপ ব্যাটার এক এক সময় এক এক রকমের বাই চাগতো। ঠাকুরবাবা তখন—

—ঠাকুরবাবা মানে?

—মানে, দিব্যেন্দুর বাবাকে ওখানকার সকলে ঠাকুরবাবা বলে ডাকতো। সন্ন্যাসী মানুষ ছিলেন কিনা—

—সন্ন্যাসী ছিলেন তিনি?

—শুধু সন্ন্যাসী? সত্যিকারের মহাপুরুষ ছিলেন তিনি। যেমন গুণী, তেমনি বিনয়ী, তেমনি—

—বুঝিছি। তারপর কি হলো বলুন?

—ওই তো বললাম। দিব্যেন্দু তখন এ্যালোপ্যাথির সঙ্গে

আবার হোমোপ্যাথিও আরম্ভ করেছিল। রামাটাকে বাগিয়ে ফেললে।

—বাগিয়ে ফেললে ?

—তা ফেললে বৈকি ! একেবারে যেন ভিনি ভিডি ভিসি করে ফেললে। রোগের আদ্যি-অন্ত শুনে, বই মুখে করে পড়ে রইল একদিন। পরের দিন, রামাকে এক ডোস নাকস্ খাইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল পুষ্করের দিকে। নিয়ে এল একটা থুত্থুড়ে বুড়ো কোবরেজকে, ডুলি চড়িয়ে। কোবরেজ অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখে কি যেন ওকে বললে। শুনে লাফিয়ে উঠল ও। মামাকে হেঁকে বলল, এক্ষুনি একটু পাইরোজেন থারটি চাই আমার। শীগগির আনিয়ে দিন। মামা ওদিকে পড়ে গেল নিদারুণ ফ্যাসাদে। তল্লাটের হোমোপ্যাথির দোকানে তল্লাস করে পাইরোজেন মিলল না। বরং ডাক্তাররা আরও ভড়্কে দিলে। বললে, ও ওষুধটা কেউ ব্যবহার করে না বলে অচল হয়ে গেছে। কিন্তু, দিব্যেন্দুও নাছোড়বান্দা। মামাও চটাতে ভরসা করল না ঠাকুরবাবার নন্দনটিকে। অগত্যা মারাত্মক গাঁটগচ্চা গেল মামার। ছ' পয়সা দামের একটা ছোট্ট শিশিকে—সেই যুদ্ধের বাজারে—কোলকাতা থেকে এরোপ্লেন চড়িয়ে নিয়ে আসতে হলো।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ! হপ্তা খানেকের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে গেল রামার। অবশ্য, ওকে খাড়া করে তুলতে, আরও ওষুধ দিয়েছিল দিব্যেন্দু। একটার নাম বুঝি, ওরাম আর্স সি. এম.। আর একটার নাম—

—আশ্চর্য তো ! অঞ্জলি অভিভূতর মতো বলল, এ যে রূপকথার মতো শুনতে লাগছে। তারপর কি হলো ?

—তারপর সর্বনাশ হলো—মানে, দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। ঠাকুরবাবারও চাকরি গেল। প্যাটেল সাহেব কি সব নতুন কাণ্ড-

কারখানা করলেন—মহারাজা নিজের রাজ্যে নিজেই চোর হয়ে গেলেন। তখন মামা গিয়ে ঠাকুরবাবাকে বললে, আপনি নিজে যা ইচ্ছে তাই করুন। কিন্তু, ছেলেটার মাথা আর খাবেন না। জমানা বদলে গেছে। দিব্যেন্দুর আখেরটা এবার আমাকে ভাবতে দিন—

—বুঝতে পারলাম না। কি বললেন মামা?

—মানে, ঠাকুরবাবা বেকার হয়ে গেলেন; ওদিকে দিব্যেন্দুরও ডিগ্রী-ফিগ্রী কিছু নেই যে চাকরি পাবে—

—ডিগ্রী নেই কি বলছেন? অঞ্জলি আশ্চর্য হয়ে বলল, অতবড় ডাক্তার—অমন লেখা-পড়া-জানা লোক—

—ওতে কি হবে? বৈজু বুঝিয়ে বলল, ও সব কিছুই তো শিখেছে বাপের পাঠশালে আর মহারাজার খেয়াল-খুশির স্কুল-কলেজে। নয়া জমানায় ওসব প্রাইভেট প্রতিভার কোন দাম নেই। তাই মামা ওকে টেনে নিল। ওৎ পেতে বসেছিল তো—

—ওৎ পেতে বসেছিলেন? ভগবানবাবু?

—থাকবে না? যে লোক ওঁর একমাত্র সন্তানকে অমন করে বাঁচিয়ে দিলে—এতদিন তো তার জন্যে কিছুই করে উঠতে পারেনি, ঠাকুরবাবার ভয়ে। তাই, বাপ কাবু হতেই ছেলেকে টেনে নিলে। পাঠিয়ে দিলে বিলেতে—

—বিলেতে? উনি বিলেত-ফেরত?

—তা ফেরত বৈকি! বিলেতের একটা ওষুধ তৈরির কারখানায় বছর দেড়েক শিশি-বোতল পরিষ্কার করল। তারপর দেশে ফিরতেই মামা ওরই জন্যে ওষুধের কারখানা খুললে। ওরই রুগীর নামে—আর, সি, কেমিক্যালস্। মানে রামচন্দ্র কেমিক্যালস্। কিন্তু দিব্যেন্দুটা একটা ঘোড়েল—

—ঘোড়েল?

—নয়? দারুণ কঞ্জুষ ওটা। মামা তো ওকে একটা সাড়ে

তিনশ' টাকার ফ্ল্যাটে রেখেছিল। কিন্তু বাপ মরতেই ও এখানে উঠে এসে দু'শো টাকা করে বাঁচাচ্ছে মাসে। ব্যাটা একেবারে হাঁড়িফাটা। জীবনের কিছুই দেখলে না—যৌবনের কোন আনন্দ—

—থাম। দিব্যেন্দু ধমকে উঠল।

—আবার চট্‌লি কেন! বৈজু থমকে গিয়ে বলল, বেশ তো শুনছিলি মন দিয়ে—

—তুই তখন কি বললি অঞ্জলির সম্বন্ধে—আর এখন কি সব বলে চলেছিস?

—দরদের কথা বলছিস? আরে, সেই কথাতেই তো আসছিলাম। বৈজু উত্তেজিতভাবে বলল, আমি তোকে ঘোড়েল ফোড়েল বলতেই ভদ্রমহিলা দিল খুললেন। তোর অমন রূপ, অমন স্বাস্থ্য, অত বিদ্যে, অত টাকা, অথচ বিয়ে করিসনি! এই বিদেশ বিভূঁয়ে কিছু একটা হলে, কে দেখবে তোকে! কেন মামা তোর বিয়ে দিচ্ছে না! আমার মত বন্ধুরই বা কি আক্কেল যে—

—আমার আক্কেল নিয়ে এ্যাটাক করতেই—বৈজু চোখ মিটমিট করে বলল, আমিও আক্কেল দিয়ে দিলাম—

—কি আক্কেল দিলি?

—বলে দিলাম, ও যে আসলে ঘেন্না করে মেয়েদের—

—অ্যাঁ? দিব্যেন্দু চিৎকার করে উঠল, ওই কথা বললি তুই?

—চটিসনি ভাই। আমি বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বলেছি—

—কি বুঝিয়ে বলেছিস?

—তোর মনের আসল অবস্থাটা। ঠাকুরবাবা অনেক খোঁজ খবর করেই ছেলের জন্যে পাত্রী ঠিক করেছিলেন। মেয়েটি ছিল তাঁরই এক বন্ধুকন্যা। বন্ধুটিও ছিলেন তাঁরই মতো সেকেলে গোঁড়া বামুন। কথাবার্তা চলেছিল প্রায় বছর পাঁচেক ধরে। তারপর

একদিন অনেক তোড়জোড় করে, অনেক টাকা খরচ করে, সদলবলে বিয়েও করতে এল বর। কিন্তু, সম্প্রদানের সময় কনেকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পালিয়েছিল—

—নাঃ, তুই একটা নিরেট গাধা! দিব্যেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, কি দরকার ছিল তোর অত সব ঘরের কথা বলবার ?

—তা আমি কি করবো! বৈজুও বেজার হয়ে বলল, একটা মেয়ে করলে অপরাধ, আর তুই ক্ষেপে কাঁই হয়ে গেলি সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপর! তোর আক্কেলের কথাটাও বুঝিয়ে বলতে হবে তো!— কিন্তু, কি আশ্চর্য ভাই! তবুও তোর মতো আকাটের ওপর বিরক্ত হলেন না ভদ্রমহিলা। চোখ ছলছলিয়ে বললেন—

—থাম! দিব্যেন্দু আবার ধমকে উঠল। বলল, গবেটের শিরোমণি, একেবারে যেন ফ্রয়েডের কবর ফুঁড়ে উঠে এলেন। শিক্ষিত ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে মিশেছিস কখনও? সারা জীবনটাই তো ঘেঁটে মরলি পট্টির পুতুল! তুই কি বুঝবি ওদের কথা? একজন ভদ্র-মহিলা, একটু সহজ সরলভাবে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, আর তুই এমনি ভেবে নিলি—

—আলবৎ ভাববো! বৈজুও এবার চটে গেল। বলল, মেয়ে-মানুষ সম্বন্ধে তুই কি বুঝিস রে গর্দভ? এ আমার লাইন—তুই বেরসিক-এর মধ্যে নাক গলাতে আসছিস কোন আক্কেল ?

—থাম থাম! দিব্যেন্দুও তেড়ে উঠল, ব্যাটা দি র‍্যাম কোথাকার! আক্কেল শেখাচ্ছিস আমাকে? বল হতভাগা, বল, পট্টি ছেড়ে প্ল্যাট-ফরমে মরতে গিয়েছিলি কেন? বল—

—তা আমি কি করবো! বৈজু মুষড়ে গিয়ে বলল, গত পয়লা মে থেকে কি সব আইন করেছে গবর্নমেণ্ট! লালপাগড়িগুলো ভয়ংকর বাড়িয়েছে। পট্টিতে যেতে গেলে আজকাল খরচ পড়ে ডবলের ওপর। নতুন আইনে সুবিধে হয়েছে বরং ফুটপাথের মুচি, হকার আর ওই উদ্বাস্তু ভিখারিগুলোর; কিন্তু, সর্বনাশ হয়েছে আমাদের

আর বাজারেগুলোর। চুলোয় যাক, এখন যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করে দে ভাই!

—তোর পচে মরাই উচিত! নে, শুয়ে পড় দেখি—

পরীক্ষান্তে যথোচিত বিধান দিয়ে বৈজুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল দিব্যেন্দু। তারপর সে বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের দিকে বিভূতিকে দেখতে।

বিভূতির ব্যাপারটাও বেশ বিস্মিত করে তুলছিল দিব্যেন্দুকে। আগেকার কর্মব্যস্ত বিভূতির সঙ্গে সে অবশ্য খুব বেশী কথা বলার সুযোগ পায়নি; কিন্তু, হাসপাতালবাসী রোগীটিকে দেখতে গিয়ে সে প্রায় প্রতিদিনই হতবাক্ হচ্ছিল। লোকটার কোন্ পরিচয়টা ঠিক। আগেকার পলিটিক্স্ পাগল বিভূতি কি এত খিটখিটে—এত অভদ্র ছিল? দিব্যেন্দু ভাববার চেষ্টা করে। মনে পড়ে, বেকায়দায় পড়লে বিভূতি আগে হেসে ফেলতো, তর্ক করতো ছেলেমানুষের মতো; তারপর পালিয়ে যেত অঞ্জলির ধমক খেয়ে। কিন্তু, এখন—

ব্যাপারটা অঞ্জলিরও দৃষ্টি এড়ায় না। সেদিন, বাড়ি ফেরবার মুখে মুখের হাসিটাকে সে আর গোপন করতে পারল না।

দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, হাসছেন যে?

অঞ্জলি মুখ টিপে বলল, আপনার অবস্থা দেখে। ওকে কি ভেবেছিলেন আপনি? লেনিন, স্ট্যালিন, না খোদ কার্ল মার্কস?

দিব্যেন্দুও হেসে ফেলল। বলল, সত্যি কি ব্যাপার বলুন তো? ওঁর হাসি আগেও দেখেছি। কিন্তু, এখন দেখে মনে হয়, পৃথিবীর কোন রহস্যই বুঝি ওঁর অজানা নেই। লেনিন, স্ট্যালিনের নামোচ্চারণ মাত্রেই এমন গদগদ হয়ে পড়েন, যেন···অথচ, আলাপ-আলোচনা করতে গেলেই বোঝা যায়, হয় উনি বদ-হজমের রোগী—পড়েও কিছু বুঝতে পারেননি; না হয়, নিজে কিছুই পড়ে দেখেননি—স্রেফ

শোনা কথা নিয়ে বিদ্যে জাহির করছেন। তা ছাড়া, আগে তো উনি এত রাফ ছিলেন না! ভুল ধরিয়ে দিলেই এখন অপমান করে বসেন। আমিও নাকি ক্যাপিট্যালিস্টদের দালাল, সুযোগবাদী শয়তান, জনগণের শত্রু—

—অথচ, বাধা দিয়ে অঞ্জলি বলল, এই লোকটাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যেই আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—

—বাঃ, উনি যে আপনার স্বামী!

—তা বটে! অঞ্জলি আর কথা বাড়ায় না!

পরদিন, কৌতূহলটা আর চেপে রাখা সম্ভবপর হলো না দিব্যেন্দুর পক্ষে। জিজ্ঞাসা করে বসল, আচ্ছা বিভূতিবাবু, আপনি তো সোভিয়েটের সব খবরই রাখেন। নিজের দেশের কোন খোঁজ-খবর রাখেন?

—নিজের দেশ! বিভূতি তার সেই গা-জ্বালানে হাসি হেসে বলল, সমস্ত পৃথিবীটাই তো আমার দেশ!

—ঠিক কথা! তবুও, যে দেশে আপনি জন্মেছেন, বাস করছেন, অন্ন গ্রহণ করে বেঁচে রয়েছেন, সেই দেশটার সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতা, প্রাণধর্ম সম্বন্ধে কোন খবর-টবর রাখেন?

—আমার ইনট্যালিজেন্স সম্বন্ধে আপনার এ ধরণের সন্দেহ হবার কারণটা জানতে পারি কি? বিভূতি উত্তেজিত হয়ে উঠল।

—এটাকে সন্দেহ ভাবছেন কেন? নিছক কৌতূহল। আপনার মুখেই শুনলাম, সোভিয়েটের লেখকরা ইণ্ডিয়ার রামায়ণ, মহাভারত-টারত সব অনুবাদ করছেন। কিন্তু, ওগুলো যে দেশের জিনিস, সে দেশ সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন?

বিভূতি আরক্ত চোখে একবার অঞ্জলির দিকে তাকাল। তারপর রূঢ়স্বরে জবাব দিল, দরকার মনে করি না।

—মনে না করার অবশ্যই কোন কারণ আছে! দিব্যেন্দু হাসি-

মুখেই বলল, আপনি যে দেশে কখনও যাননি, তাদের সব কিছু সম্বন্ধেই খবর রাখেন, অথচ, নিজে যে দেশে জন্মেছেন—

—অবশ্যই কোন কারণ আছে। বিভূতি বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু, সে তো আপনি বুঝতে পারবেন না।

—বুঝিয়ে দিলে, বুঝতে পারবো না কেন ?

—কারণ, আপনার রক্তের মধ্যে রয়েছে বিষ। ফিউডালিজমের প্রতি আনুগত্যবোধের মারাত্মক বিষ। জীবনের সব চাইতে মূল্যবান সময়টা নষ্ট করেছেন আপনি, একটা নেটিভ স্টেটের, একটা স্বেচ্ছাচারী রাজার প্রজা হয়ে। তাই, আপনার যত মাথা ব্যথা, রামায়ণ-মহাভারতের মতো রাজতন্ত্রী রাবিশ নিয়ে। কিন্তু, আমার সময় অত সস্তা নয়। ওসব রাবিশ নিয়ে সময় নষ্ট করবার মতো উন্মাদও আমি নই—আর…

—আর! দিব্যেন্দু হাসিমুখেই বলল, বলুন কি বলছিলেন ?

—হাসছেন ? বিভূতিও হাসল—প্রবীণেরা যেমন করে হাসেন অর্বাচীনের কাণ্ডকারখানা দেখে। বলল, হেসে নিন, দু'দিন বই তো নয়! কিন্তু, দিন যে আগত ঐ! তখন ও হাসি আপনার থাকবে কোথায় ?

—বুঝলাম না। দিব্যেন্দু বলল, একটু বুঝিয়ে বলুন—

—আমাকেও একটু বুঝিয়ে দাও! অঞ্জলি এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে তাকিয়েছিল; হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে বলল, উনি না হয় রাজার প্রজা ছিলেন! কিন্তু আমি তো তোমাদেরই দলের—

—কি বুঝতে চাও বলো! বিভূতি গম্ভীরভাবে বলল, কেন আমি ওই দু'টো সেকেলে রাজতন্ত্রের কেচ্ছা পড়িনি ?

—সেকেলে কথা থাক, আপাততঃ একটা একেলে কথার জবাব দাও। রাজার প্রজা হওয়ার জন্যে দিব্যেন্দুবাবুর না হয় রক্ত খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু, তোমার কার্ল মার্কস ? তিনি রক্ত ঠিক রেখেছিলেন কি করে ?

—তার মানে? বিভূতি চড়া গলায় বলল, কী বলতে চাও তুমি?

—আমি কিছু বলতে চাই না। অঞ্জলি শান্তভাবেই বলল, তোমার যুক্তিটা শুনতে চাইছি। তোমার মুখেই শুনেছি, মার্কস একজন জার্মান রাজার প্রজা হয়েই জন্মেছিলেন।

—তাতে কি হয়েছে? লেনিন, স্ট্যালিন, নিকিতারাও তো একদিন জারের প্রজা হয়ে জন্মেছিল।

—আঃ, আমার কথাটা শেষ করতে দাও। অঞ্জলি উত্তেজনা দমন করে বলল, তোমার মুখেই শুনেছি, মার্কসকে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁর স্বদেশ জার্মানী। ফ্রান্সের মতো আরও সব প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রও তাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু, তারপর?

—কি তারপর? বিভূতি গর্জন করে উঠল।

—মার্কস যদি সেদিন ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের ছায়ায় নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করবার সুযোগ না পেতেন, তাহলে ক্যাপিট্যাল লিখতে পারতেন কি? যে বেলজিয়ামে গিয়ে ঘন ঘন মীটিং করতেন, সেটাও তো একটা রাজতন্ত্রী দেশ। ওদিকে, যে দেশ মার্কস-এর আদর্শকে সত্যকার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করল, সেই দেশের আদর্শতন্ত্রে, স্ট্যালিনের মতো মহাপুরুষ, সবার আগে বুখারিন, জিনোভিচ্-দের মতো বন্ধুদের খুন করে নিশ্চিন্ত হলেন কেন? নরপিশাচ জার কাইজারের বিচারে, লেনিন স্ট্যালিন মার্কসরা পালিয়ে বাঁচতে পারে কিন্তু দেবতা-পুঙ্গব স্ট্যালিনের কবল থেকে, কেউ না মরে উদ্ধার পায়নি কেন?

—চমৎকার! বিভূতি সশ্লেষে বলে উঠল, এ সব শিক্ষা নিশ্চয়ই এই নতুন বন্ধুটির কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে?

অঞ্জলি আর কথা কইতে পারল না; বিস্ফারিত চক্ষে তাকিয়ে রইল স্বামীর দিকে। ভাবতে চেষ্টা করল, আরও কত নীচে নামতে পারে এই লোকটা।

—ওয়েল অঞ্জলি! অ্যাম্ আই টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্যাট ইউ আর এ্ ট্রেটার?

—ইয়েস! অঞ্জলি ঠিক আগের মতোই ঠাণ্ডা গলায় বলল, ইয়েস্, আই অ্যাম্ এ ট্রেটার টু মাই ফ্যামিলি, টু মাই কমিউনিটি, টু মাই কান্ট্রি, ইভন্…

—এ্যাণ্ড টু ইয়োর হাজব্যাণ্ড ?

—হাজব্যাণ্ড! ওঃ! অঞ্জলি অভিভূতের মতো একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দিব্যেন্দু কিন্তু বসেই রইল রোগীর কাছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দিব্যেন্দু বাইরে এসে দেখল, অঞ্জলি হাসপাতালের ফটকের কাছে অপেক্ষা করছে। লজ্জিতভাবে বলল, কি আশ্চর্য! আপনি যে অপেক্ষা করবেন, তা তো বলেননি!

অঞ্জলির চোখ দুটো ঠিক যেন জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছিল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, আপনি এতক্ষণ কি করছিলেন ওর কাছে বসে ?

—মানে, একটু স্টাডি করছিলাম আর কি।

—স্টাডি করছিলেন ? অঞ্জলি আরক্ত চোখে তাকাল দিব্যেন্দুর মুখের দিকে। সুবিস্ময়ে বলল, ওকে স্টাডি করছিলেন আপনি ?

—হ্যাঁ, চলুন এগোন যাক্!

মিনিট পাঁচেক নীরবেই হাঁটল দুজনে। তারপর দিব্যেন্দু বলল, আপনি বড্ড রেগে গেছেন, তাই সব গোলমাল করে ফেলছেন! ক্রোধ হচ্ছে এক রকমের সাময়িক উন্মত্ততা! ও অবস্থার দাস হলে, ছোট্ট চিনে পট্‌কাও হাইড্রোজেন বোমা হয়ে দেখা দেয়—বুঝেছেন ?

—বুঝেছি!

—কী বুঝেছেন ?

—আপনি একজন মহাপুরুষ! অঞ্জলি ঝাঁঝিয়ে উঠল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আপনার চামড়া খুব মোটা।

—নাঃ, আপনি দেখছি সত্যিই চটেছেন! একটা কাজ করবেন ?

অঞ্জলি মুখ তুলে তাকাল।

—চলুন, একটু মাঠে বসে মাথা ঠাণ্ডা করবেন। তারপর, বাসের ভিড় কমলে বাড়ি যাওয়া যাবেখন।

অঞ্জলি কথা কইল না; কিন্তু ফিরে দাঁড়াল।

—চলুন! দিব্যেন্দু এগোতে এগোতে বলল, যা মিথ্যে তা গায়ে মেখে লাভ কি! বিভূতিবাবু যা বলে ফেলেছেন, সেটা রাগের মাথাতেই বলে ফেলেছেন। কিন্তু, কথাটাকে গায়ে মাখলে, ভদ্রলোকের পাগলামীটাকেই সত্যি করে তোলা হতো না কী! তাই তো বসে বসে স্টাডি করছিলাম—ভদ্রলোকের মানসিক অবস্থাটা হঠাৎ এ রকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে কেন? অনেক কিছুই মনে আসছে; কিন্তু, আসল ব্যাপারটা কিছুতেই ধরতে পারছি না।

—পারছেন না? আশ্চর্য আপনার দৃষ্টিশক্তি। আমি তো চিরকালই ওকে ওই রকমই দেখে আসছি।

—আপনি বলতে চান, উনি চিরকালই অমন—

—হ্যাঁ, অমনি ইতর, অমনি মুর্খ, অমনি—

—কিন্তু, তা তো হতে পারে না। বিভূতিবাবুর ভেতর নিশ্চয়ই এমন কোন বিভূতি ছিল বা আজও প্রচ্ছন্ন আছে, যা একদিন আপনার মতো মেয়েকেও মুগ্ধ করেছিল। একদিন তো আপনি ওঁরই জন্যে বিদ্রোহিনী হয়েছিলেন!

অঞ্জলি থমকে দাঁড়াল।

—আসুন, এইখানেই বসা যাক একটু। দিব্যেন্দু পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাসের ওপর পাতল। বলল, আপনিও শাড়ির আঁচলটাকে রুমাল করে ফেলুন। চিনেবাদাম খাবেন? এই ভাজাওয়ালা—

অঞ্জলির কোলের ওপর এক গাদা চিনেবাদাম ঢেলে দিয়ে

দিব্যেন্দু বলল, নিন, খান। কর্তার জন্যে মন খারাপ করবেন না। দেখবেন, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অঞ্জলির আরক্ত চোখ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। সে ভুরু কুঁচকে দিব্যেন্দুর দিকে তাকাল।

দিব্যেন্দু কিন্তু নিরস্ত হলো না। মনোবিশ্লেষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ভিয়ানীজ মনোস্তত্ত্ববিদ্‌দের মন্তব্যগুলো আউড়ে যেতে লাগল। তারপর বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটাল ভৈরবীতত্ত্বে এসে। বলল, মাভৈঃ! ভয় হচ্ছে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। সংশয়, সংকোচ, সন্ত্রাস, সব কিছুই হচ্ছে মায়া। ওগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন মন থেকে, দেখবেন, সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। বুঝলেন?

—বুঝলাম।

দিব্যেন্দুর সন্দেহ হলো, অঞ্জলি যেন হাসি চাপছে। বলল, কি বুঝলেন?

অঞ্জলি হাসি চেপেই বলল, বুঝলাম, এদেশে আর বেশী দিন বাস করলে, আপনাকে হয় যেতে হবে লুম্বিনী পার্কে; না হয়, আরও কোন সাংঘাতিক জায়গায়। তার চাইতে, যেখানে ছিলেন সেইখানেই চলে যান বরং।

—বাণপ্রস্থে যেতে বলছেন?

—বন-মহোৎসবের দিনে বাণপ্রস্থ আর কোথায় করবেন! তার চাইতে সেই মরুভূমির দেশেই চলে যান বরং।

—কিন্তু, সেখানেও যে বন-মহোৎসব হচ্ছে আজকাল। স্টেট্‌টা তো এখন আর নেটিভ নেই, প্রজাতন্ত্রী হয়ে গেছে প্যাটেলের কৃপায়।

—তাহলে তো বড় মুসকিল হলো! অঞ্জলি হাসি চেপে, চোখ দুটোকে বড় বড় করে বলল, আচ্ছা, তাহলে এক কাজ করুন। কেতাবী বিদ্যেগুলো আর কোথাও না ফলিয়ে, কেবল আমার ওপরই ফলান্—কেমন?

—ধন্যবাদ! দিব্যেন্দু সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, আপনি যে আমাকে আর কিছু করতে বলেননি, তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—তার মানে?

—মানে, আপনি যে আমাকে ধুতি ছেড়ে শাড়ি পরতে বলেননি; ব্যাক্ ব্রাশ্ ছেড়ে বব্ রাখতে বলেননি; কেবলমাত্র নিজের আঁচলের তলায় ঢেকে রাখতে চেয়েছেন, তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অঞ্জলি কি যেন ভাবল একটু। তারপর আস্তে আস্তে বলল, একটা কথা কিন্তু বাদ গেল।

—যথা?

—ঘড়ি ছেড়ে চুড়ি পরার কথাটা বাদ পড়ে গেল।

—ওটা ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। মা-লক্ষ্মীদের হাতে চুড়ি তো তেমন চোখে পড়ে না; বরং ঘড়ির ব্যাপারেই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এক দেখি।

—বুঝলাম! আপনি একাকার না করে ছাড়বেন না।

—মাভৈঃ, তখন আপনার আঁচলের তলায় লুকোব।

—সত্যি!

—কী সত্যি?

—আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।

—হায় ভগবান, এও শুনতে হলো!

—এইঃ আস্তে, লোকগুলো দেখছে যে।

—ইস্, ভুলেই গিয়েছিলাম, এটা বাংলা দেশ। দিব্যেন্দু চিনেবাদাম মুখে পুরল।

বাংলাদেশের কথাটা উঠতেই, অঞ্জলিরও বোধহয় মনে পড়ে গেল, সেও বাঙালীর মেয়ে। হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, চলুন, ফেরা যাক্, অন্ধকার হয়ে গেছে।

—চলুন। দিব্যেন্দুও উঠে পড়ল।

একটা কিছু হতে পারতো, কিন্তু হলো না। সেটা দিব্যেন্দুর সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য! কেতাবী বিত্তার ইঙ্গিতে সে-ও আঁচল ঢাকা দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু, অঞ্জলি ভুল বুঝল। বক্তব্যটা সৌজন্যপূর্ণ ছিল না; ছিল হালকা রসিকতার প্রলেপযুক্ত। কিন্তু, অঞ্জলি বুঝতেই পারল না। কিংবা, বুঝতে চাইল না। অথবা—

দিব্যেন্দুই ভুল করছে না তো! আজকের দিনের যে সব মেয়ে শিক্ষা, স্বাধীনতা আর সভ্যতার মোহে আত্মবিস্মৃত, সেই সব মেয়েকে, কেবল মেয়ে হিসাবে গ্রাহ্য করার সুস্পষ্ট উক্তি যে কি পরিমাণ বিপর্যয় ঘটায় মেয়েদের মনে—সে সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও, কেতাবী অভিজ্ঞতা বেশ কিছু ছিল। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, নারীত্বের এ হেন অবমাননাকে অঞ্জলি বুঝতে চাইল না নয়—বুঝতে পারল না। তবে কি—

স্বাধীনা জেনানা সম্বন্ধে দিব্যেন্দুর এতদিনকার ধারণা ভুল?

ভুল নিশ্চয়ই নয়। দিব্যেন্দু ভুল করে না—তার সন্ন্যাসী পিতা ভ্রান্ত ছিলেন না। কিন্তু, অঞ্জলির ব্যাপারখানা কি? তার ছকে ফেলা আধুনিকা চরিত্রের মধ্যে এ মেয়েটা কেন হুবহু খাপ খেয়ে যাচ্ছে না! তবে কি—

অঞ্জলি ব্যতিক্রম? ব্যতিক্রম বলেই কি ওকে এত ভাল লাগে দিব্যেন্দুর? সম্ভবতঃ নিশ্চয়ই তাই। নাহলে, এমন হবে কেন! দিব্যেন্দু শর্মার শিক্ষা-দীক্ষায় তো দুর্বলতার স্থান নেই! সুতরাং—

যুক্তিবাদীর চঞ্চল মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তখন, বেশ আয়েস করে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে দিব্যেন্দু হাঁক পাড়ে, বাহাদুর লস্যি লে আও—

বাগানটা মিনিয়েচার হলেও পরিবেশটা কিন্তু খেলাঘরের মতো মনে হচ্ছিল না। ছোট ছোট মুক্তোর মতো গুটিকয়েক বেলের কুঁড়ি, সামান্যকে যেন অসামান্য করে তুলেছিল। ফলবতীর আত্মপ্রকাশের প্রভাবে যেন তখন মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল ব্যারাক

বাড়ির অস্তিত্ব—তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছিল জগৎ-সংসার—শুধু সত্য হয়ে উঠছিল ত্রয়োদশীর আকাশখানা। দক্ষিণের সাঁতরা রোডের ব্যস্ততা ভেদ করে যা ভেসে আসছিল, তার স্পর্শেও উদ্বেলিত হচ্ছিল দিব্যেন্দুর মন। গোনা-গুনতি গুটিকয়েক ছোট্ট কুঁড়ির ছোট্ট দোলন—যেন নতুন স্বর্গ রচনা করছিল—সেই ছোট্ট ছাদের ছোট্ট জগতে। রাজপথের বিষাক্ত বাষ্পও মনোরম হয়ে উঠছিল—ওদের প্রভাবে মালিন্যমুক্ত হয়ে। আবেশে তার দিব্যেন্দুও অভিভূত হয়। চোখ বুজে আয়েস করে শুয়ে পড়ে সে। মনে হয়—

কে যেন আসছে, চুপি চুপি, সন্তর্পণে, সলজ্জ পায়ে সাড়া না দিয়ে, শুধু তারই জন্যে, কেবল তারই কাছে—

সত্যিই কি কেউ আসবে কোনদিন—তার জীবনে! একান্তভাবে, শুধু তারই জীবনে! দুনিয়ার সব কিছুকে তুচ্ছ করে—জীবনের সব কিছুকে ভুলে গিয়ে,—শুধু তাকে আপন করবার জন্যে! কবে আসবে সে—কবে আসবে সেদিন!—চঞ্চল হয়ে, চোখ বুজেই হাঁক দেয় দিব্যেন্দু, রে বাহাদুর ক্যা ভৈঁলো?

ঠুন করে একটা শব্দ হয়। ধড়মড় করে উঠে বসে দিব্যেন্দু। আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি, এ সময়?

চায়ের পেয়ালাদুটো নামিয়ে রেখে, অঞ্জলি পা মুড়ে বসল মাদুরের ওপর। বলল, এলুম, যা চ্যাচামেচি লাগিয়েছেন আপনি! খেয়ে নিন্—

—বাহাদুর কোথায় গেল?

—রান্নাঘরে লস্যি তৈরি করছে।

—এ দুটো তাহলে কি?

—খেয়েই দেখুন না কি!

দিব্যেন্দু এক চুমুক খেয়ে একটা আয়েসের আঃ ছাড়ল। তারপর বলল, আপনি আমাকে বিষ পান করালেন? জানেন তো আচার্যদেব কত চেষ্টা করেছিলেন, বাঙালীকে চায়ের নেশা ছাড়াবার জন্যে?

—জানি। অঞ্জলি বলল, কিন্তু এটা আচার্যদেবের যুগ নয়। লক্ষ্মীছেলের মতো খেয়ে নিন দেখি তাড়াতাড়ি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

দিব্যেন্দু আবার চুমুক মারল। দেখে, অঞ্জলি নিজের পেয়ালাটা টেনে নিল।

চা-পান পর্বটা নীরবেই চলল। দিব্যেন্দু ঠিক বুঝতে পারছিল না, এমন অসময়ে অঞ্জলি হঠাৎ ওপরে এল কেন! কিন্তু, পরিস্থিতিটার জন্যে বড্ড অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ এই অসময়ে আপনি ওপরে এলেন?

অঞ্জলি চট্ করে জবাব দিল না। কি যেন ভাবল একটু। তারপর হাসবার চেষ্টা করে বলল, কেন, আমি কি ওপরে আসি না? আপনি যেন বড্ড অস্বস্তিবোধ্ করছেন মনে হচ্ছে।

—না না, অস্বস্তিবোধ করবো কেন? দিব্যেন্দু একটা ঢোক গিলে বলল, তবে কি না···

—দেশটা বাংলাদেশ! অঞ্জলি আস্তে আস্তে বলল, সময়টা অন্ধকার রাত্রি···আমাদের আশপাশে আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই···আর, আপনাকেও সকলে ভাল ছেলে বলে জানে···নয়?

—না। দিব্যেন্দু হঠাৎ যেন খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, আমার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কে কি ভাবল, আমি তো গ্রাহ্য করি না। সত্যি কথা বলতে কি, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আর পাঁচজনের যা ধ্যান-ধারণা—আমার বিদ্যেবুদ্ধিতে তার অধিকাংশই অর্থহীন, যুক্তিহীন কথার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আপনি তো আমার মতো নন! আপনি একে মেয়েছেলে, তার ওপর আবার—

—বিবাহিতা। অঞ্জলি বাধা দিয়ে বলল, কেমন? অন্ততঃপক্ষে, স্বামী দেবতাটির মুখ চেয়ে, আমাকে রেখে ঢেকে চোর সেজে থাকতেই হবে, কেমন? বিশেষতঃ, দেবতাটি যখন আবার স্পষ্ট ভাষাতেই—আমার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব নিয়ে ইঙ্গিত করে ফেললেন, কেমন?

অঞ্জলির উত্তেজনা দেখে দিব্যেন্দুও আর সংযম রক্ষা করতে পারল না। খোলাখুলিভাবেই বলল, বিভূতিবাবুর মনের অবস্থাটা আপনারও বিবেচনা করা উচিত। অসুস্থ স্বামীর কথায় রাগ না করে, আপনার বরং উচিত, আমার সংস্রব ত্যাগ করা।

অঞ্জলি একেবারে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। মিনিটখানেক আড়ষ্টভাবে বসে থেকে সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

দিব্যেন্দু কিন্তু চমকে উঠল। এত কথার পর এ ধরনের নীরবতা সে একেবারেই আশা করেনি ; চমকে উঠে সে বাধা দিল অঞ্জলিকে হাত ধরে।

—একটু বসে যান! অঞ্জলির হাতটা ধরেই দিব্যেন্দু আবার তক্ষুনি ছেড়ে দিল। উৎকণ্ঠিতভাবে বলল, আমাকে ভুল বুঝবেন না—আমার আসল বক্তব্যটা আপনি বুঝতে পারছেন না।

অঞ্জলি বসল না, কিন্তু মুখ তুলে তাকাল।

—আপনার মতো মেয়েকে উপদেশ দেবো, এমন অর্বাচীন আমি নই! দিব্যেন্দু বলল, আপনি শিক্ষিতা মহিলা—নিজের ভাল-মন্দ বিচার করবার শক্তি আপনার নিজেরই যথেষ্ট আছে! আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে, অসুস্থ মানুষের কথায় রাগ করতে নেই ; বরং একটু আধটু মন জুগিয়ে চললে, ফল ভাল হয়। তাছাড়া—

—থামলেন কেন? অঞ্জলি অস্পষ্ট স্বরে বলল, লুন!

—ভেবে দেখুন। দিব্যেন্দু একটা ঢোক গিলে বলল, আমার জন্যে যদি আপনার এতটুকুও ক্ষতি হয়, সেটা আমার পক্ষে কত ইয়ের হবে···আপনি কি বুঝতে পারছেন না?

—না, পারছি না! অঞ্জলি রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, আমার ক্ষতিতে আপনার কষ্ট হবে কেন শুনি? আপনি তো একজন নারী-বিদ্বেষী! আমাদের মতো মেয়ে সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরলেই তো আপনার আনন্দ! আপনাকে আমি জানি না?

—নিশ্চয়ই জানেন! দিব্যেন্দু ভরসা পেয়ে বলল, কিন্তু গালা-

গালিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেবেন ? জমে বসে আরম্ভ করুন না! তাছাড়া আমারও যে একটা কথা জানবার আছে—সাংঘাতিক কথা।

—গালাগালি আপনাকে আমি দিইনি। কিন্তু আপনার কি জানবার আছে শুনি ?

—না বসলে বলবো কি করে ?

—না, আপনি বড্ড জ্বালাতন করেন মানুষকে! অঞ্জলি বিরক্ত হয়ে আবার বসে পড়ল। বলল, কি আপনার সাংঘাতিক কথা, বলুন তাড়াতাড়ি।

—জিজ্ঞাস্যটা এই যে, শ্রীমান বৈজুর সঙ্গে আপনার কতকালের জানাশোনা ?

—তার মানে ?

—মানে, বৈজুর কথাকে বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই তাকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানেন! অন্ততঃপক্ষে, আমার চাইতেও, আপনি যে তাকে বেশি বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে! এখন বলুন, ব্যাপারখানা কি ?

ব্যাপারখানা কি বুঝতে পেরেও, অঞ্জলি দমল না। তার স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকে বলল, এর মধ্যে আবার বৈজু এল কি করে ?

—আমার নারী-বিদ্বেষের কথাটাই বা আপনি জানলেন কি করে ?

—কথাটা যে বৈজুবাবু বলেছে—অঞ্জলি হেসে ফেলেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলল, আপনি কি করে জানলেন, শুনি ? ডাক্তারীর সঙ্গে সঙ্গে পরের ঘরে আড়ি পাতাটাও চালানো হচ্ছে বুঝি ?

দিব্যেন্দুও হাসল। বলল, নারী যে ছলনাময়ী, সে কথাটা আমি জানি। কিন্তু—

অঞ্জলি বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু নারীদের সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা আপনার হলো কি করে শুনি ?

—পরে শুনবেন। আপাততঃ আমার কথার জবাব দিন।

—জবাব আবার কি! অঞ্জলি ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, আপনি নারী-বিদ্বেষী বলেই তো বিয়ে করতে চান না! কবে কে একটা মেয়ে কি করেছে, সেই কথা ভেবেই তো আপনি বুঝে ফেললেন—সব মেয়েই সমান!

—আহা, আবার আমার কথা তুলছেন কেন? নিজের কথাটা বলুন না।

—বলবো আবার কি! অঞ্জলি রাগ করে বলল, আপনাদের পুরুষ জাতটাকে চিনতে আমার বাকি আছে নাকি? উঃ, কি সর্বনেশে লোক। অত ইয়ে করে চা-টা খাওয়ালাম, আর ও কিনা স্বচ্ছন্দে আপনাকে বলে বসল সব কথা।

—পাজি চোলে! শেষে বৈজু বেচারার গলাতেই ঘণ্টা বাঁধলেন! সে বেচারা দিল-খোলা লোক—

—থামুন। অঞ্জলি ধমক দিয়ে বলল, তার দিল-খোলার খবর আমারও জানতে বাকি নেই। আর আপনার প্রবৃত্তিকেও বলিহারী যাই। ওই সব মাতাল চরিত্রহীন লোক আপনার বন্ধু! ছি ছি, আমার তো ভাবতেও ঘেন্না করে।

—ঘেন্না করাই তো উচিত। দিব্যেন্দু গম্ভীরভাবে বলল, এ ম্যান ইজ নোন্ বাই হিস্ কোম্পানী হি কীপ্স্।

—আমি তাই বললাম? অঞ্জলি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

—অন্যায় তো কিছু বলেননি।

—উঃ, আপনি আমাকে···আচ্ছা বেশ! বলেই অঞ্জলি যেন ছুটে চলে গেল।

একান্তে, নির্জন নিশীথে কিংবা জনবহুল রাজপথে একলা পথ চলতে চলতে নিজের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া না করেও পারে না

দিব্যেন্দু। কিন্তু ভাবনার ধারা তার গতি হারায়, পুরুষাকারের চোরাবালিতে—

মাত্র বছর দেড়েক বিদেশ বাসের ফলে, সংস্কারমুক্ত হয়েছিল সে নিঃসন্দেহ! নিঃসংকোচে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারার অভ্যাসটা তার ওদেশে না গেলে হতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু অঞ্জলিও কি ও-দেশের মেয়েদের মতোই সংস্কারমুক্ত? তাই কি? তাই যদি হবে, তাহলে ওর সঙ্গে কথা কইতে এত ভালো লাগে কেন তার?

ওদেশের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে সে ভালো করেই; কিন্তু মেলামেশাটাকে ভালো বলে মনে করতো কি? সামান্য একটু ঘনিষ্ঠতার বিনিময়ে যারা সুলভ হয়ে ওঠে—সেই সব সহজলভ্যাকে সে কি কখনও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ দিয়েছিল? মুহূর্তের ভুলেও, কখনও কি তার মৌখিক ভদ্রতা, অন্তরের অবজ্ঞার চাইতেও প্রবল হয়ে উঠেছিল? কখনও কি সে বিস্মৃত হয়েছিল পিতৃদেবের শিক্ষা, মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা, ভারতীয় সভ্যতার নিগূঢ় তত্ত্ব?

শাস্ত্রজ্ঞ পিতার বৈজ্ঞানিক পুত্র, অঞ্জলি-সমস্যার সমাধান খোঁজে নিজস্ব পন্থায়! অঞ্জলি যদি সত্যিই ওদের মতো হতো, তাহলে, দিব্যেন্দুরও তাকে ভালো লাগত না নিশ্চয়ই। অবশ্য অনাত্মীয় পুরুষ মানুষের সঙ্গে তার অনাড়ম্বর ব্যবহার মাঝে মাঝে সন্ত্রস্ত করে তোলে তাকে। মনে পড়ে যায় পিতৃদেবের মন্তব্য—জননী ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিতা হলেও নিঃশেষে মৃতা নন। মুমূর্ষু জননী তাঁর অনাগত সন্তানের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন। সদ্য বাঁধন-ছেঁড়া পাগলা ঘোড়াগুলো একদিন হোঁচট খেয়ে মরবে নিশ্চয়ই। তুমি যেন ভুলেও কখনও ওদের দলে ভিড়ো না খোকা!

কিন্তু, সন্ত্রস্ত আবার সঙ্গে সঙ্গেই সাহসী হয়ে ওঠে পুরুষকারের দম্ভে। দিব্যেন্দু নিজেকে চেনে ভালো করেই। সুতরাং কোন অন্যায়ই সে করতে পারে না। তবুও যদি কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে এই মেলামেশার জন্যে, তবে, তার জন্যে সাবধান হওয়ার দায়িত্ব

গ্রহণ করুক নারী। ভবিষ্যতের আশঙ্কায় যে লোক ভদ্র মহিলাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে—সে আর যা-ই হোক, পুরুষমানুষ নয় নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ, সে নারী যে নিশ্চয়ই বিপথগামী হয়েছে, এমন কোন প্রমাণ যখন সে পায়নি।

কিন্তু, সে নারী যদি বিপদগ্রস্ত হয়?

দিব্যেন্দু স্থির করেছিল, হাসপাতালে বিভূতিকে দেখতে যাবে সে নিশ্চয়ই; নাহলে, ওই ইতর লোকটার অভদ্র ইঙ্গিতটাকেই সত্য করে তোলা হবে। কিন্তু অকারণ অঞ্জলিকে আর সঙ্গে নেবে না। তার সময়েরও তো একটা মূল্য আছে। তাই সে সেদিন আর, সি, কেমিক্যাল্‌স্‌ থেকে বেবিয়ে, বৈজুব বাড়িতে গিয়েই চেপে বসল। উদ্দেশ্য, বৈজুর ইনজেক্‌শনের ব্যাপারটা সেরে সেইখান থেকেই হাসপাতালে চলে যাবে, চাবটে বাজাব পব।

অঘটনটা বৈজুও লক্ষ্য করল। চোখ মিটমিট করে বলল, কি রে, বাড়ি যাবি না? বন্ধুনী যে অপেক্ষা করছে।

দিব্যেন্দু উত্তর দিল না, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল।

বৈজু গ্রাহ্য করল না। বলল, কি ব্যাপার বাবা, খুলেই বলোনা। অন্য দিন তো দেখি, ইনজেক্‌শনের নীড্‌ল্‌ ঢুকল কি ঢুকলো না—তুই কোন রকমে মোট নামিয়ে ঘর-মুখো ঘোড়া হোস। আজ হঠাৎ চেপে বসলি যে? স্ত্রীকে ট্যাকে করে স্বাস্থ্য দেখাতে নিয়ে যাবিনি?

দিব্যেন্দু তবুও কোন কথা কইল না; কিন্তু, মুখের অবস্থা হয়ে উঠল আরও সাংঘাতিক।

বৈজু এবার ভড়কালো। বলল, চ্যাচামেচি করিসনি ভাই, আমার কথাটা শোন। মেয়েটা যেমনি বোকা, তার স্বামীটা ঠিক তেমনি পাজি মনে রাখিস। তুই নতুন এসেছিস এ দেশে, কোল-কেত্তিয়া কেচ্ছা তো আর জানিস না। এখানে একদল মিস্টার আছে

যারা তাদের মিসেসকে বেচে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ায়। আর কিছু না জানিস, মামার কেচ্ছাটা তো শুনেছিস? তুই পালা ভাই ও বাড়ি ছেড়ে। আমার সত্যিই বড় ভয় করছে তোর জন্যে।

মামার কেচ্ছার ইঙ্গিতটায় একটু কাজ হলো। দিব্যেন্দুর মনে পড়ল, কয়েক বছর পূর্বে যে ভদ্রমহিলাটি ভগবানবাবুর রক্ষিতা ছিলেন, তাঁর স্বামী দেবতাটি সত্যিই ভীষণ ফ্যাসাদে ফেলেছিলেন ভগবানবাবুকে। স্ত্রীর মারফৎ অজস্র টাকা তিনি প্রতি মাসে উপার্জন করতেন। কিন্তু অনায়াস উপার্জনের নেশাটা তাঁকে একদিন উন্মাদ করে ফেলল। দাবী করে বসলেন এক থোকে দশ হাজার টাকা। বলা বাহুল্য, ভগবানবাবু সম্মত না হওয়াতে, ভদ্রলোক এ্যাডালটারী চার্জের ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করেছিলেন। সেই খেশারত দেওয়ার পর থেকে ভগবানবাবুও আর কখন উন্নত সমাজের সামাজিক হবার চেষ্টা করেননি—বর্তমানে কারবার করেন বনেদীবংশের মানুষ নিয়ে।

কিন্তু এ সবের সঙ্গে দিব্যেন্দুর সম্পর্ক কি! ভগবানবাবু তাঁর নির্বুদ্ধিতার খেশারত দিয়েছেন; কিন্তু তার মনের অগোচরে তো কোন মতলবের বালাই নেই। তবে সে পালাতে যাবে কেন?

—আমি পালাব? দিব্যেন্দু গম্ভীরভাবে বলল, কথাটা তুই আমাকে বলতে পারলি?

শুনে বৈজুও যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে সে বলল, তা ঠিক! ঠাকুরবাবার ছেলে তুই—তুই পালাতে যাবি কোন দুঃখে? ঠিক আছে! চেপে বসে থাক তুই; বোধহয় ওদেরই পালাতে হবে শীগগির!

—তার মানে? দিব্যেন্দু কিছু বুঝতে না পেরে বলল, ওদের পালাতে হবে কেন?

—বাঙালী বলে, খাতির-জমায় এসেছিল বলে, সেলামী দেয়নি

বলে। বৈজু গম্ভীরভাবেই বলল, মামার মতলবটা বোধহয় আমি বুঝতে পেরেছি।

—কি বুঝতে পেরেছিস, খুলে বল না ছাই।

—গত মাসে ওরা ভাড়া দেয়নি—আমাকে পরে আসতে বলেছিল। এ মাসেও ওদের ভাড়া আদায় করতে যায়নি কেউ। এইভাবে আরও মাস দু'য়েক কাটিয়ে দিতে পারলেই মামা কার্যোদ্ধার করে ফেলবে। বুঝতে পারছিস কিছু? বিভূতি লোকটারও এখন চাকরি নেই, তার ওপর অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে হাসপাতালে। বুঝলি কিছু?

—বুঝেছি' দিব্যেন্দু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল।

দিব্যেন্দুকে দেখে বিভূতি বলল, আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

অঞ্জলির অনুপস্থিতির জন্যে বিভূতি কোন প্রশ্ন করল না দেখে দিব্যেন্দু একটু আশ্চর্য হলো। বলল, কি ব্যাপার? আমাকে নিয়ে আবার ভাবনার কি হলো?

বিভূতি বলল, আপনি তো সন্ধ্যাহ্নিক-টাহ্নিক করেন দেখেছি! ধর্মশাস্ত্র-টাস্ত্রও নিশ্চয়ই অনেক আছে আপনার স্টকে·

—অনেক না হলেও, কিছু আছে বৈকি। হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছেন যে?

—আমাকে কিছু পড়ান দেখি!

বিব্যেন্দু এবার সত্যিই হকচকিয়ে গেল। বলল, ধর্মশাস্ত্র পড়বেন আপনি? হঠাৎ হলো কি আপনার?

—কি আবার হবে। বিভূতি সহজভাবেই বলল, তবে হ্যাঁ—আপনার স্নাবিংটা আমাকে একটু চিন্তিত করেছে নিঃসন্দেহ। আমি পণ্ডিতজীর ডিস্‌কভারি পড়েছি; কিন্তু টিকিধারীগুলো হিন্দুস্থানকে

বর্ষস্থান কেন বলে, সে সম্বন্ধে সত্যিই কিস্যু জানি না। আপনি দিন কতক গুরুগিরি করুন দেখি আমার।

দিব্যেন্দু বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিভূতির দিকে। তারপর বলল, কিন্তু আপনিই তো বললেন সেদিন, ও সব রাবিশে বিশ্বাস করেন না।

—কিন্তু, জেনে রাখতেই বা দোষ কি?

—কিন্তু অশ্রদ্ধা নিয়ে কি কোন কিছুকে জানা যায়?

—যায় না?

—না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। আপনি কি ক্যাপিট্যাল পড়ে, তারপরে মার্কসবাদী হয়েছিলেন? না, না পড়েই তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন?

দিব্যেন্দুর প্রশ্নটার মধ্যে যে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, তাকেই প্রকট করে তুলল বিভূতি—ভুল বুঝে। একেবারে যেন ভেঙে পড়ে বলল, দেখুন, মানুষমাত্রেই ভুল করে! আমিও ভুল করেছিলাম। কিন্তু ভুল সংশোধন করবার মতো সৎ সাহসও আমার আছে জানবেন। তবে দুঃখুটা কি জানেন, দুনিয়াটাকে সত্যিই যখন চিনতে পারলাম, তখন, করবার মতো কিছুই আর আমার মধ্যে রাখলেন না আপনাদের ভগবান। আই অ্যাম সিমপ্লি ফিনিসড্—টোট্যালি রুইণ্ড—

ব্যাপার দেখে বিচলিত হলো দিব্যেন্দু। বিভূতির কপালের ওপর একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, এ সব কি বলছেন যা তা? নিষ্ঠার সঙ্গে কোন মতবাদকে মেনে চলার মধ্যে ভুল তো কিছু নেই। হঠাৎ এতো ভেঙে পড়ছেন কেন? আপনি ক্রমশঃই সেরে উঠছেন। ক'দিন পরেই বাড়ি যাবেন, আবার কাজকর্ম করবেন। এর মধ্যে ফিনিসড্ হবার কি আছে?

বিভূতির চোখদুটো চকচক করছিল। হাত দিয়ে পুঁছে নিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, যাক ওসব কথা। আপনি আবার কাল

আসবেন তো? আসবার সময় বই-টই কিছু নিয়ে আসবেন। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না।

—বেশ তো! দিব্যেন্দু সান্ত্বনা দিয়ে বলল। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, হঠাৎ হলো কি বিভূতির। বিশেষতঃ, এতক্ষণের এত কথাবার্তার পরেও একবারও সে অঞ্জলির না আসার কারণটা জিজ্ঞাসা করল না কেন? শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নিজেই বলল, আজ দেখছি মিসেস হালদার এলেন না!

—না। বিভূতি সংক্ষেপে বলল।

—হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়েই আসা হলো না তাঁর। আমি সটান কারখানা থেকেই চলে এলাম কিনা।

—হুঁ। বিভূতি অন্য কথা পাড়ল, কাল থেকে গুরুগিরিটা কোন লাইনে কোরবেন ঠিক করলেন? আমি কিন্তু মশাই সংস্কৃত একেবারে জানি না।

—সে সবের জন্যে ভাববেন না! কিন্তু—দিব্যেন্দু কথাটা শেষ করতে পারল না। রুগ্ন মানুষকে বাড়ি ভাড়ার কথা বলে উৎকণ্ঠিত করে তোলাটা উচিত হবে কিনা, ভেবে ইতস্ততঃ করল।

—কিন্তু কি? বিভূতি জিজ্ঞাসা করল!

—ভাবছিলাম, মিসেস হালদার আজ এলেন না কেন?

—নাঃ, আপনি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ! বিভূতি একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, বুঝতে পারছেন না? এখন আর আমার দাম কি? কিসের লোভে আমার খবর নিতে আসবে সে? এখন তো আমি একটা…আবর্জনা!

—এই আবার পাগলামী আরম্ভ করলেন তো!

—পাগলামী নয় দিব্যেন্দুবাবু! বিভূতি উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, সে আমার স্ত্রী। আমি তাকে ভাল করেই জানি। একদিন যখন আমি তার জন্যে পাঁচ সাতশো টাকা খরচ করতাম মাসে, তখন ভাল ব্যবহার পেয়েছিলাম। তারপর একদিন হঠাৎ যখন নিঃস্ব

হলাম, তখনও স্বামী হিসাবে খাতিরটুকু সে বজায় রেখেছিল—একটা চাকরি জোটাতে পেরেছিলাম বলে! কিন্তু এখন? কপর্দক-শূন্য বেকার—একটা অসহায় রুগ্ন মানুষ মলো কি বাঁচল তার জন্যে তো তার ভারি মাথাব্যথা! দেখুন না, হয়তো শীগগিরই সেপারেশানের নোটিশ ছাড়বে।

—চুপ করুন! দিব্যেন্দু ধমক দিয়ে বলল, ক্ষেপে গেলেন নাকি! কি সব বাজে বকছেন? আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত!

দিব্যেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে বিভূতি আর কিছু বলতে ভরসা করল না। কিন্তু চোখদুটো তার আবার সজল হয়ে উঠল।

আজ একরকম, কাল আর এক রকম! এ হেন বিচিত্র মেজাজের মানুষের ওপর কতক্ষণ আর রাগ করে থাকা যেতে পারে! যাবার সময় দিব্যেন্দু তাই বলে গেল, মন খারাপ করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আছি!

আমি তো আছি, না মরে গিয়েছি? দিব্যেন্দু ধমকে উঠল বাহাদুরকে, হতভাগা গাধা কোথাকার! বাড়িতে এত বড় একটা কাণ্ড হচ্ছে, আর খবরটা আমাকে জানানোর কথা মনে পড়ল না তোমার?

বাহাদুরের ছোট্ট চোখদুটির মধ্যে সন্ত্রাস ঘনিয়ে এল। কিন্তু, বেচারা বুঝতে পারল না, অপরাধটা তার কি!

দিব্যেন্দুরও আর কথা কইবার অবসর ছিল না। ঘড়িতে চারটে বাজছিল। সে তাড়াতাড়ি দোতলায় নেমে গিয়ে অঞ্জলির ঘরে ঢুকল। বলল, কি ব্যাপার? আজও হাসপাতালে যাবেন না নাকি?

অঞ্জলি শুয়েছিল। উঠে বসে বলল, না। আপনিও স্টাডি করার নেশাটা ছাড়লে সুখী হবো।

—কিন্তু আমার স্টাডি করার নেশাটা তো আপনাকেই সুখী করবার জন্যে।

—ও চেষ্টা না করলেই আরও সুখী হবো আমি।

—নাঃ, আপনার রাগ দেখছি সাংঘাতিক! এইটুকু ছোট্ট শরীরে এত রাগ পোষেণ কি করে বলুন তো!

অঞ্জলি জবাব দিল না। কেমন যেন উদাসীনের মতো চেয়ে রইল বাইরের বারান্দার দিকে।

—বাজে কথা যাক্, একটা কাজের কথা শুনুন! দিব্যেন্দু খুব সহজভাবেই বলবার চেষ্টা করল—আজ আর উনুনটা ধরাবেন না দয়া করে।

—তার মানে? অঞ্জলি যেন চমকে উঠে ভুরু কোঁচকাল।

—মানে, একটা নেমন্তন্ন আছে আমার। দিব্যেন্দু একটা ঢোক গিলে বলল, কিন্তু, আমি তো কোথাও পংক্তি ভোজন করি না; তাই, ওরা খাবারটা সঙ্গে দিয়ে দেয়। আমি একলা মানুষ, কিন্তু খাবার দেয় তিন-চারজনের মতো। তাই বলছিলাম আর কি—রাত্তিরে দু'জনে মিলে ওটার সদ্ব্যবহার করা যাবে! বুঝলেন, উনুনটা আর ধরাবেন না।

দিব্যেন্দু কথাটা বলেই চট্ করে বেরিয়ে গেল। অঞ্জলিও উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর, ওপরে গিয়ে বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করতেই, ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে।

—এর মধ্যে আমার কসুরটা কি হলো মাই! বাহাদুর অসহায়ের মতো বলল, আমি আপনাকে চিনি দিয়ে ওপরে আসতেই, মালিক জিজ্ঞাসা করলে ব্যাপার কি? আমি বঁললাম, মাইজী নুন দিয়ে ছাতু খেতে পারে না, তাই চিনি দিয়ে এলুম।

—অঞ্জলি ছাতু খাচ্ছে নাকি? কেন? কবে থেকে?

—দু'তিন দিন থেকে খাচ্ছে। শুনেই, মালিক যেন একেবারে ক্ষেপে গেল। বললে, আমাকে বলিসনি কেন? আমি কি মরে গেছি? বলুন তো মাইজী, এর মধ্যে আমার দোষটা কি হলো?

শুনে অঞ্জলি একটু হাসল। বাহাদুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,

দুঃখু করো না বাহাদুর। জানই তো, মালিক তোমার মাঝে মাঝে বড্ড ছেলেমানুষী করে ফেলে।

—বিল্‌কুল, বাচ্চে কা মাফিক্। বাহাদুর আশ্বস্ত হয়ে বলল, মগর দিল ভি হ্যায় দেওতাকা মাফিক্।

—হ্যাঁ, একেবারে শিশু ভোলানাথ! তুমি তোমার মালিককে খুব ভালোবাস, না বাহাদুর?

—জী?—কথাটা বোধগম্য না হওয়ায়, বাহাদুর হাঁ করে চেয়ে রইল।

—কিছু নয়। এখন একটু চা চড়াও দেখি। না থাক, লস্যি করো দেখি। দেখি, কেমন খেতে লাগে!

—বহুৎ খুব! বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল; অঞ্জলিও গেল তার সঙ্গে।

সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই দিব্যেন্দু বাড়ি ফিরল ট্যাক্সি করে। সঙ্গে একটা টিফিন্ ক্যারিয়ারে ঠাসা, হরেক রকমের খানদানী খাদ্য! দেখে, অঞ্জলি বলল, নেমন্তন্ন বাড়ির ব্যবস্থাটা তো বেশ! সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই খাবার দিয়ে দেয় সঙ্গে!

—ও সব আপনি বুঝবেন না! দিব্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল, মাড়োয়াড়ীদের ব্যাপার বাঙ্গালীর মতো নয়।

—মাড়োয়াড়ীরা আজকাল বিরীয়ানীও খায় নাকি? দোপেঁয়াজাটা তো দেখছি খাঁটি মুরগীর।

—বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার? দিব্যেন্দু হঠাৎ যেন রেগে গেল। হুংকার দিয়ে বলল, বাহাদুর নিয়ে আয় তো ক্যারিয়ারটা।

—ওমা, বিশ্বাস হবে না কেন?

—এই দেখুন! দিব্যেন্দু প্রমাণ দেখিয়ে তবে ছাড়ল। বৈজুর নাম লেখা রয়েছে ক্যারিয়ারে। বিশ্বাস হয়েছে তো? এবার আসুন, আরম্ভ করা যাক।

—এর মধ্যেই খেতে বসবেন? অন্যদিন তো—

—না না, এক্ষুনি আরম্ভ করতে হবে। পেটে আমার আগুন জ্বলছে।

অগত্যা অঞ্জলি আসন পেতে দিব্যেন্দুর খাবার গুছিয়ে দিতে আরম্ভ করল।

—একি! দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনার কই?

—ওমা, আমি আপনার সামনে বসে খাব নাকি?

—কেন খাবেন না? সেদিন তো চা খেলেন। না না, ও সব ফন্দি চলবে না আমার কাছে।

—না না, লক্ষ্মীটি! অঞ্জলি আরক্তমুখে বলল, সে আমার বড় বিশ্রী লাগবে।

—বিশ্রী লাগবে? কেন?

—সে আপনি বুঝবেন না। আপনি আগে খেয়ে নিন, তারপর—

—বাঃ, আর আমার বুঝি একটু ইচ্ছে করতে নেই?

—না, ইচ্ছে করতে নেই। অঞ্জলি মুখ টিপে বলল, এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে নিন দেখি।

দিব্যেন্দু আর জোর করল না, কিন্তু সন্দেহের দোটানায় পড়ল। সামনে বসে খেতে বাধ্য হলে, অঞ্জলি হয়তো লজ্জায় ভাল করে খাবে না। ওদিকে, আড়ালে গিয়ে একেবারেই হয়তো খাবে না,— দিব্যেন্দুর মতলব বুঝতে পেরে। অগত্যা—

তাকে খাইয়ে, অঞ্জলি রান্নাঘরের দিকে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে সে-ও গিয়ে উঁকি মারল। দেখল, টিফিন ক্যারিয়ারটার দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে অঞ্জলি চুপটি করে বসে রয়েছে হাঁটুর ওপর মুখটি রেখে।

পায়ের শব্দে অঞ্জলি মুখ তুলে তাকাল। তারপর হাসিমুখেই উঠে এল ঘরের বাইরে। বারান্দার আবছা আঁধারে এসে, ফিসফিস করে সে বলল, অসভ্য ছেলে, মেয়েদের খাওয়া দেখতে আছে বুঝি?

কিন্তু দিব্যেন্দুর মনের ভাব তখন ভিন্নমুখী হয়েছিল। উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলল, আপনার চোখ দুটো অত লাল দেখলাম কেন? কি হয়েছে আপনার? সত্যি করে বলুন আমাকে।

—ও কিছু নয়, নুনের হাতটা চোখে লেগে গিয়েছিল।

—নুনের হাত?

—হ্যাঁ! বলেই অঞ্জলি হঠাৎ দিব্যেন্দুর একটা হাত ধরে আকর্ষণ করল। বলল, বাবাঃ! কি খুঁতখুঁতে লোক আপনি! এখন চলুন তো নিজের ঘরে। কাজ-কর্ম সব চুলোয় গেল, কেবল ইয়ে···

—কিন্তু, আপনি খেলেন না কেন? অঞ্জলির আকর্ষণে দিব্যেন্দু দু'পা এগোল।

—ওমা, এর মধ্যে খাব কি? দিব্যেন্দুর হাত ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি বলল, সবে সন্ধ্যে! এর মধ্যে খিদে পাবে কেন!

—তা ঠিক, ছাতুতে খিদে নষ্ট করে খুব! বলে দিব্যেন্দু গম্ভীর-ভাবে নিজের ঘরের দিকে এগোল, কিন্তু ঘরে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল সে। এগিয়ে এসে, একেবারে অঞ্জলির বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর তার কাঁধের ওপর দুটো হাত রেখে, রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কিন্তু, সময় হলে···সত্যিই খাবেন তো···

—খাব বৈকি! অস্পষ্ট গলায় উত্তর দিল অঞ্জলি।

শুনেই, দিব্যেন্দু যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বড় বড় পা ফেলে চলে গেল নিজের ঘরে।

কাজ-কর্ম সত্যিই চুলোয় গেল! রশুনের ভারচ্যু সম্বন্ধে কিছু পড়া-শোনা করবার প্রয়োজন ছিল দিব্যেন্দুর। একস্ট্রা ফারমাকোপিয়ায় বিবৃত জেন্-সিয়ানের সঙ্গে রশুণের ভারচ্যুর তুলনাত্মক মিল খুঁজে দেখবার জন্যে, সেইদিন সকালেই সে একসেট্ প্রমদা বিশ্বাসের বই কিনে এনেছিল শিয়ালদার একটা পুরোণ বইয়ের দোকান থেকে। বইগুলো ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাই, অনেক

টাকা কবুলে, অনেকদিনের তদ্বির-তল্লাসের পর বইগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছিল সে। সন্ত সংগৃহীত বইগুলো সম্বন্ধে আগ্রহেরও সীমা ছিল না তার। কিন্তু, কি যে হলো মাথার মধ্যে, বাঙলা হোমিওপ্যাথী বইয়ের সহজ সরল ভাষার একটা অক্ষরও তার মনে দাগ কাটল না, সারারাত ধরে অবিরাম চেষ্টা করা সত্ত্বেও!

ক্রমে, নীচুতলায় সাড়া জাগল। মোটর-জীবী শিখের দল তৎপরতার সঙ্গে কাজে বেরোবার তোড়জোড় আরম্ভ করল। সদরে কর্তার সিংয়ের ভেঁপু বেজে উঠল তার রোজকার যাত্রিনীদের ডাক দেবার জন্যে। মৃদুস্বরের অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী···শুনে বোঝা গেল, এ বাড়ির ভূতপূর্বা বাড়িওয়ালী অন্ধ মেনকা দাসী, তার দৌহিত্রীর হাত ধরে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল, রোজকার মতো বাবুঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, তেতলার সিঁড়ির দরজাটাও খুলে গেল। রোজকার মতো বাহাদুরও বেরিয়ে গেল কর্তার সিংয়ের ভেঁপু শুনে, মালিকের জন্যে খাঁটি দুধ আনতে বেলতলার খাটাল থেকে। দিব্যেন্দুরও শ্রান্ত মস্তিষ্ক ঝিমঝিম করে উঠল নির্বাণোন্মুখ শুকতারাটার দিকে তাকিয়ে। আজ এ কি হলো তার! সারাটা রাত কেটে গেল—অকারণে?

কেন, কেন এমন হলো? ক্লান্তিতে চোখদুটো বুজে আসে দিব্যেন্দুর। অসহায়ের মতোই শয্যায় এলিয়ে পড়ে সে। তারপর—

ধড়মড় করে উঠে বসে পাতলা পায়ের অস্পষ্ট শব্দ শুনে! চুপি চুপি ঘরে ঢুকে, তারই পায়ের কাছে বসে পড়ে অঞ্জলি।

দিব্যেন্দু সরে বসতে ভুলে যায়। কিন্তু অঞ্জলি নিশ্বাস ফেলে যেন হাপরের মতো। বলে, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। কত চেষ্টা করলাম।

—আমিও! দিব্যেন্দুর অজান্তেই যেন কথাটা বেরিয়ে যায়!

—কেন এমন হয়? অঞ্জলির কণ্ঠস্বর যেন নিস্তেজ হয়ে আসে।

দিব্যেন্দু উত্তর দেয় না, অভিভূতের মতো তাকিয়ে থাকে

পূর্বাকাশের দিকে। শুকতারাটাকে দেখতে পায় না, নজরে পড়ে একটা সর্বব্যাপী আরক্ত আভা। হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গে তার। আঁতকে ওঠে বাইরের দিকে তাকায়।

—বলো না, কেন এমন হলো! অঞ্জলি যেন হাঁপিয়ে ওঠে দিব্যেন্দুর নীরবতা দেখে।

—এ যে—দিব্যেন্দুর মনে হলো কি যেন কি একটা কঠিন অনুভূতি, তার করোনারী ভেসল-এ গিয়ে ধাক্কা মারছে! থ্রম্বসিসের রোগীর মতোই আড়ষ্ট গলায় সে বলে উঠল, এ যে হওয়া উচিত নয়—এ যে অন্যায়—এ যে অপরাধ।

কথাগুলো অঞ্জলির শ্রুতিগোচর হলো কিনা দিব্যেন্দু ঠিক বুঝতে পারল না; সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, অঞ্জলির উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি ক্রমে কেন্দ্রীভূত হলো ঘরের মধ্যেই। জলের কুঁজোটার দিকে মিনিট-খানেক তাকিয়ে থেকেই সে যেন সচেতন হয়ে উঠল পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে। তারপর চট করে উবু হয়ে বসে পড়ে জল গড়িয়ে খেল এক গেলাস—আলগোছে।

—উঃ, কি নেমন্তন্নই খাওয়ালেন! গেলাস রেখে দিয়ে অঞ্জলি বলল, সমস্ত রাত যে কি করে কাটল! ও সব বিরীয়ানী কি বামুনের পেটে সয়?

—খুব অস্বস্তি লাগছে নাকি? দিব্যেন্দু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসা করল, বায়ু হয়েছে?

—বোধ হয়।

—তাহলে এইটে খেয়ে ফেলুন! দিব্যেন্দু শেলফ থেকে একটা টাইকো-সোডার শিশি নিয়ে এগিয়ে এল।

অঞ্জলি হাঁ করল। অগত্যা, দিব্যেন্দু দুটো বড়ি ফেলে দিল তার মুখে।

—মেগোঃ, কি ঝাঁজ! অঞ্জলি মুখ বিকৃতি করে দরজার দিকে এগোল।

—এক ঢোক জল খেয়ে ফেলুন!

অঞ্জলি জল না খেয়েই বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আজ কি হবে? রোজ রোজ তো আর নেমন্তন্নর দোহাই পাড়া চলে না। দিব্যেন্দু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল: না, আত্মহত্যা করবার মতো মেয়ে অঞ্জলি নয়। কিন্তু আত্মসম্মানের বালাই নিয়ে অমন একটা মেয়ে অনাহারে তিলে তিলে মরবে এ চিন্তাও যে অসহ্য। অথচ, সব দিক বাঁচিয়ে, কি যে করা যেতে পারে ওর জন্যে তাও তো মাথায় আসে না তার!

ঘণ্টাখানেক পরে একটা মতলব মাথায় এল। বাহাদুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, মাইজী কি করছে রে?

—দরজা বন্ধ করে বোধ হয় নিদ যাচ্ছে।

—একটা কাজ কর। একজনের মতো চিড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা কর। মাইজী উঠলে বলবি, আপনার পেট গড়বড়িয়েছে, তাই মালিক হুকুম করে গেছে, আপনাকে চিড়ে-দই খেতে। বুঝলি? আর যদি খেতে গররাজী হয়, তাহলে মাছের ঝোল-ভাত খাওয়াবি। বুঝলি? মোদ্দা, হয় চিড়ে-দই না হয় মাছের ঝোল-ভাত, দুটোর মধ্যে একটা ওকে খাওয়াবি নিশ্চয়ই। না খেতে চাইলে বলবি, আপনি গররাজী হলে মালিক আমার জান নিয়ে নেবে। বুঝলি?

—জী।

—আজ তাহলে স্রেফ মাছের ঝোল-ভাতই রাঁধ তাহলে। বলে দিব্যেন্দু তখনকার মতো কারখানায় বেরিয়ে গেল। দুপুরে ফিরে দেখল অঞ্জলির ঘরে তালা বন্ধ। বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করল, মাইজী কোথায় গেল রে?

—জানি না তো!

—খাইয়েছিলি? কি খাওয়ালি?

—মাছের ঝোল-ভাত।

শুনে দিব্যেন্দুও নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বসল। কিন্তু রাত-জাগা শরীর নিয়ে গেল কোথায় মেয়েটা? সাধারণতঃ বাড়ি থেকে তো বেরোয় না অঞ্জলি। আজই হঠাৎ কি কাজ পড়ল তার!

বিকেলেও বাড়ি ফিরল না অঞ্জলি। দেখে দিব্যেন্দু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, শেষে একলাই বেরিয়ে পড়ল হাসপাতালের দিকে।

ওদিকে বিভূতিও উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। দিব্যেন্দুকে দেখেই বলে উঠল, কি সর্বনেশে কথা মশাই, সিংহল আর লঙ্কা এক নয়?

গতকাল বিভূতিকে একখানা বই দিয়ে গিয়েছিল সে। মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর লেখা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একখানা প্রবন্ধ-গ্রন্থ। বুঝতে পারল, বইখানা ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে বিভূতি।

—গ্রন্থকার যোজনের মাপ দেখিয়ে যা প্রমাণ করেছেন, তাতে তো দেখা যাচ্ছে, রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ছিল ইকোয়েডারের কাছে। তাহলে, রুই-কাতলারা সিংহলকে লঙ্কা বলেন কেন?

—কি করে বলবো? দিব্যেন্দু বলল, কীর্তিবাসেও পড়েছিলাম, সিংহল দ্বীপের রাজা সুমিত্র মহামতী, সুমিত্রা তনয়া তাঁর অতি গুণবতী। অর্থাৎ, সিংহল আর লঙ্কা এক নয় বা বিজয়সিংহের নাম থেকেই সিংহল নাম হয়নি। এ ছাড়াও, আরও দুটো লঙ্কাদ্বীপের কথা লেখা আছে আমাদের দেশের পুরোন সংস্কৃত গ্রন্থে—শুধু লঙ্কা আর শ্রীলঙ্কা···

—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কি? পণ্ডিতরা সব একাকার করেছেন কেন?

—পণ্ডিতরাই জানেন, আমি মুখ্যু মানুষ জানব কি করে? কিন্তু এদিককার ব্যাপার কি? কবে ছাড়া পাচ্ছেন?

—পুলিসের হাঙ্গাম তো মিটে গেছে; এখন হাসপাতাল-কর্তাদের মর্জি! আপনি একবার জিজ্ঞেস করে আসুন না অফিসে গিয়ে।

—যাচ্ছি। কিন্তু—দিব্যেন্দু একটু সংকোচভরেই জিজ্ঞাসা করল, ওদিককার কি হবে? দু'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছে। মিসেস হালদারও ভাত ছেড়ে ছাতু ধরেছেন দেখলাম। আপনি কিছু ভেবেছেন?

—ভাবছি বৈকি! বিভূতিও গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, কিন্তু ভেবে কিছুই কূল-কিনারা পাচ্ছি না। দুঃখু হয় মেয়েটার জন্যে। এক সময় মাসে সাতশো টাকা পর্যন্ত ওর হাতে দিতাম। কিন্তু···তা, ও বেচারার আর দোষ কি! গরিবের মেয়ে, হবিষ্যির ভাত আর শাক-চচ্চড়ি ছাড়া তো কখনও কিছু খায়নি; মোটা শাড়ি ছাড়া আর তো কিছু জোটেনি; সিনেমা দেখেনি; মোটরে চড়েনি; কখনও দোতলা বাড়িতে পর্যন্ত বাস করেনি।

—ও সব তো গেল অতীতের কথা। দিব্যেন্দু বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু বর্তমানের কি হবে?

—কী হবে আবার! দেশে, কাকা সর্বস্ব গ্রাস করেছে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ গত পাঁচ-ছ'মাস যাবৎ। অফিস উঠে গেছে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডও উবে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সুতরাং—

—আপনার শ্বশুরবাড়িতে একবার খবর দিলে হতো না?

—আউট অফ দি কোশ্চেন। বিভূতি যেন আঁতকে উঠল। বলল, ও লাইন মাড়াবেন না কখনও। ভীষণ কাণ্ড হবে।

—হয় হবে। দিব্যেন্দু হেসে বলল, আপনাকে তো আর সহ্য করতে হবে না! কোথায় থাকেন তাঁরা?

বিভূতি ঠিকানাটা বলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার সাবধান করে দিল দিব্যেন্দুকে, সৃষ্টিছাড়া জীব তারা। আমার কথা শুনুন, খবরদার ও লাইন মাড়াবেন না।

—তাহলে কোন লাইন ধরবো সেটা বলুন? দিব্যেন্দু বিরক্তি চেপে বলল, আপনি যে পার্টির কর্মী ছিলেন, তাঁদের কাছে গেলে হয় না?

—ও শালাদের নাম করবেন না আমার কাছে। বিভূতি যেন খেঁকিয়ে উঠল। বলল, আপনি জানেন না, কাদের জন্যে আজ আমার এই অবস্থা!

—তাহলে এদিককার অবস্থাটা কি হবে, সেটা বলুন! দিব্যেন্দু আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না। বলল, ছাতু কিনতেও তো পয়সা লাগে! বস্তীতে গিয়ে উঠলেও তো ভাড়া দিতে হবে!

—আমি তার কি করবো? ফুস মন্তরে টাকা-পয়সা করবো আসমান থেকে? দু'দিনের জন্যে, হাড়-গোড় ভেঙ্গে হাসপাতালে পড়ে আছি, তাও তাঁর সহ্য হবে না? এক্ষুনি টাকা চাই? চাই তো নিজেই তার ব্যবস্থা করুন না! তিনি তো একজন আপ-টু-ডেট মহিলা! আজাদ হিন্দে ওঁদেরই তো বাজার গরম! আমি বিছানায় শুয়ে রোজগার করবো? না পারলে, রুগ্ন স্বামীকে স্ত্রী একবার দেখতেও আসবে না?

—থামুন থামুন, উত্তেজিত হবেন না! দিব্যেন্দু বিভূতির একটা হাত ধরল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপনি তাঁর কথাটাও একবার ভেবে দেখুন! ছাতু খেয়ে যাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, সে কি করে এতখানি পথ হাঁটবে! থাকগে, আপনি এ সব নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না, আমি তো আছি!

আমি তো আছি—বলে বিভূতিকে সান্ত্বনা দেওয়া যত সহজ, ঠিক তেমনি কঠিন মনে হয়, অঞ্জলিকে উপযাচক হয়ে কিছু বলতে। কেমন যেন সন্ত্রাস জাগে দিব্যেন্দুর। কেবলি মনে হয়, যেটুকু জানা জেনেছে সে অঞ্জলির সম্বন্ধে, সেটুকু কিছুই নয়—আরও অনেক কিছুই আছে, যা সে আজও জানতে পারেনি! তার বাসনা উদগ্র হয়ে ওঠে সেই অজানাকে জানতে, কিন্তু ভয় পায়। অথচ কেন যে ভয় হয় তাও বুঝতে পারে না যুক্তি দিয়ে। তাই, সমস্ত দিন বাইরে কাটিয়ে অঞ্জলি যখন বাড়ি ফিরল রাত্তির করে, সে উপযাচক হয়ে

তার কাছে যেতে পারল না কারণ জিজ্ঞাসা করতে। পরের দিন সকালে আবার যখন সে বেরিয়ে গেল ঘরে তালাবন্ধ করে, তখনও সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা করল না, সাহস করল না বাহাদুরের মারফত খাওয়ার কথা বলতে। এতদিনকার অভ্যাস বদলে যে মেয়ে হঠাৎ নিজে থেকে দেখা দেওয়া বন্ধ করে, তাকে উপযাচক হয়ে দেখা দিতে দিব্যেন্দুর সাহস নয়, কেমন যেন সংকোচ হয়।

সাহস নয়, সংকোচের কথাটা ভেবেই দিব্যেন্দু যেন একটু স্বস্তি পায়! আরও আস্বস্ত হয় তৃতীয় দিন সকালে।

আগেকার মতোই ছাদে এল অঞ্জলি ভিজে জামা-কাপড় রোদে মেলে দিতে। দিব্যেন্দুকে মুখ ভার করে বসে থাকতে দেখে সে একটু মুখ টিপে হাসল। তারপর ছাদের কাজ সেরে ঘরে এসে ঢুকল হাসিমুখে। চুপি চুপি বলল, অমন হাঁড়ি-মুখ করে বসে আছেন যে?

দিব্যেন্দু গম্ভীরভাবে বলল, আপনাকে তো হাঁড়ি-মুখের দিকে চাইতে মাথার দিব্যি দিই নি!

—ওরে বাবা, একেবারে ফোঁস্! অঞ্জলি একটা ঝাঁকানি দিয়ে ভিজে চুলগুলো ঠিক করে নিল। তারপর বলল, আচ্ছা, আর রাগ করতে হবে না, হাঁড়ির মুখের সরা খুলুন।

—কী আশ্চর্য! দিব্যেন্দু আরও গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার ওপর আমি রাগ করতে যাব কী দুঃখে?

—ওঃ, দুঃখু কিছু নেই তাহলে?

—কিছুমাত্র নয়।

—তাহলে মশাই হাঁড়ি-মুখ করে রয়েছেন কেন?

—কারণ আছে নিশ্চয়ই! কিন্তু, মহাশয়ার ব্যাপারখানা কি? এতদিন ছিলেন কোথায়, জানতে পারি?

—এতদিন! কতদিন বলুন তো?

—তা, দুপো ঘণ্টা হবে বৈকি! কোথায় গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম দীপালির কাছে। অঞ্জলি ফরাসের একধারে বসে পড়ে বলল, দীপালি আমার সঙ্গে পড়ত। আই. এ. পাশ করে টিচারী নিয়েছিল কর্পোরেশনে।

—কিছু ভরসা দিলেন?

—দিলেন বৈকি। অঞ্জলি হঠাৎ হেসে ফেলল, বিচিত্র ভঙ্গীতে। বলল, দীপালি বললে, ফুঃ, টিচারী করে ক' পয়সা পাবি? খেতেই কুলোবে না তার আবার ঘরভাড়া! তার চাইতে আমার সঙ্গে চল অর্জুন সিংয়ের হোটেলে, ওয়েট্রেস করে দিচ্ছি। চেহারাটা যখন এখনও রাখতে পেরেছিস, তখন আমার চাইতেও বেশি রোজগার করতে পারবি, যদি—

অঞ্জলি আবার হেসে উঠল। কিন্তু দিব্যেন্দুর মুখের অবস্থা হয়ে উঠল জলদ-গম্ভীর। অগত্যা, মুখ-চোখ লাল করে মাথা নীচু করল অঞ্জলি। বলল, কি বলেন, ধরবো নাকি চাকরিটা? দীপালি এখন তার স্বামীকেই হাত-খরচা দেয় মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা। তাছাড়া, বাড়িভাড়া, খাই-খরচের স্ট্যাণ্ডার্ডও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কি বলেন, ধরি চাকরিটা? আমার স্বামী দেবতাটিও যে রকম ধার্মিক হয়ে উঠেছেন, তাতে, তাঁর দিনগুলোও বেশ শান্তিতে কাটবে। কি বলেন? অবশ্য, খদ্দেরদের সঙ্গে বাইরে যেতে যদি আপত্তি থাকে, তাহলেও দৈনিক পাঁচ-ছ' টাকার টিপস আমার কেউ মারতে পারবে না। তবে, দীপালি বলে, নাচতে নেমে ঘোমটা টানাটা বোকামী! ঠিক বলেনি?

দিব্যেন্দু আচমকা উঠে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল ঘর থেকে, পারল না। অঞ্জলি একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে পথরোধ করে দাঁড়াল। বলল, যাচ্ছেন কোথায়? অনুমতি দিয়ে যান! দীপালি যে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে!

—আপনি চাকরি করবেন? দিব্যেন্দু ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,

তাতে আমার অনুমতির কথা আসে কি করে! আমার কি অধিকার আছে আপনার কাজে বাধা দেবার?

—অধিকার নেই?

—বিন্দুমাত্র না। পথ ছাড়ুন।

—ছাড়ছি। কিন্তু—অঞ্জলি আঁচলের তলা থেকে একটা মনি-অর্ডারের রসিদ বার করে বলল, আপনিই বা এ অধিকার পেলেন কোথা থেকে?

রসিদটা দেখেই দিব্যেন্দুর গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে বলল, ইস, কথাটা আপনাকে জানাতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এমার্জেন্সির ব্যাপার কিনা! বৈজু বললে, মামার মতলব ভাল নয়; তাই আপনার নাম করে তাড়াতাড়ি মনিঅর্ডার করে দিয়েছিলাম বাড়ি ভাড়াটা।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু, অধিকারটা কে দিলে আপনাকে?

—রাগ করছেন? দিব্যেন্দু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, সেদিন তাড়াতাড়িতে অধিকারের কথাটা মনেই পড়েনি আমার। সত্যি, আমার উচিত ছিল, আগে আপনার সম্মতি নেওয়া।

—থাক, যথেষ্ট হয়েছে—বলেই, চট করে চলে গেল অঞ্জলি।

উচিত, অনুচিত, অধিকার-বোধ—যত সব কেতাবী নায়কের মতো ন্যাকা ন্যাকা কথা! কেন, সোজা সরল ভাষায় নিজের ইচ্ছার কথাটা স্বীকার করতে কি হয়? কারুর অধিকার বোধটা সত্যি হয়ে উঠলে, সত্যিই কি কেউ সে অধিকারের অমর্যাদা করতে পারে! অঞ্জলির চোখদুটো জ্বালা করে ওঠে। কিন্তু, দুর্ব্বলতাটাকে প্রশ্রয়ও দেয় না সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে।

গত দু' দিনের মতোই, খোঁজ-খবর নিয়ে পূর্ব-পরিচিতাদের সঙ্গে দেখা করে সে। স্কুল-কলেজের বান্ধবীদের মধ্যে যারা তাকে

সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করে, তারা আর কিছুর সন্ধান দিতে পারে না। কিন্তু, যারা অর্থোপার্জনের হদিশ দিলেও দিতে পারে, তারা পূর্ব বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখে না, কেমন যেন আড়ষ্টভাবে নিজেদের অক্ষমতার কথা জানায়। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে না সে। যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ তুচ্ছ করে কায়ক্লেশে বুড়ো বাপ-মা বা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে সংসার চালাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে আর কিছু না মিলুক, আন্তরিকতা মেলে। কিন্তু, যারা একদিন তারই মতো প্রগতিপন্থী ছিল এবং বরাত-জোরে, ভাল চাকুরের ঘরণী হতে পেরে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করছে আজ, তারা কেন অমন আড়ষ্ট ব্যবহার করে তার সঙ্গে! রহস্যটা কি!

এক কালের স্নেহময়ী দিদিমনীরাও হয়তো তাকে দু' একটা ট্যুইশানী জোগাড় করে দিতে পারতেন, কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় দুটো সমস্যা। প্রথমতঃ, একালের অভিভাবকরা স্কুল মিস্‌ট্রেস্‌কেই প্রাইভেট্‌ টিউটর রাখতে চান মেয়েদের পরীক্ষার সুবিধার জন্যে। দ্বিতীয়তঃ, বিপদ বাধায় তার কলেজ জীবনের বিদ্রোহটা। যে মেয়ে অমন করে বিয়ে করতে পারে, তার কাছে মেয়ে ছেড়ে দিতে অনেক অতি-আধুনিকাও ভয় পান দেখা গেল। সর্বোপরি, তার স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের ছাপটাও কম বিপত্তি ঘটাল না। কেউই বিশ্বাস করতে পারল না, অঞ্জলি নিজে কখনও কোন রকম রাজনীতি করেনি, বা ও-সবের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না।

চাকরির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল অঞ্জলি। উদরে ছিল না অন্ন, শরীরেও ছিল না সামর্থ্য ; কিন্তু আশ্চর্য, নৈরাশ্যের পর্বত-প্রমাণ বোঝাটা যেন অচল হয়েও থাকতে চায় না। যেন ভরাডুবির সন্ধিক্ষণে আঁকড়ে ধরতে চায় অদৃশ্য একটা তৃণখণ্ডকে। মনে পড়ে যায়, কাশীবাসী বৃদ্ধ পিতাকে—

সেই সত্যাশ্রয়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সে শ্রদ্ধা করতে পারেনি, ভাল করে জ্ঞান হবার পর থেকে। তাঁর সেই দারিদ্র্যের দম্ভকে

সে একদিন অপরাধ হিসাবেই গণ্য করেছিল। যুক্তি দিয়ে বুঝেছিল, সে লোক তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খেয়াল খুশী বজায় রাখবার জন্য, ঔরসজাত সন্তানের ভবিষ্যতও অন্ধকার করে দেবার সিদ্ধান্ত করেন—ব্যবস্থা করেন, তাঁরই মতো কোন গোঁড়া বামুনের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে তাকে তিলে তিলে দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভোগ করাতে, তাঁকে সে সেদিন শ্রদ্ধা করতে পারেনি, ভালবাসতে পারেনি, পরন্তু চরম আঘাত দিয়েছিল, বিদ্রোহিনী হয়ে বিবাহ করে। কিন্তু গোত্রান্তরের পরে দেখা গেল, যেটাকে সে দম্ভ ভেবেছিল সেটা নিরঙ্কুশ নয়। যেটাকে সে নির্মমতা ভেবেছিল সেটা সত্য নয়!—পিতা তার অশ্রদ্ধেয় নন, অস্বাভাবিকও নন!···তাঁর শিক্ষিতা কন্যা যে একদিন তাঁকে ভুল বুঝেছিল—ভুল বুঝে অপরাধ করেছিল, তার জন্যে দায়ী তিনি নন···ন' না না, সে অপরাধের দায়িত্ব কন্যারও নয়। অপরাধী তারা, যারা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, ধর্মস্থান হিন্দুস্থানকে পরিণত করেছে ধর্মনিরপেক্ষ মডার্ন ইণ্ডিয়াতে।

মনে পড়ে যায় বিবাহেব পবের দিনের কথা। সমস্ত রাত্রি হুল্লোড় করে, ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পডেছিল সে; ঝি এসে খবর দিল, একটা ভিখিরী টাইপের লোক তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই নীচে নেমে এসেছিল সে। তারপরই, হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বৃদ্ধের পায়ের ওপর। পিতা সেদিন কন্যার প্রণাম গ্রহণ করেননি। সন্ত্রস্ত ভাবে দু পা পেছিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, ও সবের প্রয়োজন নেই। এইগুলো নিয়ে আমাকে মুক্তি দাও।

পঁচিশ ভরি সোনার সেকেলে গহনা—তার মায়ের গহনা। মায়ের গহনা মেয়েকে গছিয়ে দিয়ে, বৃদ্ধ সেদিন চলে গিয়েছিলেন। যাবার পূর্বে অঞ্জলি বলেছিল, বাবা গো, আমাকে ক্ষমা করে যাও—

—ক্ষমার কথা ওঠে কেন! বৃদ্ধ বেশ নির্বিকারভাবেই বলেছিলেন, সাবালিকা মেয়ে হিসাবে তুমি তো কোন বে-আইনী কাজ করোনি।

—আমাকে আশীর্বাদ করে যাও বাবা।

—দরকার কি? কোথাকার কে একটা ভিখিরী বামুন—তার আশীর্বাদের মূল্য কি! রাষ্ট্র পিতাদের সন্তুষ্ট করে চললে, স্বাভাবিক-ভাবেই সুখী হবে তুমি। বলে, বৃদ্ধ আর পিছন ফিরে তাকাননি!

সেই শেষ দেখা। সেদিনকার সেই ঘটনার পর পিতার সঙ্গে আর তার সাক্ষাৎ হয়নি; কিন্তু, কন্যাকে যে তিনি একেবারে ত্যাগ করেননি, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আরও বছর দেড়েক পরে। পীয়ারসন কোম্পানিতে বিভূতির চাক্‌রি করে দিয়েছিলেন তিনিই—কন্যার দারিদ্র্যে বিচলিত হয়েই।

দারিদ্র্য!

অনাগত দারিদ্র্যের আশঙ্কাতেই একদিন সে পিতৃদ্রোহী হয়েছিল বিভূতির মতো একটা অমানুষকে অবলম্বন করে! একটা ছোট-লোকের বড়লোকী দেখে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল সে! কিন্তু যদি সেদিন সে ভুল না করতো, তাহলে আজ তার চাইতে সুখী, সৌভাগ্যবতী আর কেউ হতে পারতো কি! কিন্তু—

এ ভুলের কি প্রতিকার নেই! এ অপরাধের কি ক্ষমা নেই! অঞ্জলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যে আইন একদিন তাকে অপরাধ করতে প্ররোচনা দিয়েছিল, সেই আইনেই তো ব্যবস্থা আছে প্রায়শ্চিত্তের। তবে?

অঞ্জলি হালদার যদি আবার অঞ্জলি ভট্টাচার্য হয়…

তবে?

এখনও তো সব ফুরিয়ে যায়নি! এখনও তো সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে…পিতার মনোনীত সেই মানুষটির পায়ে…

টক্ টক্ টক্। সাড়া দিয়ে ঘরে ঢোকে দিব্যেন্দু। অঞ্জলিও চমকে উঠে, উঠে বসে বিছানার ওপর; কিন্তু মুখ ফিরিয়ে থাকে চোখের জল গোপন করবার জন্যে!

—ইস্, শুয়েছিলেন দেখছি! দিব্যেন্দু একটু কুণ্ঠিতভাবেই

বলল, বড্ড অভদ্রতা হয়ে গেল তো! কিন্তু, ব্যাপার কি? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

অঞ্জলি সজোরে মাথা নাড়ল।

—তবে শুয়ে পড়েছিলেন যে? অমন করে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন কেন? আমার মুখ দেখতে চান না?

অঞ্জলি মুখও ফেরাল না, কথাও বলল না।

—আচ্ছা, তাহলে চোখ বন্ধ করেই কথাটা শুনুন। দিব্যেন্দু হেসে বলল, আপনি চরকির মতো চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন শুনে, আপনার অতসী দিদিমণি এসেছিলেন একটা ট্যুইশানীর খবর নিয়ে। বলে গেছেন, কাল সকালে আবার আসবেন।

অতসীর নামটা শুনেই অঞ্জলি মুখ ফিরিয়েছিল। দিব্যেন্দুও থমকে গিয়েছিল তার সজল চোখে আগুনের ঝিলিক দেখে। ব্যস্ত হয়ে বলল, কি হলো?

—সে বুড়িটা কখন আসবে বলেছে?

—কাল সকালে।

—এলে বলে দেবেন, আর উপকার করবার চেষ্টা না করলেই অঞ্জলি বাধিত হবে।

—তার মানে?

—মানে? অঞ্জলি উত্তেজিত হয়েছিল; কিন্তু থামলে নিল। একটু ভেবে বলল, মানে বোঝাতে গেলে, মহাভারত বলতে হয়। কিন্তু, আপনার শোনবার প্রবৃত্তি হবে কি?

কিছু বুঝতে না পেরে দিব্যেন্দু আস্তে আস্তে বলল, তাহলে শোনাবার দরকার নেই।

—দরকার যে নেই, তা আমি জানি। আচ্ছা—অঞ্জলি হঠাৎ থেমে গেল।

—বলুন, কি বলছিলেন।

—আচ্ছা, আমাকে আপনার কি মনে হয়? একটু হাসবার

চেষ্টা করে অঞ্জলি বলল, বড্ড খারাপ মেয়ে, তাই না? তাই তো আমার কথা শুনতে আপনার প্রবৃত্তি হয় না, তাই না?

—ক্ষেপে গেলেন নাকি? দিব্যেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, কি সব বলছেন যা তা! চুপ করে শুয়ে পড়ুন দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে'খন। আমি চললাম ওপরে।

—দাঁড়ান, যাবেন না।

—আবার কি?

—আমার একটা কাজ করে দেবেন? রাগ করবেন না তো?

—রাগ করবো কেন? কিন্তু, কাজটা কি?

অঞ্জলি উঠে গিয়ে একটা প্যাঁট্রা খুলল। তারপর, কাপড়-চোপড়ের তলা থেকে বার করল একটা বালার মতো অলংকার। বলল, এইটে বন্ধক রেখে কিছু টাকা এনে দেবেন আমাকে। যা পাওয়া যায়।

—কি এটা?

—আমার মায়ের হাতের এয়োতী-চিহ্ন—লোহা। শুনেছিলাম, ভরিখানেক সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়েছিল এটা। দু' দশটাকা যা পাওয়া যায় এনে দিন আমাকে।

দিব্যেন্দু অভিভূতের মতো চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, মায়ের হাতের এয়োতী-চিহ্ন! নষ্ট করবেন?

অঞ্জলি ব্যস্ত হয়ে বলল, নষ্ট করবো কেন? বেচবো না তো। বন্ধক রাখতে চাইছি। অবশ্য—

দিব্যেন্দু মুখ তুলে তাকাল। ঠিক বুঝতে পারল না, অঞ্জলি হাসল না কাঁদল।

—অবশ্য, ওটা ছাড়াবার মতো অবস্থা আমার হবে কিনা জানি না। তবুও এতদিন এত কষ্ট করে লুকিয়ে রেখেছি যখন তখন বেচতে আমি পারবো না। আপনি ওটা বন্ধক রেখেই টাকা এনে দিন, যা পাওয়া যায়।

দিব্যেন্দু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বিছানায় গিয়ে বসল। বলল, টাকা-কড়ির কথাটা যখন তুলেই ফেললেন তখন আমার গোটাকতক কথার জবাব দিন। আপনার বাপের বাড়িতে একটা—

—না। সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলি বলে উঠল, ও কথা থাক, অন্য কথা থাকে তো বলুন।

—আচ্ছা বেশ! বিভূতিবাবুর অফিস্ ইউনিয়ানের সঙ্গে কথা কইবো?

—যারা ওকে একেবারে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তাদের সঙ্গে কথা কইতে চান আপনি আমার উপকার করবার জন্যে! এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি—

—আচ্ছা, থাক থাক ও কথা। দিব্যেন্দু একটু ইতস্ততঃ করেই বলল, বিপদ-আপদে মানুষ প্রতিবেশীর কাছ থেকেও তো টাকা ধার করে থাকে।

—বুঝেছি। কিন্তু—অঞ্জলিও ঢোক গিলে মুখ নীচু করে বলল, কোন নিঃস্ব প্রতিবেশীকে কেউ যদি উপযাচক হয়ে টাকা ধার দেয় শুধু হাতে, তাহলে যে নিন্দে হয় তার। নিন্দের কাজ তো অনেকেই করতে পারে না আজও। পারলেও, আমি করতে দোব কেন?

—হুঁ। দিব্যেন্দু আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর ওপরে এসে একটা পঞ্চাশ টাকার বেয়ারার চেক্ কাটল বৈজুর নামে। বাহাদুরকে ডেকে বলল, বৈজুবাবুকে এইটে দিয়ে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে আয় আমার নাম করে। টাকাটা এনেই মাইজীর হাতে দিবি। কাগজটা সাবধানে রাখবি। হারালে গর্দান নোব তোর। আর টিফিন ক্যারিয়ারটাও পৌঁছে দিয়ে আসিস।

বাহাদুরকে রওনা করে দিয়ে দিব্যেন্দু হোগলকুঁড়ের উদ্দেশে

বেরিয়ে পড়ল। চিন্তা করে কোন কিছু করবার মতো মনের অবস্থা তার তখন ছিল না। অঞ্জলির সেই না-হাসি না-কান্নামাখা মুখখানা যতই ভেসে উঠছিল তার মনের মধ্যে ততই যেন তার উৎকণ্ঠা উদগ্র হয়ে উঠছিল—যত শীঘ্র সম্ভব একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে। অঞ্জলির বিদ্রোহের কথাটা তারই মুখ থেকে শুনেছে সে। বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত রহস্যটা কি হতে পারে সে সম্বন্ধেও অনেক রকমের অনুমান রোমাঞ্চিত করে তোলে তাকে। কিন্তু অনুমানের চাইতেও যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তার কাছে সেটা হচ্ছে মেয়েটার অভিমান, উত্তেজনা আর গোঁয়ার্তুমী। সুতরাং এ ধরনের ছেলেমানুষীকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে যা হোক কিছু একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলাই উচিত। কিন্তু—

গলিতে ঢুকে দিব্যেন্দু থমকে দাঁড়াল। বিভূতি তার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা দিয়েছিল বটে, কিন্তু শ্বশুর বা শালার নাম বলেনি তো!

অগত্যা শুধু ঠিকানার ওপর নির্ভর করেই সে একটা একতলা এঁদো বাড়ির সামনে এসে হাজির হলো। একবার ইতস্ততঃ করল—রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা বাজে; এ সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করাটা উচিত হবে কি! তারপরেই কড়া ধরে নাড়া দিল।

—আপনি কাকে খুঁজছেন? আদুর গায়ে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক।

—আচ্ছা, এ বাড়িতে কে থাকেন বলতে পারেন?

—থাকেন চার ঘর ভাড়াটে। আপনি কাকে খুঁজছেন?

দিব্যেন্দু আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল। বলল, পণ্ডিত মশাইকে।

—পণ্ডিত মশাই? ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বললেন, পণ্ডিত মশাই না শাস্ত্রী মশাই?

—সরি, শাস্ত্রী মশাইকেই খুঁজছি আমি।

ভদ্রলোক যেন আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, শাস্ত্রী মশাইকে খুঁজছেন আপনি? আচ্ছা, ভেতরে এসে বসুন।

সদরে ঢুকেই বাঁ হাতি ছোট্ট একটা ঘরে এসে ঢুকল সে। এক কোণে একটা মোমবাতি জ্বলছিল টিম্‌টিম্ করে ; তার আলোয় ঘরের যেটুকু অবস্থা দৃষ্টিগোচর হলো তাতে তার আর সন্দেহ রইল না যে যথাস্থানেই এসে পড়েছে সে। প্রাচীনপন্থী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাড়া এমন অদ্ভুত জীবন আর কে যাপন করতে পারে!

—বসুন। ভদ্রলোক একটু কুণ্ঠিতভাবেই বললেন, আমাদের লাইনটা হঠাৎ ফিউজ হয়ে গেছে—একটু বসুন কষ্ট করে।

একটা তক্তপোষের ওপর বই-পত্তর রাখা ছিল গাদা করে ; তারই একপাশে আসন গ্রহণ করল দিব্যেন্দু।

ভদ্রলোক কিন্তু বসলেন না ; দাঁড়িয়েই রইলেন।

—আমি এসেছিলাম—ঠিক কি ভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে না পেরে দিব্যেন্দু হঠাৎ থেমে গেল।

—বলুন।

—আমি এসেছিলাম,—মানে, আমি আসছি, বিভূতিবাবু, মানে বিভূতি হালদারের কাছ থেকে। তিনি এখন হাসপাতালে পড়ে রয়েছেন—ওদিকে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী, মানে, বড্ড বিপন্ন হয়ে......

—আপনি তাঁদের কে ? ভদ্রলোক বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কম্‌রেড্ না পাড়াতুতো দাদা ?

—আজ্ঞে ? দিব্যেন্দু বিচলিত হয়ে বলল, আজ্ঞে না, প্রতিবেশী—

—বুঝেছি ? ভদ্রলোক এবার সাফ জবাব দিলেন, অঞ্জলি নামে আমার একটি বোন ছিল বটে ; কিন্তু, সে তো অনেক দিন হলো মারা গেছে !

দিব্যেন্দু একেবারে যেন দিশাহারা হয়ে গেল। কিন্তু, আশা ছাড়ল না। সামলে নিয়ে বুঝিয়ে বলতে গেল, দেখুন, ভুল-ভ্রান্তি মানুষমাত্রেরই হয়। কিন্তু, বিপদ-আপদের সময় কি ও সব মনে রাখা উচিত !

—উচিত-অনুচিতের সমস্যা থাক্! ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একেবারে ফেটে পড়লেন, সার কথাটা শুনুন। আমার বোন শুধু নিজেই মরেনি, মেরে গেছে আমার বাবাকে। মেরে গেছে আমাকে। নষ্ট করে গেছে আমাদের এই নামী বংশটাকে। আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নেই! দেশের বাড়িতে ঢোকা বন্ধ। পাড়ার লোকের টিট্‌কিরী সহ্য করতে হচ্ছে মুখ বুজিয়ে। তার ওপর আমারও দুটি মেয়ে রয়েছে, তাদের আমি বিয়ে দিতে পারছি না! ভাবতে পারেন, একজন করল পাপ, আর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হচ্ছে, ফুলের মতো দুটো নিষ্পাপ মেয়ে দিনের পর দিন! যাক্‌গে, আপনি এখন আসুন। যে মেয়ে কলেজে যাবার নাম করে ধর্ম-নষ্ট করে! কুলে কালি দিয়ে কুলত্যাগ করে বুক ফুলিয়ে, তার মতো স্বার্থপর জানোয়ারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমাদের!

বাড়াবাড়িটা দিব্যেন্দুকেও উত্তেজিত করে তুলল। বলল, দেখুন আজকের দিনে এ রকম ঘটনা তো আক্‌ছার ঘটছে! আপনি এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে—

—কী মুস্কিল! ভদ্রলোক যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, আমরা নিজেরাই যে তুচ্ছ লোক—সেকেলে আমলের চাল-কলা-বাঁধা বামুন! আমাদের আজকালকার ভদ্রলোক বলে ভুল করছেন কেন!

—কিন্তু, বিবেচনা করুন, বড্ড বিপন্ন তিনি—

—হতে পারে। কিন্তু, নিশ্চিত জানবেন, মরবে না ও। ওরা মরে না—

ঠিক এই সময় ঘরের ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই, চমকে উঠে মুখ তুলতেই দিব্যেন্দুর নজরে পড়ল, সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো মাঝারি সাইজের একটা ফোটোগ্রাফ্।

নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে না পেয়ে, দিব্যেন্দু যেন ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফোটোটার ওপর। ছবিতে, নামাবলীধারী একটি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ পদ্মাসনে বসে ছিলেন।

দিব্যেন্দুর গলা শুখিয়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে জিজ্ঞাসা করল, ইনি কে ?

ভদ্রলোকও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন দিব্যেন্দুর ব্যাপার দেখে। বললেন, আপনি যাকে খুঁজছিলেন,—শাস্ত্রী মশাই !

দিব্যেন্দুর মাথার মধ্যে তখন যেন প্রলয়কাণ্ড চলছিল। কিন্তু, আলোর আবির্ভাবটা বৃথা গেল না। সে চিনতে পারল ভদ্রলোককে। লক্ষ্য করল তাঁর গুরুদশা।

—কবে কাল হলো তাঁর ? কোথায় দেহ রাখলেন ?

—পরশু, মণিকর্নিকায়।

—কী হয়েছিল ?

—অনুশোচনা আর অনুতাপ।

—ওঃ ! দিব্যেন্দু প্রস্থানোদ্যত হয়েও আবার ফিরে দাঁড়াল। বলল, আগে তো আপনারা নেবুতলায় থাকতেন ; এখানে উঠে এলেন কবে ?

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর বললেন, আপনার বান্ধবী যেদিন মারা গেল, তার কয়েকদিন পরেই।

—ওঃ ! চেষ্টা করেও কিন্তু কৌতূহল দমন করতে পারল না দিব্যেন্দু। আবার জিজ্ঞাসা করল, শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী আপনার কে হন ?

ভদ্রলোক আবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, জবাব দিলেন না।

—শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী আর অঞ্জলি হালদার একই লোক তো ?

—হ্যাঁ, ওটা ছিল তার স্কুল-কলেজের নাম। ভদ্রলোক এবার যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। বললেন, কিন্তু, আপনি কে বলুন তো ? অনেক খবরই তো রাখেন দেখছি ! মনে হচ্ছে, কবে যেন কোথাও দেখেও থাকবো আপনাকে ! কে বলুন তো আপনি ?

—আপনার ভগ্নির প্রতিবেশী। আচ্ছা, আজ আসি তাহলে—

—একটু দাঁড়ান। একটা খবর দিতে পারেন—

—কী ?

—আপনার বান্ধবীর গয়নাগুলো কোথায় গেল বলতে পারেন ? আঁটু পঁচিশ ভরির গয়না তাকে দিয়ে এসেছিলেন আমার বাবা। কিছু খবর রাখেন আপনি ?

এতক্ষণে, দিব্যেন্দু একটু হাসতে পারল। ভদ্রলোকের অত্যধিক আদর্শ আস্ফালনের রহস্যটা যেন বুঝতে পারল সে। বলল, আজ্ঞে না। গয়নার খোঁজ রাখবার মতো ঘনিষ্ঠতা তাঁর সঙ্গে হয়নি আমার। আচ্ছা, চলি আজ—

অতঃপর কী কর্তব্য !

মনের যা অবস্থা, তাতে আর বেশীক্ষণ জেগে থাকতে ভরসা করল না দিব্যেন্দু ; ব্রোমাইড খেয়ে শয্যাগ্রহণ করল !

পরদিন, যখন বাহাদুরের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গল, বেলা তখন ন'টা বেজে গিয়েছিল। দরজা খুলতেই দেখা হলো অতসীদির সঙ্গে !

ভদ্রমহিলার চেহারা দেখে বয়স বোঝা মুস্কিল। কিন্তু, সাজপোশাক দেখে রুচির পরিচয়টা অনুমান করা যায়। বললেন, আমার আজ এন্‌গেজমেন্ট ছিল আপনার সঙ্গে—

—আসুন। দিব্যেন্দু অতসীদিকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল।

—অঞ্জু তো দেখছি বাড়ি নেই ! অতসীদি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তাকে বলেছিলেন আমার কথা ?

—বলেছিলাম।

—তবে ?

—তিনি আপনার কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য নিতে ইচ্ছুক নন।

—কেন ? কথাটা বেরুল না অতসীদির মুখ দিয়ে। কিন্তু, কোটরাবিষ্ট চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল।

—না, মেয়েটার বরাতে দেখছি অনেক দুঃখু আছে। বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে অতসীদি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। বললেন, মনের মধ্যে কুসংস্কারের আস্তাকুড়, অথচ বাইরে দেখায় যেন কতই না কাল্‌চারড! আল্‌টিমেটলি এরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, অনুমান করতে পারেন মিস্টার চাউড্রী ?

—না।

—আমি পারি! বাট্‌, স্টিল্‌, আই ফীল্‌ ফর হার। ওয়েল্‌—

অতসীদি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নির্বাক হলেন; কিন্তু, অস্থির হয়ে উঠল দিব্যেন্দু। এই ধরনের ছুঁড়ি-সাজা বুড়ীগুলোকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না—বিশেষতঃ তাদের মুখের অপরূপ উচ্চারণের ইংরিজি বুলি। অথচ, কী ভাবে ভদ্রতা বজায় রেখে সে নিস্তার পাওয়া যায় তাও ভেবে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, আপনি কি একটু বসবেন ? আমি তাহলে একটু ঘুরে আসতাম বাথরুম থেকে।

—ওঃ, আই এ্যাম্‌ সরি। অতসীদি এবার নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আপনাকে আর ডিটেন্‌ করবো না। শুধু একটা কথা আমার হয়ে তাকে বুঝিয়ে বলবেন আপনি—

—বলুন!

—বলবেন, গতিশীল জগতের সব কিছুই পরিবর্তনশীল। অতসী দাশগুপ্তা একদিন যেটাকে সত্য মনে করেছিল, আর একদিন সেটাকে মিথ্যে বলে জানতে পারলে, লজ্জিত হয় না। আর, হয় না বলেই এখনও সে পাঁচজনের একজন।…অতসীদি একদিন, বিভূতিকে বিয়ে করবার জন্যে অঞ্জলিকে উৎসাহিত করেছিল, কারণ তখনকার বিভূতি হালদার আজকের মতো অপদার্থ ছিল না। কিন্তু, আজ…

—বলুন।

—বলবেন, অঞ্জলি যদি আজ বাঁচার মতো বাঁচবার চেষ্টা করে, তাহলে, সেদিনকার মতোই তার পাশে এসে দাঁড়াবে, অতসীদি।

বলবেন, ভুল মানুষ মাত্রেই করে থাকে,—মহাত্মা গান্ধীর মতো অতি-মানবরাও ভুল করে গেছেন। কিন্তু, একদিনের একটা ভুলের জন্যে যে মেয়ে চিরটা কাল ভুল করে যাবার মতলব করে, অতসীদির কাছে তার ক্ষমা নেই। বলবেন, অতসীদির জীবনের ঘটনাগুলো স্মরণ করে দেখতে। অতসী দাশগুপ্তা নিজে কখনও কোন পুরুষকে ভালবাসেনি, কখনও মেনে নেয়নি পুরুষ শাসিত সমাজের এই জঘন্য বন্ধন। কিন্তু, কোন মেয়ে যদি সত্যিই কোন পুরুষকে ভালবেসে বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করতে চায়, অতসীদি তার পাশে এসে দাঁড়াতে দেরি করে না। আবার, সেই ভালবাসা যদি মিথ্যে হয়ে যায়, তখনও অতসীদি ছুটে আসতে দেরি করে না। বুঝলেন, বুঝিয়ে বলবেন ওকে! একটা সেকেলে সেন্টিমেণ্টকে মর্যাদা দিয়ে—একটা লোফারের মুখ চেয়ে, ও যদি এমনি করে তিলে তিলে আত্মহত্যা করে, তাহলে, প্রশ্রয় পাবে কেবল টিকিধারী জানোয়ারের দল—আরও সাহসী হয়ে উঠবে, বিভূতির মতো স্কাউণ্ড্রেলরা। কিন্তু, ও যদি সত্যকে মর্যাদা দেয়; সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে, ইনিসিয়েটিভ্ নিতে পারে লিগ্যাল সেপারেশানের, তাহলে, গোটাকতক সেকেলে সুবিধাবাদীর কাছে ছোট হয়ে গেলেও, মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে সত্যিকারের মনুষ্য সমাজের।

—ধন্যবাদ! দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাঁকে আপনার কথা বুঝিয়ে বলবো আমি।

—ধন্যবাদ! অতসীদি প্রস্থানোদ্যত হয়েও আবার ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, সম্ভব হলে, আরও একটা কথা বুঝিয়ে বলবেন ওকে! অঞ্জলির ধারণা, আমি বুঝি বিভূতির জাতের কথাটা ইচ্ছে করেই লুকিয়েছিলাম বিয়ের সময়। কিন্তু ওকে বুঝিয়ে বলবেন বিশ্বাস করতে যে, অতসী দাশগুপ্তা জীবনে কখনও কোন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়নি, আর দেয়নি বলেই, আজও সে পাঁচজনের একজন! আজকের দিনের কোন শিক্ষিত মেয়ে যে জাত নিয়ে মাথা ঘামাতে

পারে—এ ছিল আমার ধারণারও অতীত। তাই, ওদের বিয়ের সময় জাতের কথাটা ফাঁস্ করে দেওয়া দরকার মনে করিনি আমি—মনেও পড়েনি!

—কি বলছেন আপনি? দিব্যেন্দু সবিস্ময়ে বলে উঠল, বিভূতি-বাবু কি ব্রাহ্মণ নন্?

—না, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। কিন্তু, তাতে কি হয়েছে? আজকের দিনে······

—কিন্তু, বিভূতিবাবুর গলায় যে মোটা পৈতে দেখেছি আমি।

—তাতে কি হয়েছে? পৈতে পরার অধিকার, বামুনদেরই একচেটে নাকি? মানুষ হিসাবে কিসে ছোট ওরা বামুনদের চাইতে বলতে পারেন? কি অধিকার আছে বামুনদের—তাদেরই মতো একদল মানুষকে ছোট মনে করবার, ঘেন্না করবার? তাই তো সিডিউল্ড ক্লাসের লোকেরা দলবদ্ধ হয়েছে প্রতিবিধান করবার জন্যে! তাইতো, পৈতে নিয়ে ওরা······

—ঠিক কথা! দিব্যেন্দু ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যান, আমি সব বুঝিয়ে বলবো'খন অঞ্জলিদেবীকে!

—ধন্যবাদ!

—নমস্কার! অতসীদি'কে বিদায় দিয়ে দিব্যেন্দু বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

মেয়েটা গেল কোথায়?

অনেকদিন পরে, অনেকগুলো কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে, কি এমন সওদা করছে অঞ্জলি যে এত দেরি হচ্ছে! দিব্যেন্দুর অস্বস্তিটা ক্রমে উৎকণ্ঠায় পরিণত হলো। অন্য কারণে নয়, পিতার দেহত্যাগের সংবাদটা যে আজকের মধ্যেই তার জানা দরকার!

—কি রে, ছটফট্ করছিস নাকি? বৈজু ঘরে ঢুকে বলল,

বান্ধবীর দরজায় তো দেখলুম তালাবন্ধ। হলো কী—বিগড়ে গেল নাকি ?

দিব্যেন্দু অস্থিরভাবে ঘর-বার করছিল, বৈজুকে দেখেই যেন একটা অবলম্বন পেল। আচম্‌কা বলে বসল, তুই সেদিন ঠিকই বলেছিলি—আমি সত্যিই একটা গাধা।

—এ্যাঁ ?

—হঁ্যা, এ বাড়ি ছেড়ে আমাকে পালাতেই হবে! আজকালের মধ্যেই বাড়ি চাই আমার। তোর মামা ফিরেছে বম্বে থেকে ?

বৈজু জবাব দিল না। পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিব্যেন্দুর হাতে দিল।

ছোট্ট চিঠি। ভগবানবাবু লিখেছেন, পরশু সন্ধ্যের পর একবার পার্ক স্ট্রীটে এসো। রাত্তিরের খাওয়াটা এইখানেই খেয়ে যেও। ইতি—

—কী ব্যাপার ? দিব্যেন্দু একটু আশ্চর্য হয়েই বৈজুর দিকে তাকাল। বলল, পার্ক স্ট্রীটের বিলাসকুঞ্জে আমার ডাক পড়ল কেন ? তুই জানিস কিছু ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই! বোধহয়, কন্‌গ্র্যাচুলেশানের ব্যাপার। তোর নতুন ফরমুলাটাও বেশ বাজার-চালু হয়েছে তো!

—তার জন্যে পার্ক স্ট্রীটে ডাক পড়বে কেন ? দিব্যেন্দু চিন্তিতভাবে বলল, তুই কিছু আন্দাজ করতে পারছিস না ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না! বৈজুও বেশ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, মামার কাণ্ড-কারখানা···সব গভীর জলের ব্যাপার। তবে পার্ক স্ট্রীটে যখন তোর ডাক পড়েছে, তখন নিশ্চয়ই জানবি—প্রাইভেট্ মতলব আছে মামার!

—কি মতলব হতে পারে বল দেখি!

—ওই তো বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না! কিন্তু, তোর ব্যাপারখানা কী ? শেষ পর্যন্ত, সত্যিই ছাড়বি নাকি এ বাড়ি ?

—হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—পালাতেই হবে এখান থেকে!

—বাঁচালি! শুনলুম, মেয়েটা নাকি মনি অর্ডার করে ভাড়ার টাকা জমা দিয়েছে। সুতরাং ওকে তাড়ানো যাবে না। অগত্যা তুই-ই পালা—

—তুই ভুল করছিস! দিব্যেন্দু যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল, আমি নিজের জন্যে পালাচ্ছি না—মেয়েটার মঙ্গলের জন্যেই···মানে, ওর ভবিষ্যৎ ভেবেই সরে যাওয়া উচিত মনে করছি।

—ওই হোল! বৈজু গম্ভীরভাবেই বলল, কিন্তু, খরচের কথাটা ভেবে দেখেছিস? বাড়ির ভাড়া দু-তিন ডবল হবে। তা ছাড়া, ল্যাবরেটারীটাকে শিফট্ করতেই বেশ কিছু বেরিয়ে যাবে আবার নতুন করে। সহ্য হবে তো?

তা আর কি করা যাবে! দিব্যেন্দু সহজভাবেই বলল, তা বলে মেয়েটার জীবনটাও নষ্ট করে দিতে পারি না তো! সময় থাকতে সরে গেলে, ও হয়তো একদিন আমাকে ভুলে গেলেও যেতে পারে। সব কিছু ভুলে গিয়ে, আবার একদিন হয়তো স্বামী সংসার নিয়ে সুখীও হতে পারবে।

—হুঁ! বৈজু আপন মনেই একবার মাথা নাড়ল। তারপর বলল, মামা বলে মিথ্যে নয়। তোর উন্নতি রোখে কোন শালা? সামান্য পঞ্চাশটা টাকা দান করেই কাবু হয়ে পড়লি! আমার মতো ওড়াতে হলে তুই কি করতিস তাই ভাবছি!

—তুই একটা···দিব্যেন্দু ক্রুদ্ধ হলো না; কিন্তু, উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ জানাল। বলল, কংস মামার শিশুপাল ভাগ্নে! লেন-দেন্ আর মতলববাজী ছাড়া কি তোদের মাথায় আর কিছুই আসে না? জানিস্, আমি অনুরোধ করা সত্ত্বেও ও শুধু হাতে টাকা নেয়নি! সোনার জিনিস বাঁধা রেখে তবে—

—তাই নাকি! আর আমজেদীয়ার পোলাও-কালিয়াগুলো? সেগুলো কি বাঁধা রেখে খাইয়েছিলি রে স্টুপিড্? বৈজু সক্রোধে

বলেই চলল, ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি কোথাকার। টিফিন ক্যারিয়ারটা ভাল করে ধুয়ে-মুছে পাঠাবারও আক্কেল হলো না তোর। তিন দিন পরেও তা থেকে ফাউল-কারির গন্ধ বেরোয়—আর তাই শুঁকে মা-বৌ আমাকে···শালা, তোর মেয়েমানুষের জন্যে সেদিন আমার কি অবস্থা হয়েছিল জানিস ?

—থাম্ থাম্! ষাঁড়ের মতো কাঁদিস নি! দিব্যেন্দুও রেগে গিয়ে বলল, জানিস্ তুই···ওকে ? কাকে তুই মেয়েমানুষ বলছিস ?

—কে ও ? মেয়েমানুষ নয় ?

—না। ওই হচ্ছে সে যাকে একদিন আমি বিয়ে করতে এসেছিলাম।

—কি বললি ? বৈজু যেন আর্তনাদ করে উঠল।

দিব্যেন্দু কিন্তু আর কিছু বলতে পারল না, স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল দরজার দিকে।

—কি ব্যাপার, এত চেঁচামেচি কিসের ?—দরজার বাইরে থেকেই অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল।

—চেঁচামেচি ? কই ?—বলেই দিব্যেন্দু হঠাৎ বৈজুর দিকে তাকাল। তারপর ব্যস্ত হয়ে বলল, তাহলে ওই কথাই ঠিক রইল। আমি ঠিক যাবো'খন সন্ধ্যের পর। তুমি তাহলে এখন এসো—

বৈজুও আর বাক্যব্যয় না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—কি ব্যাপার বলুন তো ? অঞ্জলী ঘরে ঢুকে বলল, ঝগড়া করছিলেন নাকি ওর সঙ্গে ?

—নাঃ, ঝগড়া করবো কেন। দিব্যেন্দু অপ্রস্তুতভাবে অন্যদিকে তাকাল।

অঞ্জলি ফরাসের ওপর আস্তে আস্তে বসল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, আমার একটা কথার জবাব দেবেন ?

—বলুন ! দিব্যেন্দু উৎকণ্ঠিতভাবে একটা ঢোক গিলল।

—ওর মতো একটা লোকের সঙ্গে এত কিসের ঘনিষ্ঠতা আপনার? আপনার লজ্জা করে না?

—লজ্জা? দিব্যেন্দু কিছু বুঝতে না পেরে বলল, বৈজু তো খারাপ লোক নয়! লজ্জা পাবার মতো কোন কাজ তো সে কখনও করে না।

—করে না? অঞ্জলি সশ্লেষে বলল, একটা মাতাল, লম্পট··· তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে আপনার লজ্জা করে না? কি বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি। দিব্যেন্দু বলল, যার স্ত্রী চির-রুগ্না, জন্ম-খিটখিটে তার মতো লোকের পক্ষে বার-মুখো হওয়াটা, তেমন কিছু খারাপ নয় নিশ্চয়ই!

—চমৎকার। অঞ্জলি তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে উঠল, চমৎকার আপনার যুক্তি। একটা বিবাহিত লোক, স্ত্রী-বর্তমানে ওই সব করে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে আপনি কিছু খারাপ দেখতে পাচ্ছেন না! চমৎকার—

—তা আমি কি করবো! দিব্যেন্দু মুখ কালো করে বলল, একটা সুস্থ মানুষ, সারাজীবন একটা বদমেজাজী রুগ্ন বৌয়ের মুখ চেয়ে, নিজেও অসুস্থ অস্বাভাবিক হয়ে থাকবে, এই বা কেমন কথা! বৈজুর মকারান্ত দোষ আছে যেমন তেমনি গুণও আছে অনেক। তার মতো বৌকে ভালবাসতে, আমি তো অনেক চরিত্রবানকেও দেখিনি।

—চমৎকার! আচ্ছা আপনি কি—

—তা আপনি যা খুশী ভাবুন আমাকে; কিন্তু, আমি তো বৈজুর মতো সংযমী ছেলে আজ পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

—সত্যি? অঞ্জলি এবার হেসে ফেলল। বলল, বলুন তো শুনি আপনার সংযমের থিয়োরীটা।

—আপনি হাসছেন। আমরা কিন্তু দুঃখু পাই ওর জন্যে। দিব্যেন্দুও হাসবার চেষ্টা করল। বলল, ওদের বিয়ে হয়েছিল

ছোটবেলায়। ওর বৌয়ের যখন অসুখ দেখা দেয়, তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি—তখনও হিন্দু ম্যারেজ বিল পাশ করাবার কথা কারুর মাথায় আসেনি। সেই সময় থেকে, ওর বৌ, মা, মাসী, আত্মীয়-স্বজন ক্রমাগত চেষ্টা করেছে, বৈজুর আর একটা বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু, কেউই তার নীচু মাথাটাকে উঁচু করতে পারেনি। যার কোন অনুরোধ সে কখনও অমান্য করে না—সেই বৌয়ের ইচ্ছেও পূর্ণ করতে পারেনি সে। অথচ, ওর দু একটা ছেলে-পুলে হলে বৌটা সত্যিই সুখী হতে পারতো।

—কী অসুখ বৌটার?

ব্যাধির নামটা বলল দিব্যেন্দু।

—তবে? অঞ্জলি বলল, ও রোগের অজুহাতে সেপারেশন চাইলে তো ডিক্রি পেতে বেশী দেরি হয় না! তবে? সে চেষ্টা করে না কেন ও?

দিব্যেন্দুর মাথায় আর উত্তর যোগাল না। তবে সেপারেশানের কথায় অতসীদির কথাটা মনে পড়ে গেল। বলল, পরচর্চা থাক। আপনার অতসীদি যে এসেছিলেন—

—জানি!· কী বলে গেল?

দিব্যেন্দু আদ্যোপান্ত সব বলল। শুনে, অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ভুরু কুঁচকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, বুড়ী আসল কথাটা বলেনি?

—কি আসল কথা?

—বিভূতি হালদারের সঙ্গে সেপারেশান করিয়ে, তারপর, আবার কার ঘাড়ে চাপাবেন অঞ্জলিকে। লজ্জা কি, বলেই ফেলুন না আসল কথাটা। এবারকার খদ্দেরটি নিশ্চয়ই আরও শাঁসাল?

—এ সব কি বলছেন আপনি?

—ওঃ, আপনি তাহলে সত্যিই কিছু জানেন না। আচ্ছা—অঞ্জলি উঠল।

—আর একটা খবর দেবার ছিল আপনাকে।

—সেইটেই তো জানতে চাইছিলাম—অঞ্জলি ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, শুনিই না খদ্দেরটি কে ?

—খদ্দের নয়, আপনার বাবার কথা বলছিলাম। তিনি দেহ রেখেছেন তিন দিন হলো।

খবরটা শুনে, অঞ্জলির মুখ দিয়ে একটা আওয়াজও বেরুল না—আস্তে আস্তে বসে পড়ল সে মেঝের ওপরে।

এই ফোঁটা চোখের জলও নয়, এক বিন্দু অনুতাপও নয়—অঞ্জলি যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল।

দিব্যেন্দু এতখানি আশা করেনি। এগিয়ে এসে কুণ্ঠিতভাবে বলল, একটা কথা বলবো ?

অঞ্জলি কথা কইল না, কিন্তু, মুখ তুলে তাকাল।

দিব্যেন্দু বলল, আমিও বামুনের ছেলে—যদি ইচ্ছে করেন, চতুর্থীর ব্যবস্থাটা হয়ে যেতে পারে।

অঞ্জলি এতক্ষণে কাঁদতে পারল। লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে।

কিন্তু, মুস্কিলে পড়ল দিব্যেন্দু। পারলৌকিক ব্যাপারে মন্ত্র পড়াটাই মুখ্য নয়—ব্রাহ্মণ-ভোজন করানোটা অপরিহার্য। কিন্তু, পাওয়া যাবে কোথায়। এখানে, এখনও পর্যন্ত কোন বাঙ্গালীর সঙ্গেই তো পরিচয় হয়নি !

দশকর্ম ভাণ্ডারের সওদাগুলো নিয়ে বাড়ি ফেরবার মুখেই বিশেষভাবে মনে পড়ল কথাটা। বামুন পাওয়া যায় কোথায়। এক-আধজন নয়, হাফ এ ডজন হলেই ভাল হয়। কিন্তু, পাওয়া যায় কোথায় ?

সদরে ঢুকে একবার থমকে দাঁড়াল দিব্যেন্দু। তারপর, বেরিয়ে এসে সটান ঢুকে গেল পাশের গলি...র মধ্যে—নিঃসঙ্কোচে। হেঁকে ডাকল, অনাদিবাবু আছেন ? অনাদিবাবু—

লোকটার সঙ্গে আলাপ ছিল না—থাকবার কথাও নয়। লোকটা মেনকাদাসীদের আপনার জন। থাকে ওদেরই সঙ্গে। দরকারের সময়, ওদের হয়ে, সে-ই কথা কয় বাড়ীওয়ালার লোকের সঙ্গে—সেই সূত্রে নামটা জেনেছিল দিব্যেন্দু।

লোকটাকে দেখলে অবশ্য ভয় করে। কিন্তু, ভাল করে দেখলে সন্দেহ হয়—লোকটার চেহারাখানা এক সময় বোধহয় ভালই ছিল। অবশ্য, চোখের দৃষ্টিটা একটু বেশী রকম সন্ত্রস্ত করে তোলে মনকে। তবুও—

লোকটার গলায়, বস্তিদের মতো গোলাকার করে জড়ানো পৈতেটার কথা কিছুতেই সে ভুলতে পারল না। আবার ডাকল, অনাদিবাবু আছেন?

—কে? উঠোনের ওপাশ থেকে অনাদি মুকুজ্জের বাজখাঁই আওয়াজ শোনা গেল, ঝণ্টুবাবু নাকি? সটান চলে আসুন না ভেতরে।

দিব্যেন্দু একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর ঢুকে গেল ভেতরে।

হনুমান হাউসের পূর্বদিকে, সাঁতরা পার্কের গা ঘেঁষে অনেকখানি জমি খোলা পড়েছিল। তার একাংশ বাঁধানো ছিল সিমেণ্ট দিয়ে। এই বাঁধানো জায়গাটার কিয়দংশ তেতলার ছাদ থেকেও দৃষ্টিগোচর হতো। দিব্যেন্দুরও অজানা ছিল না এই বাঁধানো অংশটুকুর অস্তিত্ব। কিন্তু, নিকটে এসে দেখল, জায়গাটা সম্বন্ধে এতদিন সে যা ভেবে এসেছিল তা একেবারেই ভুল। জায়গাটা বাড়ির উঠোন হিসাবেও গ্রাহ্য হয় না বা নিশীথচারিণীদের লীলাস্থলরূপেও ব্যবহৃত হয় না। বাঁধানো জায়গাটার যেটুকু অংশ তেতলা থেকে দেখা যায়, দিব্যেন্দু নিকটে এসে দেখল, সেটা একটা চতুষ্কোণ অলিন্দবিশেষ এবং তার মধ্যস্থলে বিরাজ করছে একটা শ্বেতপাথরের তৈরি চমৎকার তুলসীমঞ্চ।

তুলসীমঞ্চের ঠিক সামনেই ছিল একটা মাঝারি সাইজের ঘর। দিব্যেন্দু ঘরের অবস্থা দেখে আরও বিস্মিত হলো। বিশেষতঃ, আসবাবগুলোর আনুমানিক মূল্যটা তাকে রীতিমত অভিভূত করে ফেলল। দেওয়ালে যে দুখানা ভিনিসীয়ান মিরর্ টাঙ্গানো ছিল, তার প্রত্যেকখানার মূল্য, আজকেকার বাজারে হাজার তিন-চারের কম নয়। এক কোনে জড়ো করা ছিল একগাদা ছবি। ক্যানভাসের আয়তন আর ফ্রেমের কারুকার্য দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় সেগুলো দামী। সম্ভবতঃ, ছবিগুলো একদিন এদের ব্যবসার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু, বর্তমানে, অ-দরকারেও তাদের ঠিক হতাদরে ফেলে রাখা হয়নি ; সযত্নে গুছিয়ে রাখা হয়েছে এক কোনে। অনাদি মুখুজ্জে যে পালঙ্কটার ওপর শুয়েছিল সেটা ছিল মেহগ্নি কাঠের নীরেট এবং প্রকাণ্ড। সর্বাঙ্গ তার আয়নায় মোড়া। মাথার উপর যে ঝাড়টা ঝুলছিল, তার দাম বলতে পারে একমাত্র অস্লার কোম্পানী। এ ছাড়া, আয়না ফিট্ করা আলমারী, বুককেস প্রভৃতি তো ছিলই।

দিব্যেন্দুকে ঘরে ঢুকতে দেখে অনাদি মুকুজ্জেও ঘাবড়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের আধিক্যে সে শয্যাত্যাগ করতেও ভুলে গেল, কথা কইতেও পারল না।

—আমি আপনার কাছে এসেছিলাম বড্ড মুস্কিলে পড়ে। দিব্যেন্দু হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমাকে কয়েকজন ব্রাহ্মণ জোগাড় করে দিতে হবে।

—বামুন কি করবেন ? কথাগুলো স্পষ্ট বেরুল না অনাদির গলা দিয়ে।

—ভোজন করাবো ! দিব্যেন্দু তার মুস্কিলের কথাটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করল অনাদিকে।

—আপনি বসবেন না একটু ? অনাদি এতক্ষণ পরে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানার ওপরে।

—এই যে! দিব্যেন্দু আসন গ্রহণ করে আবার আরম্ভ করল, আমার বাহাদুরটা কী জাত, আমি ঠিক জানি না। আপনি যদি দয়া করে একজন রাঁধুনী বামুনও ঠিক করে দেন, বড্ড উপকার হয়। ডজন খানেক বামুনের ভোজনের জিনিসপত্র আমি কিনে ফেলেছি অল্‌ রেডি, এখন কেবল দরকার—

—বুঝিছি! অনাদি বলল, কিছু ভাববেন না আপনি, আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিচ্ছি। কিন্তু,···ভোজনকারীরা একটু গরীব-গুর্বো লোক হলে, আটকাবে না তো?

—আরে না না, কি যে বলেন—

—বেশ, বেলা চারটের মধ্যেই একজন হালুইকর আপনার কাছে যাবে'খন। আপনার বাহাদুর যোগাড় দিতে পারবে তো?

—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! বলেই দিব্যেন্দু হঠাৎ থেমে গেল, পাশের জানলাটার দিকে লক্ষ্য পড়াতে। সেখান দিয়ে উঁকি মারছিল রানী, মেনকাদাসীর দৌহিত্রী।

—ওখানে কী করছো? অনাদি মুকুজ্জে যেন খিঁচিয়ে উঠল। বলল, দেখতে পাচ্ছো না?

সঙ্গে সঙ্গেই একগলা ঘুমটা টেনে, রানীবালা দাসী ঘরে ঢুকল। তারপর, টিপ করে দিব্যেন্দুব পায়ে একটা প্রণাম করেই সলজ্জভঙ্গিতে সরে দাঁড়াল দেওয়াল ঘেঁষে।

—এটা আবার কি হলো? দিব্যেন্দু চমকে উঠে অনাদির দিকে তাকাল।

—ও কিছু নয়। অনাদি নির্বিকার মুখে বলল, এখন বলুন, কজন বামুনকে ডাকবো?

—অন্ততঃপক্ষে হাফ-এ-ডজন না হলে,—

—ঠিক আছে। রাত আটটা-নটার মধ্যেই তারা গিয়ে হাজির হবে'খন।

—বাঁচালেন আপনি। কিন্তু—রানীর দিকে একবার চকিতে

তাকিয়েই দিব্যেন্দু আবার জিজ্ঞাসা করল অনাদিকে, ওটা কি হলো বলুন তো ? প্রণামটা কি বামুন হিসাবে পেলুম নাকি ?

—না। বামুন ওরা ঢের দেখেছে।

—তবে ? আচম্‌কা এরকম করবার মানেটা কি হলো ? এতে তো আমি অভ্যস্ত নই !

—আমরাও নই ! অনাদি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

—তবে ?

—তবে আবার কি ? অনাদি গলা ঝেড়ে বলল, প্রণামটা কি আর ও আপনাকে করল ! শরদিন্দু সামাধ্যায়ীর ছেলেকে করল। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন ?

—আপনি দেখছি—দিব্যেন্দু এবার সত্যিই বিচলিত হলো। বলল, আমার খবর রাখেন ! আচ্ছা নমস্কার, বাঁচালেন আপনি।

—আপনাকেও নমস্কার। রানীর উদ্দেশেও একটা নমস্কার করে দিব্যেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

পেছনে অনাদিও এল। তারপর গলিপথের মধ্যে পা দিতেই সে আস্তে আস্তে ডাকল, চৌধুরী মশাই—

—এ্যাঁ ?

—আপনি কোথায় ঢুকেছিলেন, তা জানেন ?

—এ্যাঁ ? দিব্যেন্দু থমকে দাঁড়িয়ে অনাদির দিকে তাকাল অসহায়ভাবে। বলল, কিন্তু আমি তো···

—জানি ! অনাদির মুখে যেন একটু হাসির আভাষ দেখা দিল। বলল, কিন্তু, আপনি জানেন না, নীচুতলা সম্বন্ধে যাদের প্রেজুডিস্ নেই, উঁচুতলার লোকেরা তাদের সম্বন্ধে প্রেজুডাইস্‌ড্ হয়ে পড়েন। আপনার উচিত ছিল, এখানে না এসে, আমাকেই ওপরে ডেকে পাঠানো !

—বাঃ, দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, গরজটা আমার, আর ডেকে পাঠাবো আপনাকে ? আপনি আমার কি ধার ধারেন যে—

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু—

—ও হো হো! দিব্যেন্দু কুণ্ঠিতভাবে বলল, দেখেছেন, গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে! আপনাকেই নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছি—

—আপনার নেমন্তন্ন পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু,—

—রাত্তিরে আসছেন তাহলে নিশ্চয়ই?

—না। আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের কথাটা আপাততঃ প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। হলে,—ক্ষতি হবে আপনার।

—আমার ক্ষতি হবে? কী ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারবেন দু-চারদিন পরেই। কিন্তু, আর নয়। আপনি এবার সরে পড়ুন চুপি চুপি!

নীচুতলা, উঁচুতলা—

তলাতলের তাৎপর্যটা কোনদিন চিন্তা করবার প্রয়োজনবোধ করেনি দিব্যেন্দু। যখন, নতুন করে শুনল, তখনও বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করবার সুযোগ পেল না সে; তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আসনে বসতে হলো চতুর্থীর কাজের জন্য।

অনুষ্ঠানে নারায়ণ শিলা ছিল না। আরও অনেক কিছুরই অভাববোধ করল দিব্যেন্দু আসনে বসে। কিন্তু, যার তৃপ্তির জন্য এত আয়োজন সে অভিভূত হলো। একটা তথাকথিত মৃতভাষার ছন্দোবদ্ধ উদ্গীরণ কী যে বিপর্যয় ঘটালো অঞ্জলির মনে, কিছুই করতে পারল না সে; কেবল, কেঁদে শুদ্ধ হলো। তারপর অনুষ্ঠান শেষ হতেই, সে নিজের ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করল।

ওদিকে, ভোজনকারী ব্রাহ্মণদের যথাযথভাবেই আপ্যায়িত করল দিব্যেন্দু। ভোজন-দক্ষিণা দিল পাঁচ সিকে করে। কিন্তু, যার জন্যে এত আয়োজন, তাকে দেখতে পাওয়া গেল না একেবারেই।

শেষে, রাত দশটার পর, নিমন্ত্রিতদের বিদায় দিয়ে সে গিয়ে টোকা মারল অঞ্জলির দরজায়।

দরজা খুলে দিয়ে, অঞ্জলি মুখ নীচু করে দাঁড়াল। কিন্তু, তার পরণের কোরা শাড়ী, এলায়িত রুক্ষ চুল, আর আয়ত চোখের আরক্ত দৃষ্টি দেখে, দিব্যেন্দুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। কোন রকমে বলল, কিছু মুখে দিতে হবে তো!

অঞ্জলি সবেগে মাথা নাড়ল।

দিব্যেন্দুর কেমন যেন ভরসা হচ্ছিল না বেশী কথা কইতে। তাই, সংক্ষেপে বলল, ওপরে আসুন—

কি ছিল দিব্যেন্দুর কণ্ঠস্বরে, অঞ্জলি আর মুখ তুলে তাকাতেও ভরসা করল না!

—আসুন।

শোবার ঘরের এক কোণে, নিজের সন্ধ্যাহ্নিক করবার আসনটি পেতে দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, বসুন—

নতমুখী নড়ল না। কিন্তু, লক্ষ্য করল, পাশের ঘর থেকে নিজে হাতে করে খাবার নিয়ে এল দিব্যেন্দু। এক রেকাবি ফলমূল আর একটা পাথরের গেলাসে ভর্তি—বোধহয় মিছরীর জল।

আসনের সামনে জিনিসগুলো সাজিয়ে দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, খেয়ে নিন্। আমি ও ঘরে যাচ্ছি—

দিব্যেন্দু চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল অঞ্জলির। সামলাতে না পেরে, সে সেইখানেই, সেই মেঝের ওপরেই বসে পড়ল তাড়াতাড়ি।

কবে সে কোন অতীতে একটা মহাপ্রলয় হয়ে গিয়েছিল, আজও কেন তার বিষাক্ত স্মৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মনে, বিপর্যয় ঘটায় জীবনে—উদ্বুদ্ধ করে তোলে সত্যাসত্যের সর্বনেশে সমাধানে বিলীন হতে। একদিন একটা অনাগত অঘটনকে রোধ করেছিল সে নিজের

বুদ্ধিতে—যুক্তি দিয়ে তুচ্ছ করেছিল সেদিনকার বর্তমানকে—তার কল্পনার ভবিষ্যৎকে রাঙ্গিয়ে তোলবার প্রত্যাশায়—যে প্রত্যাশার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তার মনে, অতসীদির মতো চির-বঞ্চিতাদের শিক্ষায়,—সহপাঠিনী আই-সি-এস প্রত্যাশিনীদের প্ররোচনায়, চোখে-দেখা সোসাইটি গার্লদের নজীরে। কিন্তু আজ, সত্যিই যখন সেই ভবিষ্যৎ এল—

কেন দেখা দিল এমন অসহনীয় রূপ ধরে !

সেদিনকার শিক্ষা তাকে নির্মম করে তুলেছিল, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতে। অশ্রদ্ধা করতে ভারতবর্ষের নিজস্ব ধর্মে। অবজ্ঞা করতে সনাতনীদের সব কিছুকেই। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস, পিতার বাৎসল্য, সন্তানের কর্তব্য—সব কিছুকেই অবিশ্বাস করেছিল সে—নিছক নিজের বিশ্বাসটাকে সত্য প্রমাণ করবার জন্যে। প্রমাণও দিয়েছিল সে দিনের পর দিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে, একটা অমানুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে, গোটাকতক গদ্দীনশীন্ মতলববাজের স্বার্থ-প্রত্যাশিত আইনকে সত্যিকার সত্য হিসাবে প্রমাণ করবার জন্যে। কিন্তু আজ, এতদিন পরে যে মহাসত্যর সম্মুখীন হয়েছে সে, সে-সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে সে কার মুখ চেয়ে, কিসের প্রত্যাশায়, কোন অন্যায়কে ন্যায়ের আবরণে আবরিত করবার জন্যে !

ভগবান ! অঞ্জলির চোখের জল আবার বাঁধ ভাঙ্গেঃ যাকে এড়াবার জন্যে একদিন আমি ভুল করেছিলাম, তাকে এমন করে কেন ফিরিয়ে দিলে তুমি ! দিলেই যদি, তাকে আর পাঁচটা মানুষের মতো করে গড়লে না কেন !—কেন রাখলে না চোখের আড়ালে !

—কি হলো ? দিব্যেন্দু এসে ঘরে ঢুকল। বলল, না, আপনাকে দেখছি কড়া শাসনে রাখতে হবে। উঠুন, উঠুন বলছি শীগগীর, না হলে গায়ে হাত দোব কিন্তু...

দিব্যেন্দু সত্যিই দু পা এগিয়ে এল। দেখে, অঞ্জলি চোখের জল মুছল ; কিন্তু মুখ তুলল না।

—এই তো সামান্য জিনিস। দিব্যেন্দু বলল, চট্ করে পাচার করে দিন না পেটের ভেতর। আচ্ছা দাঁড়ান—

দিব্যেন্দু রেকাবিটা তুলে আনবার উপক্রম করতেই অঞ্জলি বলে উঠল, আঃ, কী হচ্ছে! আপনি যান তো এ ঘর থেকে।

—কিন্তু, সমস্ত দিনই যে পেটে কিছু পড়েনি। আগে বরং মিছরীর জলটা খেয়ে নিন।

—থাক আর গিন্নীপনা করতে হবে না। আপনি যান এখান থেকে।

দিব্যেন্দু রেকাবি রেখে বলল, গিন্নীরা গোলমাল বাধালে, কর্তাদেরই মাথা ঠিক রাখতে হয় যে! আমি গেলে খাবেন তো ঠিক ?

—আঃ বলছি না—

—আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি। দিব্যেন্দু আবার বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বলল, ওকি, ওগুলো আবার ফেলে রাখলেন কেন! আচ্ছা, আবাব বাইরে যাচ্ছি আমি।

—থাক, আর বাইরে যেতে হবে না।

—কিন্তু, আপনি যে আবার আমার সুমুখে খাবেন না!

—ইস্, কি আমার ইয়ে এলেন রে—ওঁর সামনে আবার লজ্জা!

—বেশ, তাহলে খেয়ে ফেলুন চট্ করে।

অঞ্জলি আবার মুখ নীচু করল। একটু নাড়াচাড়া করল রেকাবির ফলগুলো। তারপর হঠাৎ কেমন যেন অসহায়ের মতো মুখ করে বলল, সত্যি, বড্ড বিশ্রী লাগছে আমার। আপনি এ কি করলেন বলুন তো ?

—আমি আবার কি করলাম ? দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল।

—এই সব কাণ্ড কারখানা! অঞ্জলি অস্বস্তিভরে একবার মাথা

হয়ে গিয়েছিল—পারিপার্শ্বিকের প্রভাব দোষে। দোষ করেছিল, সে ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবর পেছনে ছুটতে গিয়ে—নিজের পিতার স্নেহ-ভালবাসাকে অবজ্ঞা করে, রাষ্ট্র-পিতাদের তৈরি আইন-কানুনের মধ্যে কল্যাণ খুঁজতে গিয়ে। খুঁজে-মরা তার বৃথা হয়েছে—সত্য হয়ে উঠেছে কেবল জ্বলে পুড়ে মরার ঘটনাটুকু। এমন ঘটনা ঘটছে আজ ঘরে ঘরে! ঘটনাগুলো যে আর ঘটনার সংজ্ঞাভুক্ত থাকবে না অদূর ভবিষ্যতে, তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে, দৈনিকের দৈনন্দিন সমাচারে। কিন্তু—

সে যে শত চেষ্টা করেও, ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানকে ভুলে থাকতে পারছে না অতীতের কথা স্মরণ করে। সমস্যাটা যেন ক্রমশই ঘোরাল হয়ে উঠছে। সত্যিই কি, চোখের আড়ালে গেলে, মনের আড়াল করতে পারবে সে অঞ্জলিকে! পারতো, যদি সামান্য একটুও সম্ভাবনা থাকত—স্বামীর সংসারে সচ্ছল জীবন যাপন করবার। অর্থনৈতিক অসাচ্ছল্য মানুষকে তার মনুষ্যধর্ম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিতে পারে। সুতরাং, অঞ্জলির মতো মেয়ের পক্ষে একদিনের একটা ভুলকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব হয়তো নাও হতে পারে। বিশেষতঃ—

এই বিশেষত্বটাই বিচলিত করে দিব্যেন্দুকে। অঞ্জলির মতো মেয়ে—সেদিন কুলত্যাগিনী হয়েছিল কি নিছক, অর্থনৈতিক সাচ্ছল্যের আশায়? সেদিন, বিভূতির কাপ্তেনী-করাটুকুই কি কেবল তাকে প্রলোভিত করেছিল—আর কিছু নয়? হাসপাতালের পথে এগোতে এগোতে সে আবার আগাগোড়া পর্যালোচনা করে অঞ্জলির মুখ থেকে সদ্য শোনা ঘটনাগুলো—

অঞ্জলির বাবাকে পাড়ার লোকে বলত, সেকেলে আকাট-মুখ্যু। কিন্তু, এ হেন মুর্খও মেয়েকে কলেজে পাঠিয়েছিলেন।—কারণ—

শিক্ষার জন্য নয়, সময় ক্ষেপণের জন্য। মেয়ের কোষ্ঠি বিচার করে তিনি জানতে পেরেছিলেম, তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত তার

বিবাহস্থানে গণ্ডগোল আছে। সুতরাং, তাঁর আমিই ক্ষমা চাইছি অতখানি বয়স পর্যন্ত মেয়েকে অকারণ ঘরে আটকে রেখেছিলেন বিভূতির স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে কালহরণ করাটাই বাঞ্ছনীয়।
স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ঢুকেছিল।

বলা বাহুল্য, শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে গিয়ে, মেয়ে যাতে আবার অন্য কোন কিছুতেও দীক্ষিত না হয়ে পড়ে, সে সম্বন্ধে অতিরিক্ত রকমের সচেতন ও সাবধান ছিলেন বৃদ্ধ। মেয়েকে তিনি মেয়েদের কলেজেই দিয়েছিলেন। নিজে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে আসতেন, ফিরিয়েও আনতেন নিজে। বস্তুতঃ, বয়স্থা কন্যার ভবিষ্যতের জন্য বিন্দুমাত্রও অস্বস্তি ছিল না বৃদ্ধর মনে, কারণ, তিনি খুব ভাল করেই খোঁজখবর নিয়েছিলেন,—কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ সকলেই প্রায় তাঁরই বয়সী, তরুণ বয়সী একজনও নেই।

বৃদ্ধ, অধ্যাপিকার দলকে হিসাবের বাইরে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিপদটা এল কিন্তু তাদেরই একজনের কাছ থেকে। কুমারী অতসী দাশগুপ্তা ছিলেন সেই কলেজেরই একজন অধ্যাপিকা; অধিকন্তু, নিজের ফ্ল্যাটে কোচিং ক্লাশ খুলেছিলেন তিনি ছাত্রীদের সুবিধার জন্য। অঞ্জলিও সেই ক্লাশে ভর্তি হয়েছিল সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেই।

অতসীদির স্বাস্থ্য ছিল না, সৌন্দর্য ছিল না, কিন্তু, আগুন ছিল মনে! মেয়েদের কল্যাণকামী অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। অনেক রকমের সংস্কৃতিমূলক ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন প্রয়োজনীয় পরামর্শদাত্রী। প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে, চমৎকার বক্তৃতা করতে পারতেন তিনি। পুরুষ-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর অকৃত্রিম বিষোদ্গার মাঝে মাঝে দৈনিকের পৃষ্ঠাতেও স্থানলাভ করতো। বস্তুতঃ, গণ্ডীটা ছোট হলেও, বেশ কিছু ছেলেমেয়ের মনে যে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার প্রমাণ—

হয়ে গিয়েছিল—প[illegible]ন কখনও কামাই যেত না। সংস্কৃতি উৎসবের সে ধ্রুবকে ছো[illegible]বার জন্যে, কিংবা মহিলা সম্মেলনের বক্তব্য-বিষয় স্নেহ-ভাল[illegible]বার জন্যে, অথবা কোন শিশু-শিক্ষা মন্দিরের পরিচালনা-পদ্ধতির সংস্কার করবার উদ্দেশ্যে, প্রগতিকামী ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি যখন তখন দেখা যেত তাঁর ড্রইংরুমে। বেচারা শাস্ত্রীমশাই তাঁর কোচিং ক্লাশের খবরটুকুই শুধু কানে শুনেছিলেন, জানতে পারেন নি, অত সব বৃহৎ মহৎ কাণ্ড-কারখানার নেত্রীত্ব করেও, ভদ্রমহিলা ক্লাশ করতে পারেন কোন অমানুষিক শক্তিতে!

এই কোচিং ক্লাশেই রবীন্দ্র সঙ্গীত হতো; সিনেমা-তারকাদের আলোচনা হতো; ইষ্ট বেঙ্গল এম. সি-সিও বাদ যেত না; দল বেঁধে অন্যত্র গিয়েও ক্লাশ করবার বিধি-ব্যবস্থা স্থির করা হতো।

অঞ্জলিও দলে ভিড়েছিল; কিন্তু, দলের দলীদের মতো স্বাধীন ভাবে ক্লাশ করবার উপায় ছিল না তার—বাড়ীর ভয়ে। এবং—

হয়তো তার এই হীনমন্যতাটাই অত্যধিক বিচলিত করে তুলেছিল দলের-দলীদের। মেয়েরা তো রীতিমত ঠাট্টা করতো। অতসীদিও মাঝে মাঝে ফেটে পড়তেন। বলতেন, মেয়েদের সব চাইতে বড় শত্রু কারা জান? মেয়েরাই। সেকালে ছিল মা-ঠাকুমার দল আর একালে জন্মেছ তোমরা। আমি আমার মা-ঠাকুমাদের বরং ক্ষমা করতে পারি, কারণ, তখনকার দিনে, পুরুষ-শাসিত সমাজের আইনটাই ছিল একমাত্র আইন। কিন্তু এখন? শিক্ষিতা মহিলারা পার্লামেণ্টে গিয়ে লড়ছেন কি তোমার মতো অমানুষের বংশবৃদ্ধি করবার জন্যে?

—কী করবো? অঞ্জলি কুণ্ঠিত হয়ে বলতো, বাবা যে বড্ড খুঁত খুঁত করে—

—আমিও তো তাই বলছি। অতসীদি আরও রেগে গিয়ে বলতেন, তুমি কি একটা জড় পদার্থ না পোষা জানোয়ার যে এইভাবে একটা সেকেলে পাগলের পাগলামীকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছো?

নিজের ভাল-মন্দ বোঝবার বয়স হয়নি তোমার আমিই ক্ষমা চা[illegible]
নও? তবে কি অধিকার আছে ওই লোকটার, ভে:রছিলেন বিভূতির
প্রতিটি ব্যাপার সন্দেহের চোখে দেখবার? হলেই বা ৺.
মতো মেয়েকেও যে লোক সন্দেহের চোখে দেখে, আমার কাছে
তার ক্ষমা নেই। ছিঃ ছিঃ তোরা কি রে? এতটুকু আত্মসম্মানজ্ঞান
নেই অথচ নিজেদের শিক্ষিতা বলে পরিচয় দিতে চাস?

ছেলেরা কিন্তু রাগ করতো না, বরং সহানুভূতিই জানাতো সুযোগ পেলে! যদিও অঞ্জলি পারতপক্ষে তাদের সে সুযোগ দিত না। তবে, একটা ছেলেকে তার খুব খারাপ লাগত না—বড্ড ছেলেমানুষ ছিল বলে। সত্যিই সেদিন বিভূতিকে বড্ড ছেলেমানুষ বলেই মনে হয়েছিল অঞ্জলির। যে লোক চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা ফেলে দেয়: ঋণ দিয়ে প্রো-নোট্ নেয় না; পকেট উজাড় করে পরের স্ফুর্তির খরচ জোগায়, অথচ, বিনিময়ে কিছুই চায় না, তাকে ছেলে-মানুষ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে!

অতসীদিও তখন খুব ভালবাসতেন বিভূতিকে। না, টাকার জন্যে নয়; টাকা তিনি আরও অনেক ছেলের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। বিভূতিকে ভালবাসতেন তিনি, তার ছেলেমানুষীর জন্যেই। বিভূতির দুর্বলতা ছিল—পলিটিক্যাল নেতৃত্বের প্রতি। আধুনিক রাশিয়ার উদাহরণ দিয়ে সে যখন স্বদেশের সব কিছুকেই নস্যাৎ করবার চেষ্টা করতো জ্বালাময়ী ভাষায়, তখন হঠাৎ কেউ হয়তো ইঙ্গিত করতো তার না-পড়া পাণ্ডিত্যের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতি হেসে ফেলতো। তার দাঁতগুলো ছিল যেমনি সুন্দর, হাসিটাও ছিল তেমনি শিশুর মতো সরল।

সত্যিই, বড্ড সরল ছিল বিভূতি। দলের মধ্যে সব চাইতে বড় লোক ছিল সে। একলা বাস করতো একটা আড়াই শ' টাকার ফ্ল্যাটে; সিল্ক ছাড়া পরতো না, ট্যাক্সী ছাড়া চড়তো না; অকারণে টাকা খরচ করতো মুঠো মুঠো, অথচ, দম্ভ ছিল না বিন্দুমাত্রও। আর—

হয়ে গিয়েছিল—কথা বলবার সাহস। সত্যিই, সেদিন বিভূতির সে রূপকে দেখে অঞ্জলি কেবল স্তম্ভিতই হয়নি—বেশ বিচলিতও স্নেহ-ভাজন। দিন, একঘর লোকের মাঝখানে বিভূতিকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করেছিল করবী গুপ্তা আর রজত সেন। নিছক ইয়ার্কীর জন্যে নয়—ওকে আঘাত দেবার একটা নিগূঢ় কারণও ছিল প্রণয়ী যুগলের মধ্যে। মিস্ গুপ্তা হঠাৎ বলে বসল, মিস্টার হালদার, আজকের দিনেও আপনি কেন পৈতে পরে বেড়ান? কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নেই তো?

পৈতে রাখার জন্যে বিভূতিকে প্রায়ই খোঁচা খেতে হতো। তাই করবীর কথাটাকে সে হেসে উড়িয়ে দিল। কিন্তু, পাক দিয়ে সুতো লম্বা করল রজত। বলল, শুধু উদ্দেশ্য? নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলো! বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা। কি বলো হে বিভূতিচন্দ্র?

—কী কী কী হলো কথাটা? বিনা প্রেম সে···কী?

—খুড়ি, কথাটা হবে, বিনা মতলব সে না মিলে ভশ্চায্-কন্যা।

—অর্থাৎ?

—মিস্ ভট্চায্ যে বাপের মেয়ে, আর নিজেও যে রকম কন্‌জারভেটিভ্, তাতে, পৈতে দেখিয়ে কাজ হাসিল করার মতলবটা···

—শাট্ আপ!. বিভূতি আচমকা গর্জে উঠেছিল। তার অত দিনকার পরিচিত চেহারাটাই যেন বদলে গিয়েছিল সেদিন। সাফ্ জবাব দিয়েছিল, আমি তোর মতো কোলকেত্তিয়া রজত নই—পাড়াগাঁয়ের বিভূতি। বুঝলি রে বাঁদর? আমরা তোদের মতো মতলব নিয়ে চলা-ফেরা করি না—প্রেম করে পালাই না—বিয়ে করবার মতো সাহস রাখি—বুঝলি রে মতলববাজ?

—আঃ কি করছো তোমরা—অতসীদি ব্যাপারটাকে তরল করবার চেষ্টা করেছিলেন—সামান্য কথা নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়!

—একে আপনি সামান্য বলেন? মিস্ ভট্চায্‌কে আপনি চেনেন না বলতে চান? তাঁকে নিয়ে এই ধরনের নোংরা ইয়ার্কী···

—আচ্ছা আচ্ছা, রজতের হয়ে না হয় আমিই ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে—অতসীদি সত্যিই হাত-জোড় করেছিলেন বিভূতির কাছে।

গোলমালটা তখনই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু, ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে, সেইদিনই ঘটে গেল আর একটা ঘটনা। বিভূতিকে একান্তে ডেকে অতসীদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি রাগ করলে ভাই? ছি, ওদের কথায় কি রাগ করতে আছে! কাল কখন আসছো? আর্ট একজিবিশন দেখতে যাওয়ার কথাটা মনে আছে তো?

—সরি, যেখানে এই ধরনের নোংরামী চলে, সেখানে আমি আর আসবো না। ছ্যা ছ্যা···

—ওমা, ওদের জন্যে তুমি আসা বন্ধ করবে কেন? কী মুস্কিল—যাকে নিয়ে এত কথা, সে তো কই রাগ করেনি!

—তার মানে? অঞ্জলি দেবী রাগ করেন নি? আসা বন্ধ করবেন না?

—সে আসা বন্ধ করবে কেন? সে তো পড়তে আসে—

—ওঃ, তবে আমিও আসবো'খন—বলে প্রস্থানোদ্যত হতেই, অঞ্জলির সঙ্গেই চোখাচোখী হয়ে গিয়েছিল বিভূতির।

বেচারা সেদিন ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তারপর, আবার সেই লজ্জাটাকে ঢাকা দেবার জন্যেই, আরও ছেলেমানুষী করে ফেলেছিল পরের দিন! সাড়ম্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে, অঞ্জলির লজ্জার বাঁধটাকে বেশ একটু চিড়্ খাইয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ, কোচিং ক্লাশের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে, একমাত্র বিভূতিকেই ভাল লেগেছিল অঞ্জলির। তাই, তার সঙ্গে—একমাত্র তারই সঙ্গে সে একটু সহজভাবে মেলামেশা করতে পেরেছিল।

ওদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসছিল। অঞ্জলির মা ছিল না, কিন্তু বৌদি ছিল। তারই কাছ থেকে শুনতে পেল, যে লোকটার সঙ্গে

বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে তার, তার নাকি কোন ইউনিভারসিটি ডিগ্রী নেই। তবে, বাপের বোধহয়, কিছু জমানো টাকা-কড়ি আছে। বাপটা নাকি, রাজপুতানার কোন নেটিভ স্টেটের মন্ত্রী ছিল এক সময়।

খবরটা অঞ্জলির মুখ থেকেই শুনলেন অতসীদি। শুনে, যা তিনি কখনও করেন নি, তাই করে ফেললেন। বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওপর-পড়া হয়ে বললেন, কাজটা কি আপনার উচিত হচ্ছে? অঞ্জলি একজন শিক্ষিতা মেয়ে—তার সঙ্গে একটা অশিক্ষিত ছেলের বিয়ে দেওয়াটা কি আপনার উচিত হচ্ছে?

বৃদ্ধ অবশ্যই চটে গিয়েছিলেন মনে মনে। কিন্তু, ভদ্রমহিলার অমর্যাদা করলেন না। বললেন, আপনি দেখছি, আমার চাইতেও বেশী শুভাকাঙ্ক্ষী ওর। কিন্তু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা আপনাদের সমাজের লোক নই! আমার মেয়ে স্বামীর ফ্ল্যাটে যাবে না, শ্বশুরবাড়ি যাবে! আর মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করবার দায়িত্বটা—পাড়ার লোকের নয়, আমারই!

এ কথার পর আর কী বলা যেতে পারে! অগত্যা, বাড়ি ফিরে এলেন অতসীদি এবং বলাই বাহুল্য, সেইদিন থেকে অঞ্জলিরও বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল।

হপ্তা খানেক পরে, স্বয়ং বৃদ্ধই একদিন নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন অতসীদিকে। জানালেন, আপনি অঞ্জলির কল্যাণকামী। সেই কারণে, তার শুভাশীর্বাদ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। দয়া করে আসবেন। শুভলগ্নে আপনার ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাবেন।

অতসীদি প্রথমটা যাবেন না ঠিক করেছিলেন। কিন্তু, যথাসময় প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা সম্ভবপর হলো না তাঁর পক্ষে। কতকটা, মজা দেখার মন নিয়েই গিয়ে হাজির হলেন অঞ্জলিদের বাড়িতে। শুনলেন, বরের বাপ নাকি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর মতো দার্শনিকও তাঁকে নাকি গুরুর মতো সম্মান করেন! কিন্তু,

লোকটার সাজ-পোশাক দেখে আর কথাবার্তা শুনে, অতসীদি শিউরে উঠলেন, অঞ্জলির ভবিষ্যত ভেবে।

লোকটা আশীর্বাদ করতে এসেছিল একটা প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে। শোনা গেল, গাড়িখানা তাঁর এক মাড়োয়াড়ী ভক্তর। ভক্তটিও সঙ্গে এসেছিলেন দিব্যি কাপ্তেন সেজে। কিন্তু, গুরুর পরণে যা ছিল—তা চেয়ে দেখবার মতো নয়। পায়ে ছিল একটা রুপো-বাঁধানো খড়ম আর কোমরে ছিল একটা জ্যালজেলে তসর। কিন্তু, তার গরমেই যেন লোকটা চোখে কানে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কে প্রণাম করল বা না করল কিছুই ভাল করে লক্ষ্য করল না; আগে থেকেই সকলকে আশীর্বাদ করে ফেলল—মায় অতসীদিকে পর্যন্ত।

সাড়ম্বরে, অনেক রকমের অং বং হেঁকে আশীর্বাদ কার্য হয়ে গেল। তারপর, অতসীদিকে একান্তে পেয়ে অঞ্জলি কেঁদে ফেলল: আমার কি হবে? ওই শুচিবাইগ্রস্ত বুড়োটার বাঁদীগিরি করে জীবন কাটাতে হবে? আমাকে বাঁচাও অতসীদি—

—সত্যিই বাঁচতে চাস তুই? মন ঠিক করে বল অঞ্জু—এখনও উপায় আছে। অতসীদি গম্ভীর হয়ে বললেন।

—তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনবো।

—বেশ, একটা কথার জবাব দে দেখি। লজ্জা করে সময় নষ্ট করিস নি। বিভূতিকে কেমন লাগে তোর?

অঞ্জলি মুখ তুলতে পারল না।

—বিভূতি তোকে ভালবাসে—জানিস?

অঞ্জলির মাথাটা আরও নীচু হয়ে গেল।

—লজ্জা করে সময় নষ্ট করিস নি অঞ্জু! আর মাত্র তিন দিন পরেই বিয়ে। যা করবার এর মধ্যেই করে ফেলতে হবে আমাদের।

—তুমি কি করতে বলছো আমাকে?

—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলছি। অতসীদি চাপা গলায় বললেন, তোর বাপটা যা গোঁয়ার, হয়তো থানা-পুলিস করবে।

সেই জন্যে বলছি, পেছনে পয়সাওয়ালা লোক থাকা দরকার। তা ছাড়া, আমি জানি বিভূতি তোকে ভালবাসে। এখন বল— রাজী আছিস?

—থানা—পুলিস?

—আঃ, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন! অতসীদি বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই তো সাবালিকা, তোর ভয়টা কিসের? তবে দিন কতক লুকিয়ে থাকতে হবে তোকে। রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দিলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে না! এখন বল, যাব বিভূতির কাছে? সে তো তোর জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

—কিন্তু, আমি যে—আমি যে ওর সম্বন্ধে কিছুই জানি না অতসীদি।

—আমি জানি। আমি তাকেও জানি, তোকেও জানি। তাই তো বলছি, বিয়ের ভড়ং-এর কথাটা ভুলে গিয়ে তার ভালবাসার কথাটা একটু ভাব—

—আমি আর ভাবতে পারছি না অতসীদি। তুমি যা হোক কিছু একটা উপায় করো।

—বেশ। কিন্তু, সাবধান, কথাটা যেন কাকে-পক্ষীতেও না টের পায়!

অতসীদি সেদিন চলে গেলেন। আবার এলেন পরের দিন। প্রকাশ্যে, সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন—এমন একটা ছাত্রীকে আর পড়াতে পারবেন না বলে। তারপর, গোপনে, একটা আবেদন-পত্রে সই করিয়ে নিলেন অঞ্জলিকে দিয়ে। আরও, বুঝিয়ে বলে গেলেন, কবে, কখন, কী ভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হুজুরীমল লেনের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাকে।

—একলা বেরিয়ে যাব?

—হ্যাঁ, একলাই যাবে মোড় পর্যন্ত। সেখানে গেলেই দেখতে পাবে, একটা ট্যাক্সীতে বসে আছি আমি।

তারপর—

বিয়ের দিন, বর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই—বাড়ির সকলে সদরপানে ব্যস্ত হয়ে উঠতেই, খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে গেল সে একবস্ত্রে। ট্যাক্সী যথাস্থানেই ছিল। অতসীদি ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, তুই বিভূতির সঙ্গে চলে যা। আমাকে এখন তোদের বাড়িতেই থাকতে হবে।

—তুমি থাকবে না, সঙ্গে? অঞ্জলি সত্যিই কেঁদে ফেলেছিল।

—পাগলী, ভয় কী। বুঝতে পারছিস না, আমিও নিমন্ত্রিত যে তোদের বাড়িতে। এ সময়ে ওখানে না থাকলে, মুস্কিলে পড়তে হবে না?

অতসীদি চলে গেলেন বিয়ে-বাড়িতে; আর যার বিয়ে, সে বিভূতির সঙ্গে গিয়ে উঠল তারই ফ্ল্যাটে।

ঘণ্টা তিনেক পরে আবার দেখা দিলেন অতসীদি। সংক্ষেপে জানিয়ে গেলেন, বিভূতির বাড়ি ছেড়ে আর অন্য কোথাও গিয়ে গা-ঢাকা দেবার দরকার নেই। অঞ্জলির বাবা থানা-পুলিসও করবেন না; মেয়েকে ফেরত পাবার চেষ্টাও করবেন না। আজ রাত্রেই তিনি কাশীযাত্রা করছেন।

এতবড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ, তার জন্যে কেউ কিছু করল না—এই অদ্ভুত ব্যাপারটা চিন্তা করে করেই অঞ্জলি যেন একটু সহজ সরল হয়ে উঠল। না হলে, প্রথম কদিন তো সে একেবারে জড়-ভরত হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমে, অপেক্ষা করার দিনও শেষ হয়ে এল। বিভূতি হবু-শ্বশুরকে পত্র লিখল কাশীতে,—আগামী তেরই তারিখে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করছি সরকার প্রবর্তিত আইন-মতে। আপনি পূর্ব কথা ভুলে গিয়ে, আমাদের আশীর্বাদ করুন এই প্রার্থনা।

পত্রের জবাব এল না। কিন্তু, পিতা দেখা দিলেন, ফুলশয্যার

পরের দিন সকালে। মায়ের অলংকারে মেয়ের অধিকার—এই তথ্যটুকু সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েই তিনি চলে গিয়েছিলেন—অঞ্জলির হাতে গহনাগুলো গছিয়ে দিয়ে।

সে সব দিনের কথা স্মরণ করে আজও কেঁদে ফেলে অঞ্জলি। কিন্তু সেদিন কাঁদতে পেরেছিল কি? সঠিক মনে পড়ে না। তবে, এটুকু মনে পড়ে—কাঁদবার অবসর তার ছিল না। তাকে তখন পেয়ে বসেছিল শাড়িগাড়ির মোহ; সাহেবী-খানার লালসা; রাত-জেগে আনন্দ করার নেশা।

তারপর, আরম্ভ হলো তার···প্রায়শ্চিত্তের পালা।

প্রথম আঘাত পেল সে বিভূতির দেশের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে পরিচিত হতে গিয়ে। জানতে পারল তার জাতের কথা।

অতঃপর সে কৈফিয়ৎ চাইতে গেল অতসীদির কাছে—জেনে-শুনে কেন তিনি তার এতবড় সর্বনাশ করেছেন। কিন্তু বাড়িওয়ালার কাছে যা খবর পাওয়া গেল তা আরও সর্বনেশে। সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবার অপরাধে কলেজ থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁর কোচিং ক্লাশের আসল রহস্যটাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং জনৈক করবী গুপ্তা নাকি তাঁকে কাঠ-গড়ায় পর্যন্ত ঠেলে তুলেছিল—কী একটা ষড়যন্ত্রের আসামী করে। আপাততঃ তিনি নি-পাত্তা।

বাড়ি ফিরেই সে সোজা প্রশ্ন করেছিল বিভূতিকে, আমাকে বিয়ে করবার জন্যে কত টাকা দালালী দিয়েছিলে ও মাগীকে?

—ছিঃ! বিভূতি জিব কেটে বলেছিল, বাঙলা দেশের একজন বরেণ্যা মহিলার উদ্দেশে ওরকম অশ্লীল কথা তোমার বলা উচিত নয়।

—ইয়ার্কী রাখ। কথার জবাব দাও। কত টাকা দালালী দিয়েছিলে?

—ছিঃ! দালালী কথাটা আন্‌-পার্লামেণ্টারী। তবে,—ওঁর কোচিং

ক্লাশে নাকি অনেক উদ্বাস্তু মেয়ে ছিল, তাদের কল্যাণের জন্যে কয়েক হাজার টাকা ডোনেশান আদায় করেছিলেন।

—হুম্। আর কত মেয়ের জন্যে কত টাকা ডোনেশান দিয়েছিলে জানতে পারি?

—মাইরী বলছি অঞ্জু—তোমাদের ভগবানের দিব্যি—রজতদের মতো ফুলে ফুলে মধু লোটবার ইচ্ছে আমার কোনদিনই হয়নি। আমি কেবল তোমারই জন্যে—

—জাত ভাঁড়িয়ে, চাঁদির জুতো মেরে, মতলব হাসিল করেছিলে?

—বিশ্বাস করো অঞ্জু, আমি সত্যিই জানতাম না, তুমি এত গোঁড়া। তাই নিজে থেকে জানাবার কথাটা আমার মনে পড়েনি।

--তাই বুঝি পৈতেটাকে অত মোটা করে ঝুলিয়ে বেড়াতে?

—সত্যি বলছি অঞ্জু, বিশ্বাস করো—তোমাকে ঠকাবার জন্যে আমি পৈতে পরিনি। এ আমার বাবার আমলের ব্যবস্থা। তুমিও তো সেদিন গিয়ে দেখে এলে, আমাদের সকলেই পৈতে পরে রয়েছে।

এইভাবেই চলছিল। মনের শান্তি নষ্ট হলেও সংসারের সচ্ছলতা তার তখনও ছিল। কিন্তু মাসখানেক রে, সেদিকেও দুর্যোগ দেখা দিল। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরল না বিভূতি।

বিয়ের পরে অঞ্জলি কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল; কিন্তু বিভূতির ছাড়বার উপায় ছিল না, কলেজ ইউনিয়নের লীডারশিপ বজায় রাখবার দুর্বলতায়। কদিন যাবৎ ঘন ঘন মীটিং করছিল বিভূতি। তাই, অঞ্জলি প্রথমে কলেজেই গেল স্বামীর খবর নিতে। যা শুনল তা সাংঘাতিক—

কলেজের দু'জন সোভিয়েট প্রেমিক তরুণ অধ্যাপকের চাকরিচ্যুতির ব্যাপার নিয়ে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধেছিল;

ইউনিয়নের। সেদিন, প্রিন্সিপ্যালকে তাঁর ঘরের মধ্যে বন্দী করে, দরজার সামনে দাঁড়া-মীটিং আরম্ভ করে দিয়েছিল মেম্বাররা। অবশ্য, বৃদ্ধ প্রিন্সিপ্যাল পুলিসে খবর পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পুলিসের আসতে দেরি হচ্ছিল। অগত্যা, বৃদ্ধ জোর করে স্টুডেন্টদের ব্যূহভেদ করে বাইরে যাবার চেষ্টা করেন এবং সেই সময়েই তাঁর পাকা মাথাটা লাল করে দেয় ইউনিয়নের লাল ঝাণ্ডাটা। ঘটনাটাকে মব ঘটিত বলেও তরল করা যায়নি; বিভূতি প্রমুখ তিনজন লীডারকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে।

পরদিন জামিনের ব্যবস্থা হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভূতির লীডারী-জীবনের অবসান ঘটিয়ে দিল তার সহকর্মী-সহাধ্যায়ীরাই। আশ্চর্য! এতদিন যারা ছিল বিভূতির গুণমুগ্ধ সহকর্মী-সহাধ্যায়ী, তারা সকলেই যেন ষড়যন্ত্র করে ওর দোষ-কীর্তন আরম্ভ করে দিল—সে নাকি ছাত্র-সমাজের কলঙ্ক! এবং, একটিমাত্র লোকের জন্যে সমস্ত ছাত্র-সমাজে কলঙ্ক অর্শাবে, এও তারা হতে দেবে না।

মীটিং-এ প্রতিবাদ জানাবার জন্য বিভূতিও প্রস্তুত হলো; কিন্তু, কিছু বলবার পূর্বেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল বেদম ঠ্যাঙ্গানী খেয়ে।

হাসপাতালে, কেবিনে রাখা হলো বিভূতিকে। খবর পেয়ে দেশ থেকে তার কাকা এলেন। ভাইপোর মাথার কাছে বসে অনেক দুঃখ করলেন; অনেক পরামর্শ দিলেন। শেষ পর্যন্ত বিভূতিও সম্মত হলো মামলা করতে।

আনুষঙ্গিকের ব্যবস্থা সব কাকাই করতে লাগলেন। বিভূতি কেবল শুয়ে শুয়ে দস্তখত করে দিল প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রে।

তারপর, কাকা একদিন আবার বাড়ি গেলেন। বিভূতিও একদিন ছাড়া পেল হাসপাতাল থেকে। এবং নিঃসন্দেহে জানতে পারল, সে একেবারে নিঃস্ব। এতাবৎকাল, সে যে টাকা পেয়ে এসেছে তার কাকার মারফৎ, সেগুলো পেয়েছিল নাকি সে সম্পত্তি বিক্রীর বিনিময়ে—উক্ত কাকারই জনৈক শালার কাছ থেকে।

বর্তমানে, তার নাকি বিক্রী করবার মতো আর কিছুই নেই
অতএব—

অসুস্থ শরীর নিয়েই দেশে ছুটল বিভূতি। সেখানে গিয়ে কাকার মাথা ফাটিয়ে ফৌজদারীর আসামী হলো। শেষে কোন রকমে যখন কোলকাতায় এসে পৌঁছল, তখন, অঞ্জলির পঁচিশ ভরি সোনার বাইশ ভরি চলে গিয়েছিল স্যাকরার দোকানে।

বিভূতির ঠাকুরদা নিজের হাতে লাঙ্গল ঠেলতো; গাঁয়ের জমিদারের ধমকে, ছেলেদুটোকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলে—বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখবার জন্যে। ছেলেরা মাইনর পাশ করতে পারেনি। অধিকন্তু, কয়েক বছর স্কুলে যাওয়ার ফলে, পৈত্রিক পেশার ওপরেও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিল। দেখে, ঠাকুরদা ঘরের ঢেঁকিদুটিকে কড়া নির্দেশ দিল, নিজের নিজের পথ দেখবার জন্যে। ফলে, ছোট ছেলে আবার বাপের সুপুত্র হয়ে চাষের কাজে লেগে গেল। কিন্তু বড়জন সত্যিই সম্পর্ক ত্যাগ করল বাড়ির সঙ্গে। প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ, কোথায় গিয়ে কী যে সে করল, আজও তা কেউ জানে না। যখন বাড়ি ফিরল, তখন দেখা গেল সে অগাধ টাকার মালিক। অতঃপর বুড়ো বয়সে বিয়ে-থা করে, বাড়িতে বসেই সে জমানো টাকার ডিম পাড়াতে আরম্ভ করল। ছোট ভাইটা ইতিমধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে হয়ে যাবার জন্যে। দাদার কৃপায় সে-ও যেন বেঁচে গেল। লক্ষ্মণ ভাইয়ের মতোই, সে দাদার বিষয় সম্পত্তির আদায়-উশুল, তদ্বির-তদারক করতে আরম্ভ করে দিল।

বাপের বুড়ো বয়সের ছেলে বিভূতি। মাতৃহীন হয়েছিল জন্মেই। বাপকেও হারাল বছর দশেক বয়সে। বাপের স্বোপার্জিত সম্পত্তির পরিমাণটা যে ঠিক কত, তা জানবার মতো বয়স তখনও তার হয় নি। যখন সাবালক হলো, তখনও জানবার প্রয়োজনবোধ করল না। কারণ, খুড়ো খুড়ী প্রভৃতি বাড়ির সকলেই তার প্রতি এমনই স্নেহপ্রবণ

ছিলেন, এমনই বিনীতভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করতেন তার, যে সে শুধু তাদেরকে অন্নদাস ভেবেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল—অন্নভাণ্ডটির সঠিক পরিচয় গ্রহণ করবার প্রয়োজনও বোধ করেনি, অবসরও পায়নি, কোলকেত্তিয়া কালচারের কালচারিস্ট হতে গিয়ে। তারপর, সেদিন চোখ-কান বুজে গোটা কয়েক কাগজে সই করে দেবার পর যখন জানতে পারল তার কিস্যু নেই, তখন যেন একেবারে ক্ষেপে গেল। কাকার মাথা ফাটাল দেশে গিয়ে। ফৌজদারীতে পড়ল। তারপর প্রস্তুত হলো দেওয়ানী মামলা করবার জন্যে।

জনৈক পাঁচ মোহরওয়ালা আইনবিদ্ ভরসা দিলেন, আইন আপনার স্বপক্ষে। উকীলের চিঠি পেলেই ডিফেন্‌ডেণ্ট বাপ বাপ বলে ছুটে আসবে কম্প্রোমাইজ করতে।

চিঠি গেল। কিন্তু, কোন সাড়া পাওয়া গেল না ও তরফ থেকে। তখন আইনবিদ্ বললেন, আদালতের শমন পেলেই চোখে সর্ষে ফুল দেখবেন বাছাধন। কেন ভয় পাচ্ছেন! আপনি তৈরি হোন।

বিভূতি তখন তার রেডিয়োগ্রাম আর রেফ্রিজারেটারটা বেচে বিরাট দেওয়ানী মামলা ফাঁদবার তোড়জোড় আরম্ভ করে দিল। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হওয়া আর হলো না। কোর্টেই দেখা হলো একজন পিতৃবন্ধুর সঙ্গে। তিনি পরামর্শ দিলেন, টাকাটা উকীল মোক্তারের পকেটে না ঢেলে বরং চেষ্টা করো—ওই টাকাটা খাটিয়েই বাপের মতো বড় হতে। দেওয়ানী আইনের কেতাবগুলো কী রকম কেঁদোমারী দেখেছো কখনও? জান, মুন্‌সেফের ওপরে আছেন জজ। তাঁর ওপরে আছেন ডিস্ট্রিক্ট জজ। তাঁর ওপরে আছে হাইকোর্ট। তার ওপরে আছে সুপ্রীম্ কোর্ট। মামলাটা যখন নিজের জীবদ্দশায় জিততে পারবে না, তখন আর ধাষ্টামো করে লাভ কি? ছেলে-পুলেও তো নেই যে, বাপের বোকামীর জের টানবে!

শুনে, সত্যিই ভড়কে গেল বিভূতি। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, আমি যে অলরেডি অনেক খরচ করে ফেলেছি!

—আরও কত টাকা ঢালতে পারবে?

—একটা দশ হাজার টাকার পলিসি করেছিলাম বিয়ের পরে। সারেণ্ডার করলে হয়তো কিছু মিলতে পারে।

—ব্যাস? ও টাকাটা ফুরিয়ে গেলে মামলার খরচ চালাবে কি করে ভেবে দেখেছো?

পিতৃবন্ধুর মুখ বিকৃতি দেখে সত্যিই আর এগোতে ভরসা করল না বিভূতি। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল সাবেক আমলের বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে। এক কালের দাক্ষিণ্যের কথা স্মরণ করে যদি কেউ কিছু ঋণ দেয় তাকে অনুগ্রহ করে।

যা মিলল তা প্রকাশযোগ্য নয়। অতঃপর আরম্ভ করল একটা চাকরি জোগাড়ের চেস্টা। এই প্রচেষ্টাটাই একদিন তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ল। তার নিকট সম্পর্কের এক আত্মীয় ছিলেন বড় দরের সরকারী চাকুরে। সুসময় বড্ড স্নেহ করতেন তাকে। সেই কথা স্মরণ করেই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল বিভূতি। কিন্তু, বাড়ি ফিরে এল চোখের জল মুছতে মুছতে। সে শুনেছিল, হাতী কাদায় পড়লে ব্যাঙাচীরাও তাকে লাথি মেরে আনন্দ পায়। কিন্তু, সে আনন্দটা যে মানুষের মনে কত নির্মম হয়ে বাজতে পারে, সেটা সে উপলব্ধি করতে পারল সেইদিন।

অঞ্জলি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, কি হয়েছে?

বিভূতি তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারল না, শুয়ে পড়ল। পরদিন বলল, জল-অচল জাতের সুযোগ নিয়ে চাকরি বাগানোটা যত সহজ, ভদ্রলোক হতে পারাটা তত সহজ নয়।

—বুঝেছি! অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবে ঠিক করলে?

বিভূতি একটু চিন্তা করল। ফ্ল্যাট ভাড়া বাকি পড়েছে। ঝি-চাকর সরে পড়েছে মাইনে না পেয়ে। হাতে নগদ সঞ্চয় আছে মাত্র

পঞ্চাশটা টাকা। সাড়ে তিনশো টাকায় কেনা জেনিথ ঘড়িটার সন্ত-বেচা নগদ মূল্য।

—আমি ভাবছি—বিভূতি মরীয়া হয়ে বলল, আমার মতো গণ্ডমূর্খের বেঁচে থাকবার কোন মানেই হয় না। আমাকে হয়তো আত্মহত্যাই করতে হবে শেষ পর্যন্ত!

—বেশ! আর আমি কি করবো?

—আমার এই দুঃসময়—বিভূতি ফুঁপিয়ে উঠল—তুমিও কি আমাকে লাথি মারতে চাও অঞ্জু? এই কি তোমার শত্রুতা করবার সময়?—

—শত্রুতা মোটেই করিনি। অঞ্জলি গম্ভীর হয়েই বলল, নিজের ব্যবস্থাটা তো বেশ ঠিক করে ফেলেছো; আমার ব্যবস্থাটা কি হবে তাই জানতে চাইছি। বলো, আমি কি করবো?

—অনেক কিছুই করতে পারো। অঞ্জলির নিষ্করুণ কণ্ঠস্বর বিভূতির মনের অবস্থাটাকে যেন আরও মর্মান্তিক করে তুলল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, ডি-ভোর্স করতে পারো। চিত্র-তারকা হতে পারো। অতসীদের লাইনও নিতে পারো! কিন্তু, যা করবার, আমি ম'লে করো···দোহাই তোমার—

অঞ্জলি কিছুক্ষণ নীরবেই তাকিয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বসল বিভূতির মাথার কাছে। আস্তে আস্তে বলল, আর আগে করলে কি করবে? সহ্য করতে পারবে না?

বিভূতি উত্তর দিল না। কোন রকমে বালিশ থেকে মাথাটা তুলে, মুখ গুঁজল অঞ্জলির কোলের মধ্যে।

অঞ্জলি ধমক দিল। কিন্তু, বিভূতি থামতে পারল না।···অমন কান্না বুঝি মায়ের কোলের শিশুরাও কাঁদতে পারে না!

অঞ্জলিও অসহায় বোধ করল। মনে পড়ল বাবার কথা। বিশেষভাবে মনে পড়ল, সহজ সমাধানের পথটা সে নিজেই নষ্ট করে দিয়ে এসেছে।

বাবা বলতেন, কেবল বামুনের ব্যাটা হলেই বামুন হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ হওয়া যায় কর্মগুণে—যেমন বিশ্বামিত্র হয়েছিলেন। অথচ, বামুনের মেয়ের সঙ্গে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়ের বিবাহ হলে দোষ কি, সে আলোচনা তাঁর সঙ্গে চলবে না। তার পূর্বেই তিনি বলবেন, তোমাকে আমি লেখাপড়া শেখবার জন্যে কলেজে পাঠিয়েছিলাম, লুকিয়ে প্রেম করবার জন্যে নয়। তোমাকে আমি স্বাধীনতা দিয়েছিলাম, স্বেচ্ছাচারিতা করবার জন্যে নয়। পিতার কর্তব্য করেছিলাম আমি, কন্যার কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পাবার জন্যে নয়। ধর্মের অনুশাসন, বংশের ঐতিহ্য, পরিবারের সুখ-শান্তি, পিতার স্নেহ-ভালবাসা, কুমারী কন্যার কুল-মর্যাদা, আজন্মের শিক্ষা-দীক্ষা—সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে, ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করবার সাহস পেয়েছিলে তুমি একটা নতুন আইনের ভরসায়। বাছা, এতই যদি ভরসা তোমার, তাহলে নতুন বাবাদের ভরসা না করে আবার পুরনো বাবার কাছে এসেছো কেন! ঘরের বাবাকে বাবা বলে ডাকবার অধিকার ছেড়েছো তুমি যে রাষ্ট্রপিতাদের ভরসায়, তাঁদের কাছে যাও না!

না, বাবার সামনে যাবার ভরসা হয় না অঞ্জলির। কিন্তু, ভয়-ভরসা সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান যার শিশুর মতো, তাকে পাঠাতে দোষ কি! সেই রাত্রেই বিভূতিকে কাশী পাঠিয়ে দিল অঞ্জলি!

বিভূতি অবশ্য যাত্রা করল দুশ্চিন্তা নিয়ে; কিন্তু ফিরল, রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে!

—কি হলো? অঞ্জলির বুকটাও ধড়াস করে উঠল। বলল, কি বললেন বাবা?

—কিছু না! নট্ এ সিঙ্গল ওয়ার্ড। জামাই হেন লোক বাড়িতে গেল, তা এক বাটি চা অফার করেও ভদ্রতা করলেন না। একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করলেন না, তুমি কেমন আছ। পরিচয় দিতে, দয়া করে কেবল বৈঠকখানায় বসিয়েছিলেন, তা-ও মুখে ছিপি এঁটে!

—তার পর? অঞ্জলি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, তুমি তাঁকে ভদ্রতা শিখিয়ে দিয়ে আসনি তো?

—কী ভাবো আমাকে? বিভূতি খেঁকিয়ে উঠল, তুমি আমাকে যা যা শিখিয়ে দিয়েছিলে, তার একটুও এদিক ওদিক করিনি। ঝেড়ে দুঃখের কাহিনী বললাম। তিনিও সব শুনলেন মুখে ছিপি এঁটে। তারপর, ভেতরে গিয়ে লিখে আনলেন একখানা চিঠি।

—চিঠি? কই সে চিঠি?

একটা খামে আঁটা চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিল বিভূতি, অঞ্জলির পায়ের কাছে। বলল, পীয়ারসন্ কোম্পানির বড়বাবুর ওপর চিঠি। ভেতরে কি আছে জানি না।

চিঠিখানা তুলে নিয়ে অঞ্জলি মাথায় ঠেকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, প্রণাম করেছিলে তাঁকে?

বিভূতি একটু থমকে গেল। কথাটা একেবারেই মনে ছিল না তার। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই আবার সামলে নিয়ে বলল, বয়ে গেছে আমার। ও রকম একটা অভদ্র রাবিশ—

তবুও, একটা চান্স নিল বিভূতি। পরদিন সকালেই গেল পীয়ারসন্ কোম্পানিতে; ফিরে এল বিকেলে লাফাতে লাফাতে। বলল, আশ্চর্য লোক তো তোমার বাবা! এদিকে তো দেখে মনে হয়, কোন কম্মের নয় বলেই বামনাই আঁকড়ে রয়েছে। অথচ, স্রেফ একটা চিঠি লিখেই চাকরি করে দিতে পারেন! বড়বাবু, শুনলুম, ওঁর কাছে এক সময় কাব্য না ব্যাকরণ কী যেন একটা পড়েছিলেন। দেখা-সাক্ষাৎ নেই বহুকাল! অথচ, চিঠিখানা পড়েই গদগদ হয়ে গেলেন। কাছে বসালেন আদর করে। অনেক গল্প করলেন। বললেন, আমাদের কোম্পানি তো খুব বড় নয়। আপাততঃ শ'-দুয়েক টাকার একটা চাকরি তুমি করো। তারপর, সুযোগ পেলেই একটা ভাল পোস্ট-এ বসিয়ে দোব। আর, এক্ষুনি ওই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দাও। তোমরা দুজন মাত্র প্রাণী। দুঃখের সময়, একখানা ঘরেই

তো তোমাদের কুলিয়ে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, সস্তার ফ্ল্যাট্‌ও একটা জোগাড় করে দিচ্ছি তোমায়। ভগবানদাস ভকৎ আমাদের একজন বড় খদ্দের। হালে, খান-তিনেক বাড়ি কিনেছেন। আমি অনুরোধ করলে, না করতে পারবেন না ভদ্রলোক।

—কিন্তু—শ্বশুরের দাপটের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না বিভূতি। অভিভূতের মতো বলে, কী আশ্চর্য লোক! শিষ্য-সেবকরা এত খাতির করে, অথচ, উনি হবিষ্যি খেয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। উনি তো ইচ্ছে করলেই—মুখের একটা কথা খসালেই, অনেক টাকা রোজগার করতে পারেন—

—না পারেন না। অঞ্জলি বাধা দিয়ে বলল, ও সব কথা থাক, তুমি বুঝবে না।

—সত্যিই বুঝতে পারছি না। চাকরি পেয়ে বিভূতির শ্বশুর-ভক্তিটা ভয়ানক বেড়ে গিয়েছিল। বলল, সত্যি বলনা গো, ব্যাপারখানা কি?

—কি মুস্কিল! অঞ্জলি বিরক্ত হয়ে বলল, বলছি না, ও সব তুমি বুঝতে পারবে না।

আর দরকারও ছিল না বিভূতির। শ্বশুর-শিষ্যের কৃপায় মাস দুয়েক বেশ আনন্দেই কাটিয়ে দিল সে। তারপরই—বাঁধা মাইনের বাঁধা চাকরি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে কার্যান্তরে মনোনিবেশ করল। ছোট কোম্পানি, পুজোর সময় কোন বোনাস দিতে পারে না কর্মচারীদের; কিন্তু, কর্মকর্তাদের উড়ে বেড়াবার রাজসিক খরচ তো ঠিক জুগিয়ে চলছে। এ কি অবিচার! এ অত্যাচারের প্রতিবিধান কি?

প্রতিবিধানের পন্থা বাতলে দিলেন, আগামীকালের একজন হবু-মন্ত্রী। নেতাও ঠিক করে দিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত—

দল বেঁধে প্রতিবিধান করতে গিয়েই বিভূতির আজ এই পরিণাম।

পরিণতি দেখে সকলেই বিরূপ হয়েছে বিভূতির ওপর—এমন কি স্ত্রী পর্যন্ত। দিব্যেন্দুর বিতৃষ্ণাও কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু, তবুও কেমন যেন খুঁতখুঁত করে মনটা। কেমন যেন সহানুভূতি জাগে—তারই মতো একটা মানুষের এই অবস্থা দেখে।

দিব্যেন্দুর দুর্ভাগ্য! চলতি সমাজের প্রচলিত প্রথার পরিপন্থী বিশ্বাসকে মূল্য দিতে যাওয়ার পরিণাম যে কত মর্মান্তিক হতে পারে সে জানাটা জানতে পারল সে সেইদিনই হাসপাতালে গিয়ে। দু'জন ভিজিটিং ডাক্তার রোগীর সামনে দাঁড়িয়েই আলোচনা করছিলেন, তাকে মুক্তি দেওয়ার সঙ্গত কারণ নিয়ে। জুনিয়ার ডাক্তারটি সসঙ্কোচে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর সিনিয়ারকে—একটা কথা।

প্রবীণ ডাক্তার তৎক্ষণাৎ ঝেড়ে ফেলে দিলেন জুনিয়ারের যুক্তি। বিরক্ত হয়ে বললেন, ও সব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই! ও যে জন্যে হাসপাতালে এসেছিল তা সেরে গেছে। এ্যাণ্ড হিয়ার এণ্ড্‌স্ দি ম্যাটার। সুতরাং ওকে এখন বেড্ খালি করে দিতেই হবে।

কথাটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তর্গত একটা গুরুগম্ভীর টেক্‌নিক্যাল টার্ম; গোলা লোকের পক্ষে বোঝবার কথা নয়। কিন্তু, দিব্যেন্দুর দুর্ভাগ্য, কথাটা সে যে শুধু বুঝতেই পারল তা নয়, পরিণাম ভেবে শিউরে উঠল—যদি পরিণতির স্বাভাবিক গতিরোধ যথাশীঘ্র সম্ভব করা না যায়।

বিভূতি কিন্তু উচ্ছাসিত হয়ে উঠল। ডাক্তররা চলে যেতেই বলে উঠল, যাক বাবা বাঁচা গেল। কাল পরশুর মধ্যেই বাড়ি যাচ্ছি। তারপর, আপনার খবর কি বলুন? কাল যে বড় এলেন না?

দিব্যেন্দু শুকনো মুখে তাকিয়েছিল বিভূতির ফ্রুট সেফ্‌টার দিকে। অন্যমনস্ক হয়েই জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ এত কমলালেবু এল কোত্থেকে?

—আর বলেন কেন ? বিভূতি একগাল হেসে বলল, গিন্নীর কাণ্ড ! কোত্থেকে পয়সা-কড়ি কিছু বোধহয় পেয়েছে। তাই, এক গাদা খরচ করে বসল !

—মিসেস্ হালদার এসেছিলেন নাকি ? কখন ?

—সকালে। সিস্টারের হাতে ওগুলো দিয়েই চলে গেছে।

—দেখা করেননি আপনার সঙ্গে ?

—না, রাগ এখনও পড়েনি। বাড়ি গিয়ে পায়ে না ধরলে—

—রাগ কিসের ?

—সেকি মশাই ? বিভূতি আশ্চর্য হয়ে বলল, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ! কাণ্ডটা যে আপনাকে নিয়েই হয়েছিল।

—আমাকে নিয়ে ? সেকি ?

—নয় ? আপনার সামনে অতবড় একটা অপমানের কথা বলে ফেললাম সেদিন···সেই যে ট্রেটর বলেছিলাম, মনে নেই ?

দিব্যেন্দুর মনে পড়ল সেদিনকার ঘটনাটা—বিশেষতঃ বিভূতির শেষ কথাটা—এ্যাণ্ড টু ইওর হাজব্যাণ্ড ?

কিন্তু, ওইটুকুই কি সব ? অঞ্জলির মতো একজন স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণীর জীবনে যে বিষক্রিয়া আজ শুরু হয়েছে, তার উপাদান কি কেবল—

বিভূতির বেয়াড়া কথাবার্তা ? অসবর্ণ বিবাহের পরিণাম ? সংস্কারের বালাই ? দারিদ্র্যের জ্বালা ? না,—প্রকাশযোগ্য নয় এমন কোন কিছুর অভাব ?

কিন্তু, এই অভাবটা দানা বেঁধেছে কবে থেকে ? প্রশ্ন করলে, বিভূতি সম্ভবতঃ ঝেড়ে অস্বীকার করবে সব কিছু। কিন্তু···

হাসপাতাল থেকে বেরিয়েও এগোতে পারে না দিব্যেন্দু। তার পক্ষে করবার কিছুই নেই বুঝতে পেরেও শেষ পর্যন্ত জানার নেশাটাকে দমন করতে পারে না সে। ফিরে গিয়ে, খুঁজে বার করল সেই জুনিয়ার ডাক্তারটিকে। একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, বিভূতি-

বাবুর যে ফ্রাইব্রোসিস্ ডেভেলাপ করেছে, সেটা নিশ্চয়ই আপনি ক্যাথিডার দিতে গিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু—ডাক্তার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি ?

—না, আপনার সমধর্মী নই, তবে ইন্‌টারেস্‌টেড্। দিব্যেন্দু বিনীতভাবে বলল, কিন্তু, আপনি ধরতে পেরেছিলেন কবে ? হাসপাতালে আসবার প্রথম দিকে না শেষের দিকে ?

—প্রথম দিনেই সন্দেহ হয়েছিল। ডাক্তার বললেন, পেসেণ্টকে জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল, মাস কয়েক আগেও নাকি আর একবার প্রহার খেয়েছিল এবং সেই সময়েই ভীষণ লেগেছিল তলপেটে। নিশ্চয়ই ভাল রকমই ব্লিডিং হয়েছিল।

—হুঁ ! দিব্যেন্দু একটু ভাবল। তারপর বলল, কিন্তু, ব্লড্‌টা ডিসলভ্ করেছে কী ? আপনার কি মনে হয় ?

—আপনার কি মনে হয় ?

—হার্ড ব্লড্। যদি এখনও ডিসলভ্‌ড্ না হয়ে থাকে, তাহলে,— দিব্যেন্দু চিন্তিতমুখে বলল, আশা যে একেবারে নেই, তা বলা যায় না ! এখনকার সার্জারী রীতিমত নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া হরমোন তো আছেই। আমার তো মনে হয়,—

—আমারও তাই মনে হয়। একজন স্পেসালিস্টকে কন্‌সাণ্ট করুন না !

—তাই কর্তব্য ! আপনি কাকে প্রেফার করেন ?

—ডাক্তার বিমল রায়।

—আচ্ছা ! দিব্যেন্দু প্রস্থানোদ্যত হয়ে বলল, দেখি, কতদূর কী করা যায়। নমস্কার !

কিন্তু, খরচের কি হবে ? বিভূতিকে যদি কিছুদিন নার্সিং হোমে রাখতে হয় অপারেশানের জন্যে, তাহলে, খরচ পড়বে অন্ততঃপক্ষে হাজার তিনেক। কিন্তু, অবস্থা যাদের অন্ন ভোক্ষ, তারা কোথায়

পাবে অত টাকা! দিব্যেন্দু নিজে অবশ্য দিতে পারে। কিন্তু কেন দেবে? তার এত মাথাব্যথা কিসের? অঞ্জলিকে সুখী করবার জন্যে? সে সুখী হলেই কি দিব্যেন্দু সুখী হবে? হঠাৎ মনে পড়ল, ফ্রুট সেফে দেখা কমলালেবুগুলোর কথা! মনে পড়ল, আরও অনেক ঘটনা, আরও অনেক কথা! আর তাই ভাবতে ভাবতে, বিশ মিনিটের পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে, দিব্যেন্দু পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছল।

ভগবানবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা দিব্যেন্দুর কাছে নতুন নয়। কিন্তু, পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পাওয়া এই প্রথম। এ বাড়িটাতে আসলে যে কে থাকে এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া কেন আর কাউকে তিনি সেখানে ডাকেন না, তার কারণটাও দিব্যেন্দুর অজানা ছিল না। তাই, নিজেকে ব্যতিক্রমের পর্যায়ভুক্ত মনে করে সে স্বস্তি পাচ্ছিল না একেবারেই। বুঝতে পারছিল না মতলবখানা কি হতে পারে! ভাবতেও পারছিল না ভাল করে; অঞ্জলির বরাতের কথা ভেবে—

—এসো! সাহেবী কায়দায় সাজানো বিরাট ড্রইংরুমে একলা আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন ভগবানবাবু; দিব্যেন্দুকে আদর করে পাশে বসালেন। বললেন, স্রেফ রিসার্চ করে যাও ভায়া, আর কোন দিকে তাকিও না। খুব দরকার না পড়লে, অফিস-টফিসে গিয়ে সময় নষ্ট করো না! কিন্তু, ওদিকটা কি হবে? রয়্যালটির টাকাগুলো কি করবে?

দিব্যেন্দু বিনীতভাবে বলল, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। কিন্তু, আপনার কাছে আমার আর একটা নিবেদন ছিল।

—নিবেদন? ভগবানবাবু চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, আবেদন-নিবেদন, ও সব যে বৈষ্ণবী বিনয় হে! বিনয়ের বদলে, তুমিও শেষে বাঁশ দিতে চাও নাকি আমাকে!

—আঃ আবার ওই সব আরম্ভ করলেন। শুনুন, একটি বিবাহিতা মহিলা—আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন—বড্ড বিপদে পড়েছেন অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে। তাঁর একটা ব্যবস্থা করে দিন আপনি!

ভগবানবাবু এবার সত্যিই বিস্মিত হলেন। বললেন, তোমার তো তিনকুলে কেউ আই-এ পাশ করে নি; কার কথা বলছো বলতো?

দিব্যেন্দু এইবার একটু মুস্কিলে পড়ল। মাথার মধ্যে অঞ্জলি ঘুরছিল, তাই কোন কিছু না ভেবেই বলে ফেলেছিল কথাটা। এইবার মনে পড়ল, অঞ্জলিরা কেমন করে, কার খাতির জমায় সস্তার ফ্ল্যাট আদায় করেছিল ভগবানবাবুর কাছ থেকে। সুতরাং, পরিচয় দিতে গেলে বিভূতির কথা উঠবেই এবং যে স্ট্রাইকবাজ ছোকরার জন্যে অতদিনকার পীয়ারসন কোম্পানি উঠে গেছে, তাকে যে তিনি আমল দেবেন না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্রও নেই। তাহলে—

—কি হে, চুপ করে রইলে কেন? ব্যাপার গোলমেলে নাকি?

দিব্যেন্দু মনস্থির করল। কথাটা যখন তুলেই ফেলেছে, তখন কোন কথাই আর গোপন করল না। শুনে, ভগবানবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি দিব্যেন্দুর দিকে। তারপর বললেন, তুমিও শেষে মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়লে? তাও আবার পরস্ত্রী? আমাকে দেখেও তোমার আক্কেল হলো না? তুমি ঠাকুরবাবার ছেলে?

গালাগালির মোড়টা এবার কোনদিকে ফিরবে বুঝতে পেরে; দিব্যেন্দুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু, সংযম হারাল না। বলল, আপনি ভুল বুঝছেন। আমাকে এবং তাঁকেও—

—বটে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দিব্যেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, আপনিই বুঝে দেখুন, এর মধ্যে কোন অন্যায় থাকলে, নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে তা

প্রকাশ করতাম না। তাঁকে প্রতি মাসে তুশো তিনশো টাকা দেবার মতো সঙ্গতি আমার আছে। আপনাকে না বললে, আপনি কোনদিন তা জানতেও পারতেন না। কিন্তু, তা না করে, আমি আপনাকেই অনুরোধ করছি, ভদ্রমহিলাকে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার একটা সুযোগ দিন আপনি।

—ক্ষেপে গেলে নাকি হে! কোম্পানিতে বাঙ্গালী ঢোকাব আমি?

—কিন্তু, আপনিই তো চার-পাঁচজন বাঙ্গালীর বিধবাকে উইডো পেন্‌শন্ দেন!

—তাঁরা ছিলেন আমার বাবার বিশ্বস্ত কর্মচারী।

—এঁকে না জেনেই বা আপনি অবিশ্বাসী ভাবছেন কেন?

—বটে? বলেই, ভগবানবাবু হঠাৎ থেমে গিয়ে তাকালেন অন্দরের দরজাটার দিকে। কপাটের আড়ালে যিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর জর্জেটের আঁচলটাও দেখতে পেল দিব্যেন্দু।

—আসছি। বলে, ভগবানবাবু ভেতরে চলে গেলেন; ফিরলেন প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে। হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ হে দিব্যেন্দু, তোমার পৈতেটা এখনও আছে নাকি?

—আছে বৈকি! দিব্যেন্দু ভড়কে গেল!

—সেরেছে! সন্ধ্যাহ্নিক-টাহ্নিকগুলো এখনও করো নাকি?

—মাঝে মাঝে বাদ পড়ে যায়।

—কী আপদ! ভগবানবাবু আরও হেঁকে বললেন, বলি, বিলেতে কাটিয়ে এসেছো তো পুরো তুটি বচ্ছর—অখাদ্য-কুখাদ্য খাও নি?

—তা খেয়েছি বৈকি!

—তবে? একটা হুঙ্কার ছেড়ে ভগবানবাবু একবার অন্দরের দরজার দিকে তাকালেন; তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন আবার।

কিছু বুঝতে না পেরে দিব্যেন্দু ভগবানবাবুর দিকে চেয়ে রইল। তিনি বললেন, ফাউলটা উনি নিজে রেঁধে ফেলেছেন।

—কি হয়েছে তাতে ?

—সেই কথাই তো বলছি ! ভগবানবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ছুনিয়ার দাসীরা সব দেবী হয়ে গেল, আর উনি এখনও সংস্কার ছাড়তে পারলেন না। বলে, বামুনের ছেলের জাত মারবো !

দিব্যেন্দুর চোখ-মুখ আবার লাল হয়ে উঠল। ভগবানবাবুর সব ভাল। কিন্তু, স্পষ্ট ভাষণের আতিশয্যে অপরকে বিপদে ফেলেন মাঝে মাঝে !

ভগবানবাবুকে নিরামিষ খেঁতে হয় বাড়িতে। তাই, আমিষের অভাবটা পুষিয়ে নেন পার্ক স্ট্রীটে এসে। খেতে বসে দিব্যেন্দু লক্ষ্য করল, তিনি কেবল ভোজনবিলাসীই নন, ভোজ্যবস্তুর অভিনবত্ব এবং পাক-প্রণালী সম্বন্ধেও অসাধারণ জ্ঞান রাখেন। বস্তুতঃ মসলা বন্টনের বৈশিষ্ট্যে খাসী মুরগী বা খরগোশের মাংস যে এমন উপাদেয় হয়ে উঠতে পারে, আগে সে তা জানত না !

অতিথির আপ্যায়নে কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। তবুও, একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারল না দিব্যেন্দু। এ হেন অনুষ্ঠানের যিনি আসল কর্ত্রী, তিনি আড়ালেই রয়ে গেলেন। অতি-আধুনিক ভোজ্যবস্তুর রসাস্বাদন করতে করতে এই অতিরক্ষণশীল ব্যবস্থাটার তাৎপর্য বুঝতে পারল না দিব্যেন্দু। হয়তো তিনি অত্যন্ত রূপবতী—অসাধারণ গুণবতীও হতে পারেন ; কিন্তু, আসলে তো একটা ইয়ে !

—ওহে দিব্যেন্দু ! রহস্যালাপের ফাঁকে ফাঁকে ভগবানবাবু কাজের কথাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, আর. সি. কেমিক্যাল্‌স্‌টাকে পাবলিক লিমিটেড করে, বাজারে শেয়ার ফ্লোট করলাম—তোমার ওষুধ নিয়েই কোম্পানির সৃষ্টি,—আর তুমি তার ডিরেক্টার হবে না, তা তো হতে পারে না ! তোমার জমানো টাকাগুলো ওইতেই ইন্‌ভেস্ট করো না !

এ প্রস্তাব নতুন নয়। দিব্যেন্দু মনে মনে হেসে বলল, দেখি একটু চিন্তা করে। হাতে ক্যাশ তো তেমন কিছু নেই, সবই শেয়ারে ইন্‌ভেস্ট করা রয়েছে। একটু খোঁজ-খবর করতে হবে তো বেচবার আগে—

যুক্তিটা পুরোন হলেও, অকাট্য। ভগবানবাবু তাই আপাততঃ ও প্রসঙ্গ বন্ধ রেখে আর একটা নতুন প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, ওহে তোমার ল্যাবরেটারীকে একটা জন্ম-শাসনের ফরমুলা দাও না! গান্ধী-ভক্তরা যে রকম উঠে পড়ে লেগেছেন, তাতে সুযোগ নষ্ট করাটা উচিত হবে না। এখন তুমি কি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো?

দিব্যেন্দু বলল, জেনসিয়ান্‌, রশুন, কাঠ-কয়লা, চিরতা, ত্রিফলা—এই সব নিয়ে একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করছি।

—কি হবে ওতে?

—এ্যাসিডিটির ওষুধ হবে।

—আরে দূর! টাইকো-সোডাতে বাজার ছেয়ে গেল, তুমি এখন …ও সব এখন শিকেয় তুলে রাখ। আমাকে চট করে একটা জন্ম-শাসন করে দাও! বুঝতে পারছো না? এদের এই অহিংসার ঠ্যালায় শীগ্‌গীরই হয়তো এমন দিন আসবে, যখন শ্লোগান উঠবে বংশবৃদ্ধি করো। এমন মওকা ছাড়াটা কি তোমার উচিত হবে?

—আমার তো মনে হয়—দিব্যেন্দু বিরক্তি চেপে বলল, ও সব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত কাজ হবে না।

—কেন? ভগবানবাবুর প্রকৃতিতে প্রতিবাদ সহ্য করা সয় না। কিন্তু, লোকটা অপর কেউ নয়,—দিব্যেন্দু। তাই, উত্তেজনা দমন করে বললেন, কাজটাকে অনুচিত ভাবছ কেন?

—প্রথমতঃ ধরুন, ওষুধের ফলাফলটা হবে লটারী খেলার মতো। ফেলিওরটা আপনার অন্য প্রোডাক্‌শানগুলোরও ক্ষতি করবে। তাতে কোম্পানির বদনাম হবে, লোকসান হবে।

—তুমি একটি হস্তীমুর্খ। ভগবানবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, এ সব

ওষুধ লোকে গোপনে খায়, গোপনেই চোখের জল ফেলে। তুমি কেমিস্ট, বিজ্‌নেস্ নিয়ে অনধিকার চর্চা করছো কেন? আমি তো তোমার কাছে ভাল জিনিস চাইনি, ভাল বিক্রীর কথা বলছি।

—বুঝলাম। কিন্তু, মানবতার দিক থেকেও, কাজটাকে আমি অনুচিত মনে করি। ওষুধ খেয়ে জন্ম শাসন করতে গিয়ে মেয়েদের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হবে, সে ক্ষতির খেসারত তো কেউ দিতে পারবে না। না আপনার গবর্নমেণ্ট না চিকিৎসা-বিজ্ঞান! আপনি জানেন না, মেয়েদের রি-প্রোডাক্‌টিভ অরগানগুলো কী ভীষণ সৌখীন—আই মীন্—ঠুনকো। একটু কিছু অস্বাভাবিক রাস্তা ধরলেই বিরক্ত হয়—বিগড়ে যায়—

—তুমি আমাকে কি সব বোঝাচ্ছো হে? ভগবানবাবু সশ্লেষে বললেন, যারা তেঁতুল বীচি থেকে সোপ্‌স্টোন্ পর্যন্ত হজম করে ফেলছে, আজ হঠাৎ তাদের যন্তরপাতিগুলো সব সৌখীন হয়ে গেল! হাইকোর্ট দেখাবার আর লোক পেলে না তুমি? ও সব বাজে ওজর ছাড়ো। আমি প্রমাণ পেয়েছি, লোকে অ্যাপারেটাস্-এর চাইতে ওষুধ প্রেফার করে বেশী।

—কি বলছেন আপনি? প্রমাণ পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, প্রমাণ পেয়েছি! আমি তোমার কোলকেত্তিয়া শিক্ষিত লোকদের ধার ধারি না। আমার লক্ষ্মী হচ্ছে পাড়াগাঁয়ের কোটি কোটি অশিক্ষিত লোক! বুঝলে? বাজে কথা রেখে, চট্ করে কাজটা করে ফেল।

ব্যাপার দেখে, আপাততঃ ভগবানবাবুকে চটাতে ভরসা করল না দিব্যেন্দু। তার কার্যোদ্ধারটা এখনও হয়নি। তাই বলল, দেখি, একটু পড়া-শোনা করতে হবে—

—হ্যাঁ, যা করবার তাড়াতাড়ি করো। ভগবানবাবু বললেন, ভুলে যেও না, পাকিস্তানী শাকের আঁটির ওপর আবার চৈনিক বোঝা চেপেছে! ইস্—বিরিয়ানীটা বড্ড ঠিচ হয়ে গেছে দেখছি—

—হ্যাঁ, রাত্তিরে টাইকো সোডার দরকার হবে

বাড়ি ফেরবার সময় হঠাৎ যেন মনে পড়ল এমনি ভঙ্গী করে দিব্যেন্দু বলল, আমি তাহলে, মেয়েটিকে কি বলবো ?

—আবার সেই মেয়েমানুষের কথা ? ভগবানবাবু যেন ক্ষেপে গিয়ে বললেন, তুমি তো আচ্ছা নির্লজ্জ হে ?

—এর মধ্যে লজ্জা পাবার মতো কি দেখলেন আপনি ? দিব্যেন্দুও বেশ গরম হয়ে বলল।

কাজ হলো। ভগবানবাবু দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা টিক্‌টিকির গতিবিধি লক্ষ্য করলেন মিনিট খানেক। তারপর সেই-দিকে তাকিয়েই বললেন, মেয়েটার রূপযৌবন-টৌবন কিছু আছে না ইউনিভার্সিটিকে দিয়ে দিয়েছে ?

—আছে।

—কি করে জানলে ?

—বাঃ, আমার চোখ নেই ?

—ঠিক করে বলো বাপু ! তোমার চোখের কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি না ; আমার স্বার্থের কথাটা ভেবে বলো !

দিব্যেন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, একটা ইন্‌টারভিউ নিয়ে নিলেই তো সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।

—তোমার প্রেস্‌টিজ যাবে না তাতে ?

—না।

—হুম্‌ ! মাসে শ' দুয়েক হলে চলবে ?

—চলবে।

—তাহলে নিয়ে এস তাকে কাল সকালে। কাজটা হবে কিন্তু রিসেপশনিস্টের ! খদ্দেররা বাড়াবাড়ি করলে, গায়ে আবার ফোস্কা পড়বে না তো ?

—নোকরী ইজ নোকরী। ও সব দেখলে চলবে কেন ?
—আচ্ছা, তাহলে নিয়ে এস তাকে কাল সকাল দশটায়।

সেই রাত্রেই—

দিব্যেন্দুর পায়ের ওপর মুখ লুকিয়ে বড় কান্নাই কাঁদল অঞ্জলি ! নিশ্চিন্ত হওয়ার সেই নীরব কান্না, দিব্যেন্দুকে যেন ভেঙ্গে গড়ল। পরের ঘরণীকে ভালবাসা অপরাধ। কিন্তু—

কিন্তু, পরিণাম চিন্তা করবার অবসর মিলল না ; অকস্মাৎ সারা বাড়িটা কেঁপে উঠল অসংখ্য কণ্ঠের অসহ্য আর্তনাদে।

পুলিশী জুলুমের কথা দিব্যেন্দু খবরের কাগজে পড়েছিল। কিন্তু, কালির আঁচড়ের সঙ্গে বাস্তবিক ব্যাপারের পার্থক্যটা যে কতখানি হতে পারে, সেটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল সেইদিন।

নীচুতলার কোন খবরই ওপরওয়ালাদের রাখা উচিত নয়। রাখলেও গোপনে রাখতে হয়—স্বীকৃতি দেওয়ার অসুবিধা অনেক। কিন্তু, ঘটনা বিপর্যয়ে, এই অতি প্রচলিত, অতি কল্যাণকর সামাজিক ব্যবস্থাটার কথা বিস্মৃত হলো দিব্যেন্দু। বুঝল না, দেশটা এখন শুধু স্বাধীনই নয়, নিরঙ্কুশ গণতন্ত্রী! এবং, পতিতা নামক একান্ত অসহায় জীবগুলির ওপর একতরফা অত্যাচার করবার তথাকথিত অধিকারও পুলিশকে দিয়েছে এই স্বাধীন দেশের স্বাধীন গণদেবতাদেরই মনোনীত নেতারা—কেতাবে লেখা সমাজ-তন্ত্রবাদকে রাতারাতি সার্থক করে তোলবার উদ্দেশ্যে—রাশিয়া চায়নার মতো চট্ করে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করবার সদিচ্ছায়! দিব্যেন্দু ভুলে গেল, ওই মেয়েগুলোকে ঘৃণ্য হিসাবে ঘৃণা করার বিনিময়ে বজায় থাকে ভদ্রলোকের মর্যাদা—সমাজতন্ত্রের আদর্শ,—স্বাধীন দেশের সভ্যতা। কিন্তু, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি জানানোর ফলে মেলে কলঙ্ক !

কলঙ্কিনী ওরা নিঃসন্দেহ। কারণ, এই পরিচয়টাকেই গ্রহণ

করেছে ওরা স্বেচ্ছায়, অকলঙ্কী অন্যান্য সামাজিকদের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, বর্তমানে, কল্যাণ রাষ্ট্রের নিষ্কলঙ্ক সমাজ-সৃষ্টির প্রয়াসে, বিপদে পড়েছে,—আচমকা কোন নতুন পরিচয় আবিষ্কার করতে না পেরে। আপাততঃ এই অক্ষমতার জন্যই উদ্বাস্তু হয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। গত পয়লা মে তারিখের আইন ওদেরকে আশ্রয়চ্যুত, ব্যবসাচ্যুত করেছে, ভবিষ্যতে আশ্রম তৈরি করে চাট্নি তৈরী করবার আশা দিয়ে। কিন্তু, ওরা অস্থির হয়ে পড়েছে বর্তমানকে নিয়ে। আশ্রয়চ্যুত অসহায় জীবগুলো তাই মাঝে মাঝে এসে ভিড় করে,—প্রাচীনা বাড়িওয়ালী মেনকাদাসীর দরবারে। এবং, এই সমাজের একজন ভূতপূর্বা রক্ষয়িত্রী হিসাবে মেনকাদাসীও ওদেরকে উপেক্ষা করতে পারে না—নতুন আইনের নতুন বিপদের কথা জেনেও। তাই, অন্ন দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে শরণাগতদের।

চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে, আশপাশের অনেকেই এসে জুটেছিলেন। দিব্যেন্দুও নেমে এসেছিল একতলার উঠোনে এবং স্তম্ভিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিল দারোগা সাহেবের কাণ্ড-কারখানা। ভাতের থালায় লাথি মেরে কারুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছিলেন তিনি; কারুর বা হাঁড়ি-কুড়ি, বাক্স-প্যাঁটরা, লেপ-তোষক লণ্ডভণ্ড করে অনুসন্ধান করছিলেন মদের বোতল।

অকস্মাৎ স্খলিত কণ্ঠের একটা 'বাবা গো' শুনে শিউরে উঠল দিব্যেন্দু। সে আরও এগিয়ে যেতে গেল; কিন্তু, পিছন থেকে কাছা ধরে টানল অঞ্জলি। ফিস্‌ফিস করে বলল, কি করছেন এখানে? চলুন ওপরে। এ সব নোংরামীর মধ্যে থাকতে হবে না।

—কি রকম লোক মশাই আপনি? অনাদি মুকুজ্জের চিৎকার শোনা গেল, সার্চ করতে এসেছেন সার্চ করুন। বুড়ো মানুষকে খুন করতে চান নাকি?

—শাট্ আপ! দারোগার গর্জন শোনা গেল, হারামজাদা

আবার কথা কইতে এসেছে মুখ নেড়ে। এই ভীখন্, উধার কেয়া দেখতা? ইধার আও জলদি—উঠাও ইসকো—

অন্ধ মেনকাদাসী মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল রোয়াকের ওপর। একটা লাল পাগড়ী সেইদিকে এগোবার উপক্রম করতেই, হঠাৎ একটা দশাসই শিখ দিব্যেন্দুকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেল। তারপর একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মেরে শুইয়ে ফেলল লাল পাগড়ীটাকে।

পুলিশকে প্রহার! দুটো ভোজপুরী এসে শিখটাকে ধরবার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে তারাও ধরাশায়ী হলো আরও দু'জন শিখের হস্তক্ষেপে। খোদ্ দারোগা সাহেবকেও চিৎপাত করে ফেলল কর্তার সিং—মেনকাদাসীকে যে গঙ্গা স্নান করাতে নিয়ে যায় নিয়মিত ভাবে।

হৈ-হুল্লোড়ের তীক্ষ্ণতাটা এমনই বেড়ে গেল যে দর্শকজনের প্রায় ষোল আনা অংশই পালাল। দিব্যেন্দুও ওপরে যেতে বাধ্য হলো অঞ্জলির জবরদস্তিতে। শুনল, ফাঁড়ি থেকে আরও পুলিশ এসে, তবে অবস্থা আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। শিখগুলোকে হাত-কড়ি দিয়ে তোলা হয়েছিল পুলিশ ভ্যানে। মেনকাদাসীকে ফার্স্ট এড্ দেওয়া হয়েছিল। আর, বাড়িতে যে কজন অতিথি ছিল, অনাদি মুকুজ্জের সঙ্গে তাদেরকেও ধরে নিয়ে গিয়েছে ফাঁড়িতে।

এও সম্ভব! দিব্যেন্দু সমস্ত রাত পায়চারী করে কাটাল। বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু, তার মাথার মধ্যে যেন শত শত কামারের হাতুড়ী পড়ছিল—এও সম্ভব!

ভোরের হাওয়া গায়ে লাগতে উত্তেজনাটা অবসাদে পরিণত হলো। মাথাটা একটু ঝিম্‌ঝিম্ করতেই দিব্যেন্দু গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল। উঠল বেলা দশটার পর। এবং তারপর নীচুতলার দিকে তাকিয়ে একেবারে যেন তাজ্জব বনে গেল। গত রাত্রের আসামীরা

সকলেই বাড়ি ফিরে এসেছে—এমন কি, সেই অতিথি মেয়েগুলো পর্যন্ত! এ আবার কী কাণ্ড!

কিন্তু, পরচর্চা করবার সময় ছিল না দিব্যেন্দুর, অঞ্জলিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল ভগবানবাবুর গদীর উদ্দেশে।

ভগবানবাবু বেশী কথা কইলেন না। এমন কি, গতরাত্রের হুজ্জুতি সম্বন্ধেও একটি কথা বললেন না তিনি; গম্ভীরভাবে অঞ্জলিকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর লিণ্ডসে স্ট্রীটের শো-রুমে, রিসেপ্‌শনিস্টের কাজ বুঝে নেবার জন্যে। দিব্যেন্দু বাড়ি ফিরে এল একা—রীতিমত কৌতূহল নিয়ে।

গতরাত্রের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে ভগবানবাবু তাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না কেন? রহস্যটা কি? বাড়ির মালিক তো তিনিই? তবে?

রহস্যটা আরও ঘনীভূত হয় পরদিন। ব্যাপার দেখে দিব্যেন্দুর সন্দেহ হয়, বাড়িওয়ালার পলিশির পরিবর্তন ঘটেছে। নীচুতলায় অবশ্য আর কোন গোলমাল ছিল না; কিন্তু ওপরতলার পরিবর্তনটা প্রকট হয়ে ওঠে। দশ নম্বর ফ্ল্যাটের কর্তার সিং উঠে গেল সকাল বেলায়—বিকেল বেলাতেই সেই ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে এল, বাঙ্গালী।

সাড়ে ছ' ফুট লম্বা রাশভারি মানুষটির স্বাস্থ্য দেখে বয়স নির্ণয় করা যায় না; কিন্তু রূপ দেখে বিস্ময় জাগে। সে রূপ পুরুষের রূপ। মুগ্ধও করে আবার সন্ত্রাসও জাগায়। ভদ্রলোকের সামান্য একটু পরিচয়ও পাওয়া গেল বৈজুর কাছ থেকে। ঋষি রায় নাকি ভগবানবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং একদা জমীদার বাচ্ছা ছিলেন।

—বাঙ্গালী জমীদার বাচ্ছা, ভগবান ভকতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু! ব্যবসায়ীর সঙ্গে জমীদারের বন্ধুত্ব! হলো কী করে?

—বয়সের দোষে! শুনেছি, প্রথম আলাপ হয়েছিল নাকি ও পাড়ায়।

—বুঝেছি! তা, জমীদার বাচ্ছার নিজের বাড়ি ঘর-দোর নেই এখানে?

—আছে তো। শর্ট স্ট্রীটে পেল্লায় বাড়ি আছে একখানা। সাহেব ভাড়াটে আছে। শ' সাতেক টাকা ভাড়াও ওঠে মাসে। কিন্তু, হলে কি হবে! বাড়িখানা খাস্ না এস্টেটের, তাই নিয়ে মামলা চলছে। কাঁসারীপাড়াতেও একখানা ছোট দোতলা বাড়ি আছে। সে বাড়ির ভাড়াটে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে ভাড়া জমা দেয় রেন্ট্ কন্ট্রোলে। এই সব দেখে-শুনেই তো মামা বিগড়ে গেল।

—বিগড়ে গেল?

—যাবে না? বৈজু বুঝিয়ে বলল, আজ না হয় ঋষি রায় বেকার হয়ে পড়েছে; কিন্তু এক সময় এক গেলাসের ইয়ার ছিল বটে তো! একটা কর্তব্য আছে তো! তাই, বন্ধুত্ব শিকেয় তুলে রেখে মামা এখন ওঁর ওপর গার্জেন-গিরি করছে। জমীদারী-প্রথা উঠিয়ে দিয়ে গবর্নমেণ্ট যে ওঁদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, তা দুনিয়ার লোক জানে; কিন্তু ওঁরা এখনও মানতে চান না। নতুন বেকার হয়েছিস, কোথায় চেষ্টা করবি দু' পয়সা রোজগারের! তা নয়, এখনও সেই আভিজাত্যের গরম, এখনও সেই নবাবী তরিবৎ। কিন্তু গবর্নমেণ্ট তো আর ওঁর খাস-তালুকের প্রজা নয় যে ঠেঙ্গিয়ে টিট্ করবেন। তাই হাইকোর্ট করছেন। ন' মাসে ছ' মাসে কবে মাম্লার শুনানী হবে, সেই অজুহাতে একটা গোটা বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিলেন, কোলকাতার মতো সহরে! আরে বাবু, টাকা যখন ছিল উড়িয়েছিস, বেশ করেছিস। কিন্তু এখন? বিশ্ গিনি তিরিশ গিনির খাঁই মেটাতে গিন্নির গয়নাগুলো আর ক'দিন! তারপর তো হাত দিবি বাড়ির ঠাকুরের গয়নায়! তাই নিয়ে আবার নতুন মামলা বাধবে সরিক্‌দের সঙ্গে। তখন কি করবি? তখন তো ছুটে আসবি বন্ধুর কাছে টাকা ধার করতে! মামা তাই ওঁকে কেয়ারফুল করছে। কেরানীদের মেসে থাকতে না পারিস এখানে থাক।

—বুঝিছি! দিব্যেন্দু বলল, দশ নম্বর ফ্ল্যাট্‌টা তাহলে বন্ধু-কৃত্য, ডিম্ পাড়বে না!

—মামা তো পাড়াতে চায় না!—বৈজু বলল, কিন্তু, ঋষিবাবু পাড়াবেই। আভিজাত্যের গরম বড় সর্বনেশে গরম রে! মামাকে ভাড়া দিতে গেলে হয়তো খুনোখুনী হয়ে যাবে। হয়তো ও লাইনে যাবেই না ঋষি রায়। কিন্তু, মামীকে যদি গয়না প্রেজেণ্ট করে লুকিয়ে? তাহলে, মামার গার্জেনগিরি কি মাল পয়দা করবে তুই বল!

—তা বটে! কিন্তু—

হঠাৎ বিরক্ত হয়ে ওঠে দিব্যেন্দু, নিজেরই ওপরে। কোথাকার কে এক ঋষি রায়—তার কুলুজী শোনবার জন্যেই কি সে এখানে পড়ে আছে! কাজকর্ম নেই তার! সময় কি তার এতই সস্তা!—বৈজুকে বলল, তোকে যে একটা ফ্ল্যাট দেখতে বলেছিলাম, তার কি হলো?

—ওই যাঃ—বৈজু সামলে নিয়ে বলল, সত্যিই তাহলে তুই পালাতে চাস এ বাড়ি ছেড়ে?

—এর মধ্যে পালানোর কথা আসছে কেন? দিব্যেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, অসুবিধে হলে বাড়ি বদলায় না মানুষ?

—অঞ্জু কোথায় গেছে, জানেন? ঘরে ঢুকল বিভূতি।

—আপনি? দিব্যেন্দু হকচকিয়ে গেল।

—বাঃ! আজই তো আমাকে ছেড়ে দেবার কথা ছিল। কিন্তু, ও কোথায় গেল?

—বসুন বসুন, স্থির হয়ে বসুন! বৈজু বিভূতিকে খাতির করে বসাল। তারপর বলল, আপনার স্ত্রী আসবেন আর একটু পরেই! জানেন না, তিনি যে চাকরি করছেন একটা। দিব্যেন্দুই জুটিয়ে দিয়েছে—

—তাই নাকি? বিভূতি অভিভূতের মতো দিব্যেন্দুর দিকে তাকাল। তারপর তার হাতদুটো মুঠো করে ধরে বলল, ও আপনি আমাকে বাঁচালেন দাদা! কি ভয় যে করছিল বাড়ি

আসতে।—ইয়ে···একটা টাকা দিতে পারেন? রিক্শাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—

দিব্যেন্দু কোন কথা না বলে একটা টাকা বার করে দিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, দিব্যেন্দুর অনুমানটা মিথ্যে নয়। সত্যিই পলিশির পরিবর্তন করেছেন ভগবানবাবু। দোতলার শিখগুলো পুলিশ-ঠ্যাঙ্গানোর অপরাধে বে-কায়দায় পড়েছিল। অবশ্য, জামিন পেয়েছিল সকলেই। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, ওরা নিতান্তই সমাজবদ্ধ জীব। সকলেই একে একে কর্তার সিংয়ের পন্থা অনুসরণ করল। আর, সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী ভাড়াটে আসতে আরম্ভ করল ওদের পরিত্যক্ত ফ্ল্যাটে। পূবদিকের পাঁচ ও ছ' নম্বর ফ্ল্যাটের ঘরের সংখ্যা আড়াইখানা করে। ভাড়াটে এলেন, যথাক্রমে, উকিল রমেশ তালুকদার সপরিবারে এবং স্কুল মিস্ট্রেস্ নীলিমা সেন মা আর ভাইকে নিয়ে। উত্তরের সাত নম্বর ফ্ল্যাটের দেড়খানা ঘরে আগে থাকতেই বাস করে আসছে অঞ্জলি। দক্ষিণের আট নম্বরের দেড়খানা ঘরে এলেন ডাঃ সুদর্শন মুখার্জী, এম. বি., ডি. টি. এম. (গোল্ড মেডালিস্ট) সস্ত্রীক। পশ্চিমের নয় ও দশ নম্বর ফ্ল্যাটের ঘরের সংখ্যা পূবদিকের মতোই আড়াইখানা করে। এলেন যথাক্রমে, ভূতপূর্ব ফিল্ম এ্যাকট্রেস মিস বিপাশা বাসু স্ব-স্বামী এবং বাবু ঋষিকেশ রায় দুজন মাত্র খিদমদগার নিয়ে। বৈজুর কাছে খবর পাওয়া গেল, আড়াইখানা ও দেড়খানা ঘরের ব-কলম সেলামী হিসাবে, দশ নম্বর ছাড়া সকলকেই পাঁচশ ও তিনশ টাকার শেয়ার কিনতে হয়েছে আর. সি. কেমিক্যালস-এর। বাদ পড়েছে কেবল, সাত নম্বর ও এগার নম্বর—আগে থাকতে আছে বলে।

কিন্তু, এই সামান্য প্রতিযোগটাই কি ভগবানবাবুর পলিশির পরিবর্তন ঘটাল! দিব্যেন্দু কৌতূহল দমন করতে পারল না।

—কি জানি ভাই, ঠিক বুঝতে পারছিনা। বৈজু বলল, বাড়িতে

বাঙ্গালী ভাড়াটে বসানোর একমাত্র পরিণাম সে রেন্ট কণ্ট্রোলের আসামী হওয়া, মামা তা হাড়ে হাড়ে জানে। তবুও যে কেন বেছে বেছে বাঙ্গালী জোগাড় করলে বুঝতে পারছি না। মামার মতলব ছিল, একতলা থেকে ওদের উচ্ছেদ করে নতুন ভাড়াটে আমদানী করবে। কিন্তু, পুলিশ লেলিয়ে দিয়েও তো সুবিধে করতে পারলে না—

—বলিস কি রে? দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, সেদিনকার ব্যাপারটা কি তাহলে—

—বাড়াবাড়িটা দেখেও বুঝতে পারিস নি? বৈজু ফিসফিস করে বলল, বুড়ো বয়সে মামার ভীমরতি ধরেছে। নাহলে, এ রকম ছেলেমানুষের মতো কাণ্ড করে। দেখিস, চীনে পটকা শেষে এ্যাটম বোমা হয়ে দেখা দেবে। অনাদি মুকুজ্জে মামলা এনেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। দেখিস, কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বে—

—চুলোয় যাক ও সব। দিব্যেন্দু কাজের কথা পাড়ল, বলল, বাড়ির খোঁজ পেলি? বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের ঠেলায় আমার বড্ড সময় নষ্ট হচ্ছে কিন্তু। বড্ড বেশী কৌতূহল এদের। ওই উকিলের বৌ-টা তো এরই মধ্যে ঠেস দিয়ে কথা কইতে শুরু করেছে, আমার সঙ্গে অঞ্জলির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে।

—স্বাভাবিক। বৈজু গম্ভীরভাবে বলল, প্রতিবেশীরা তোমার শিখ নয়, বাঙ্গালী। অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখলে, আলোচনা তারা করবেই। যাই হোক, মেয়েটার হিল্লে যখন একটা হয়ে গেছে, তখন, তোর পালানোই উচিত।

—এর মধ্যে আবার পালানোর কথা আসে কি করে?

—ওই হলো। বাড়ি আমি দেখছি। ঘাবড়াস নি তুই।

বৈজুর কাছেই শুনেছিল দিব্যেন্দু, যা গেছে তাই নিয়েই মামলা লড়ছেন ঋষিবাবু গবর্নমেন্টের সঙ্গে, কোলকাতার হাইকোর্টে এবং

সেই কারণেই বাস্ত হয়েছেন, হনুমান হাউসে একটা আস্তানা রাখতে।

কিন্তু, দূরের মানুষকে কাছ থেকে দেখতে লাগল অন্য রকম! সেদিন, সামনা-সামনি পড়তেই দিব্যেন্দু কি করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ একটা নমস্কার করে ফেলল। ঋষিবাবু প্রতি-নমস্কার করলেন না; কিন্তু কথা কইলেন। আস্তে-আস্তে বললেন, তুমিই দিব্যেন্দু! তোমার কথা শুনেছি ভগবানের কাছে। বেঁচে থাক, ভাল থাক, বাবার মতো হও···

ঋষিবাবু চলে গেলেন। কিন্তু, দিব্যেন্দু দাঁড়িয়েই রইল। দূর থেকে যাঁকে মনে হয়েছিল একটা দুর্দ্দান্ত পুরুষ; কাছে পেয়ে অন্য লোক বলে মনে হলো তাঁকে। টানা টানা চোখ দুটির মধ্যে তাঁর আগুন ছিল না। কণ্ঠস্বরেও ছিল না উগ্রতা। দৃষ্টি তাঁর গভীর; কিন্তু, কেমন যেন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। কণ্ঠস্বরও গম্ভীর; কিন্তু, কেমন যেন শ্রান্ত—ভারাক্রান্ত!

বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের সঙ্গেও আলাপ হয় তার। কিন্তু, পরিচয় পর্বটা যতই এগোতে থাকে, ততই যেন সে একটা কষ্ট অনুভব করে ঋষিবাবুর জন্যে! উনি কেন এলেন এই নরককুণ্ডে। এখানে যে ওঁকে একেবারেই মানায় না। জমিদারী উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আর সব কিছুই কি উচ্ছন্নয় যায়!

চিন্তায় বাধা পড়ে অঞ্জলির আবির্ভাবে। রোজকার মতোই, ছাদের কাজ সেরে ঘরে ঢুকল সে বই বদলাবার অজুহাতে। পড়া বইখানা আলমারীতে রেখে দিয়ে, আর একখানা বই টেনে নিল। বলল, মম্-এর রেণটা নিলাম। আরম্ভ যখন করেছি, তখন মম্-কেই শেষ করি আগে। কিন্তু, হিতে বিপরীত হবে না তো? একঘেয়ে লাগবে না তো? আপনার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয়—দিব্যেন্দু একটু হেসে বলল, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

—বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে? তার মানে?

—অফিসে বসে, অমন করে গোগ্রাসে নভেল পড়া উচিত নয় আপনার। কর্তারা টের পেলে অসন্তুষ্ট হবেন।

—ইস্! অঞ্জলি ভ্রূভঙ্গি করে বলল, অসন্তুষ্ট হবে! জানেন, আমাদের ম্যানেজার চিরঞ্জীবাবু, কত খাতির করেন আমায়? অফিস যেতে একটু দেরি হলেই, হামলে এসে জিজ্ঞাসা করেন, শরীর কেমন আছে!

—বুঝেছি!

—সত্যি! অঞ্জলি হঠাৎ যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, কি প্রবৃত্তি বলুন তো লোকটার! বয়স তো ওদিকে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে; অথচ, রোজ দুপুর বেলায় টানাটানি করবে সঙ্গে গিয়ে লাঞ্চ খাবার জন্যে।

—ভালই তো, খরচ বেঁচে যাচ্ছে আপনার!

—কিন্তু, আমি যে মরে যাচ্ছি এদিকে! কি করবো, ছেড়ে দোব চাকরি?

—এর মধ্যেই চাকরি ছাড়বার কথা মনে এসেছে আপনার?

—হ্যাঁ! আপনাকে বলিনি, কষ্ট পাবেন বলে। কিন্তু, বড্ড বাড়িয়েছে লোকটা! দোব ছেড়ে? আপনি শুধু একটা হ্যাঁ বলুন, তাহলেই—

—না। দিব্যেন্দু একটুখানি চিন্তা করল। তারপর বলল, গায়ের চামড়া অত পাতলা হলে, চাকরি করা চলে না। তার চাইতে আপনি বরং এক কাজ করুন। সন্ধ্যে বেলায়, কোন কমার্স কলেজে ঢুকে, টাইপরাইটিং আর সর্টহ্যাণ্ডটা শিখে ফেলুন। তারপর, যেখানে অনেক মেয়ে কাজ করে, এমন একটা ফার্মে চেষ্টা করা যাবে।

—অতদিন এই সব সহ্য করে থাকতে হবে আমায়?

—ঘাবড়াচ্ছেন কেন! সবে তো শুরু করেছেন চাকরি! কয়েক মাস গেলেই দেখবেন, ও সব আর গায়ে লাগবে না। কে…?

খালি পায়ে, নিঃশব্দে ওপরে উঠে এসেছিল বিভূতি ; ঘরে ঢুকে বলল, পয়সা দাও, বাজারটা সেরে আসি.........

—বাজারে যেতে হবে না !—অঞ্জলি পিছন ফিরে আলমারীর পাল্লা বন্ধ করতে লাগল।

—যেতে হবে না মানে ? বিভূতি আশ্চর্য হয়ে বলল, ঘরে তো কিছু নেই—

—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না !

—সে কি ?

জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অঞ্জলি।

বিভূতি স্তম্ভিত হয়ে মিনিট খানেক চেয়ে রইল। তারপর দিব্যেন্দুর উদ্দেশে বলল, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন দাদা। আপনার বান্ধবীটি এখন থেকেই মওকা নিতে আরম্ভ করেছেন।

—তার মানে ?

—বুঝতে পারলেন না ? বিভূতি মুখ বেঁকিয়ে বলল, শ্রীমতীর ধারণা, আমি বাজারের পয়সা চুরি করে চা-সিগারেট খাই। ভাবতেও পারেন না যে, এখনও আমার এমন অনেক ফলোয়ার আছে, যারা আমার জন্যে খরচ করতে পাবলে বর্তে যায়। আচ্ছা—

বিভূতি সক্রোধে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু, দিব্যেন্দু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল অঞ্জলির ভবিষ্যৎ ভেবে। এই লোকটাকে নিয়েই, সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে তাকে। কিন্তু,—

একি শুধু পলিটিক্স্‌-পাগল ইজম বিলাসীর উচ্ছ্বাস ? না, নিদারুণ বেকারীর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কিংবা—

যে ব্যাধিটার নির্মম পীডনে, লোকটার বিতৃষ্ণা জেগেছে,—সুস্থ সমাজ জীবনের সব কিছু স্বাভাবিকতার প্রতি !

ডিসিস্‌ না এ্যালার্জী ?

চিন্তা করতে মন্দ লাগে না—একটা অমানুষকে মানুষ করে তোলা অসম্ভব নয়। যদি—

অঞ্জলি আবার ঘরে ঢুকল অফিস যাবার পোশাক পরে। গম্ভীর-ভাবে বলল, আপনি কি আজই আমাকে ভর্তি করে দিতে চান?

—কোথায়? দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল।

—ওই যে বললেন তখন।

—ওঃ। আচ্ছা, ঠিক পাঁচটার সময় আমি যাব'খন আপনার অফিসে। আজই ভর্তি করে দোব'খন আপনাকে।

—অমনি, ওই বুড়োটাকেও একটু ধমকে দিয়ে আসবেন—কেমন?

—পাগল! দিব্যেন্দু বুঝিয়ে বলল, তাতে আপনার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। তার চাইতে, চোখ-কান বুঝে সহ্য করে থাকুন কিছুদিন। পারবেন না?

—আপনি যখন বলছেন, পারতেই হবে।—বলে, অঞ্জলি বেরিয়ে গেল। এবং, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘরে ঢুকল বিভূতি। মুচকে হেসে বলল, কি ব্যাপার দাদা! বান্ধবীর চোখদুটো যেন বড্ড ছলছল করছে মনে হলো।

দিব্যেন্দুর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল হঠাৎ। কিন্তু, সামলে নিয়ে বলল, ব্যাপারটা স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা করুন না! সাহস হবে?

—তা যা বলেছেন! কালো মুখ বেগুনে করে বিভূতি বলল, আজকাল যা মেজাজ হয়েছে ওর, কথা কওয়া তো দূরের কথা, ধারে ঘেঁষতেই ভরসা হয় না।

—এ্যাণ্ড স্টিল ইউ আর হার হাজব্যাণ্ড?—নিদারুণ বিতৃষ্ণায় চোখ-মুখ বিকৃত করে দিব্যেন্দু বলল, আচ্ছা বিভূতিবাবু, আপনার শরীরে কি লজ্জা-ঘেন্না বলে কিছু নেই? এইভাবে, স্ত্রীর অন্নদাস হয়ে জীবন কাটাতে ঘেন্না করে না আপনার? আপনার অসুখের অজুহাত তো এখন অচল। তবুও, কিছু করছেন না কেন আপনি?

দিব্যেন্দুর মতো লোকও যে এত কড়া কথা বলতে পারে বিভূতির ধারণা ছিল না। সে একটাও কথা কইতে পারল না; মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? কিছু দরকার আছে ?

—একটা কথা ছিল। বিভূতি গুনগুন করে বলল।

—কি কথা ? টাকা ধার দিতে পারবো না কিন্তু—

—টাকা ধার চাইতেই এসেছি।

দিব্যেন্দু একেবারে যেন থ' হয়ে গেল। মানুষের পক্ষে আর কতখানি নির্লজ্জ হওয়া সম্ভবপর !

বিভূতি আবার বলল, গোটা দশেক টাকা ধার দিন আমাকে। আমি রাস্তায় বেরুতে পারছি না।

—কেন ?

—মোড়ের ওই পানওয়ালাটা—মাত্র গোটা দশেক টাকা ধার হয়েছে ; কিন্তু, ব্যাটা বেহারীর বাচ্ছা ওই সামান্য টাকার জন্যেই অপমান করতে আরম্ভ করেছে।

দিব্যেন্দু বিরক্তি চেপে বলল, যার একটা পয়সা উপার্জন করবার ক্ষমতা নেই তার আবার মান-অপমান কি ? সে নেশা করে কোন আক্কেলে ?

—আমি যে পারি না ! বিভূতি যুক্তি দেখাল, অঞ্জু বিশ্বাস করে না, কিন্তু, আপনি তো আর ওর মতো নন। আমি যে কিছুতেই থাকতে পারি না সিগারেট না খেয়ে !

এ লোককে নিয়ে আর কি করা যেতে পারে ! অগত্যা দিব্যেন্দু বলল, কচি খোকা আপনি ? ধার করলে শোধ দিতে হবে, আপনি জানতেন না ?

—আহা জানবো না কেন ? বিভূতি কুণ্ঠিতভাবে বলল, টাকাটা তো আমি দু-চারদিনের মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু, ব্যাটা বেহারীর বাচ্ছা—

—আপনি আবার টাকা পাচ্ছেন কোথেকে ? দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, কে আপনাকে টাকা দিচ্ছে ?

—কেন, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ! পলিশিটা যে স্যারেণ্ডার করলাম।

—কত টাকা? কবে পাচ্ছেন?

—পাঁচশো ছে-চল্লিশ টাকা। দু-চারদিনের মধ্যেই পেয়ে যাব।

—বটে? দিব্যেন্দু সবিস্ময়ে বলল, আপনার স্ত্রীকে বলেছেন এ কথা? কই, আমি তো শুনিনি।

—কেন বলবো? বিভূতি উত্তেজিতভাবে বলল, একটা পয়সা চাইলে দেয় না, আর ওকে আমি বলতে যাব টাকা পাচ্ছি? বয়ে গেছে আমার। যতদিন না চাকরি জুটছে, ততদিন ওই টাকায় হাত-খরচ চালাব আমি। তাছাড়া, ও তো এখন নিজেই টাকা আনবে।

—বিভূতিবাবু! দিব্যেন্দু হঠাৎ যেন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল।

—আজ্ঞে! বিভূতিও যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল!

—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কোন স্ত্রীই তার অপদার্থ স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, ভালবাসতে পারে না। শ্রদ্ধা, ভালবাসা অর্জন করতে হয়, এমনিতে পাওয়া যায় না।

—কিন্তু, আমি কি করতে পারি বলুন! বিভূতি যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়েই তার অক্ষমতার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে আরম্ভ করল: ছেলে পড়াতে পারবে না সে, ও সব ভুলে গেছে। হাঁটাহাঁটির কাজ করতে পারবে না, হার্ট দুর্বল রয়েছে এখনও। দোকানদারী করতে পারবে না, স্পাইন ড্যামেজড। সে পারবে শুধু টেবিল চেয়ারে বসে কেরানিগিরি করতে কিংবা লোক রেখে রেস্তোরাঁ বা মনোহারী দোকানের মতো ব্যবসা চালাতে। কিন্তু ক্যাপিটেল দেবে কে?

—থামুন! দিব্যেন্দু ধমক দিল। বলল, আপনি কাকে কি বোঝাচ্ছেন? আপনার স্পাইন ড্যামেজড? ভেবেছেন আমি কিছু জানি না?

—এ্যাঁ? কী জানেন? বিভূতি একেবারে যেন কুঁকড়ে গেল।

—আমি সব জানি। এখন, বাজে কথা রেখে কাজের কথা বলুন। সত্যিই আপনি সুস্থ মানুষ হয়ে উঠতে চান? চিকিৎসা করাতে রাজি আছেন? রোগটা আপনার সাংঘাতিক হলেও,

একেবারে অসাধ্য বোধহয় নয়। চেষ্টা করলে সেরে যেতে পারে। এখন বলুন—

—কিন্তু,—শুখনো মুখে, গলা ঝেড়ে বিভূতি বলল, আমার তো কোন রোগ নেই। আপনি কোত্থেকে শুনলেন? অঞ্জু বলেছে বুঝি?

—উঃ! দিব্যেন্দু উত্তেজনাভরে একবার উঠে দাঁড়াল। তারপরই আবার বসে পড়ে বলল, আচ্ছা, আপনি এখন আসুন।

বিভূতি কিন্তু নড়ল না, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনি এখন আসুন বিভূতিবাবু! আপনাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

বিভূতি তবুও নড়ল না। অগত্যা, দিব্যেন্দুই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পরদিন সকালেই—

অবস্থাটা সুষুপ্তির কিংবা উন্মত্ততার, এইটুকু উপলব্ধি করতেই বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল দিব্যেন্দুর। বিজ্ঞানের ছাত্র সে, পিতার মতো ভক্তি-যোগেরও ধার ধারে না বা বেদ-উপনিষদও বোঝে না। বিশ্বাস করে না কোন রকম অলৌকিক কাণ্ড-কারখানায়। কিন্তু, প্রায় দু'যুগ পূর্বেকার ফেলে আসা জীবনে, বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে, একদিন যে তাকে অভিভূত করেছিল, সে কেমন করে মূর্তিমতী হয়ে উঠতে পারে এতদিন পরে! কালের পরিণাম তুচ্ছ করে—অন্ততপক্ষে, কুড়ি-বাইশ বছরের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে—অবিকল সেই অনিন্দ্যরূপ পরিগ্রহ করতে পারে সে কেমন করে? এ হেন অবিশ্বাস্য ঘটনা কেমন করে সম্ভব হতে পারে, বিংশ শতকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে? দিব্যেন্দু স্বপ্ন দেখছে না পাগল হয়ে যাচ্ছে!

জায়গাটার নাম আজ আর মনে পড়েনা তার। শুধু মনে পড়ে,

সেটা ছিল বীরভূম অঞ্চলের একটা পল্লীগ্রাম; আর সেই গ্রামেরই জমিদারবাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন তার বাবা, কি যেন একটা প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত পুঁথির খোঁজ-খবর করবার জন্য। সঙ্গে ছিল সে।

জমিদারের নামটাও আজ আর তার মনে নেই। কিন্তু, চেহারাখানা মনে আছে। সে চেহারা ছিল ছবিতে দেখা কংশ রাজার চাইতেও ভয়ংকর। আর মনে পড়ে—তাঁর কথা।

জমিদারবাড়িতে তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল অবশ্য সদর মহলেই। কিন্তু, দোতলার যে ঘরটায় তাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তার একটা জানলা দিয়ে দেখা যেতো অন্তঃপুরের একটা অংশ। সেখানে ছিল ছোট্ট, কিন্তু, সুন্দর একটি তুলসীমঞ্চ। মঞ্চটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি তার—করিয়েছিল আর একজন।

তখনও দিনান্তের শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে যায়নি একেবারে। কিন্তু, তিনি সন্ধ্যা দেখাতে এসেছিলেন তুলসীতলায়। শুভ্র সুন্দর পা দু'খানিতে তাঁর আলতা পরা ছিল চওড়া করে। পরণে ছিল চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ী। মাথায় ছিল আধ-ঘুমটা। সেই ঘুমটার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তাঁর ছোট্ট কপালখানি; আর তার মাঝখানে আঁকা আরও ছোট্ট একটি সিঁদূরের টিপ। আঁচলের আড়ালে প্রদীপখানি ধরে, তিনি কেমন করে এগিয়ে এসেছিলেন তুলসীমঞ্চের দিকে; কেমন করে গড় হয়ে প্রণাম করেছিলেন গলায় আঁচল দিয়ে; কেমন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল তাঁর সেই উজ্জ্বল গৌর মুখমণ্ডল—সন্ধিক্ষণের সেই রক্তরাগে—সন্ধ্যাদীপের সেই শান্ত শিখায়—সে সব ছবি আজও স্পষ্ট দেখতে পায় সে চোখ বুজলে। আজও মনে পড়ে, বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, উনি কে বাবা?

বাবা সম্ভবতঃ তখন সারাদিনের হিসাব-নিকাশ করছিলেন মনে মনে, চমকে উঠে বলেছিলেন, জানি না তো!

বাবার কাছ থেকেই শিখেছিল সে, দ্বিজু রায়ের মাতৃ-বন্দনা।

স্নানস্নাতা সিক্ত-বসনা জননীর সে রূপও সে প্রত্যক্ষ করেছিল পরদিন ঊষালগ্নে। দেখেছিল, তাঁর গুণ্ঠনীমুক্ত সীমন্তের শোভা। তাঁর সিক্ত এলায়িত কুন্তল ভার। তাঁর সেই অপরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তি।

তুলসীমঞ্চে জল সিঞ্চন করে, প্রণামান্তে চলে গিয়েছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তার বাবাকে বলেছিল, ঠিক যেন আমার মায়ের মতো, নয় বাবা?

শুনে, বাবা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওই রকম মা বুঝি তোর খুব ভাল লাগে খোকা?

—হ্যাঁ বাবা।

আজও মনে পড়ে দিব্যেন্দুর, বাবা সেদিন বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। তারপর, তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, দেখিস, যদি পারিস,—ওই রকম একটা মা খুজে আনিস তোর ছেলের জন্যে।

—ওকি হচ্ছে? অঞ্জলি ঘরে ঢুকে ভুরু কুঁচকে বলল, গিলে খাবেন নাকি?

দিব্যেন্দুর যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে লক্ষ্য করল, মেয়েটি চলে যাচ্ছে সন্ত্রস্ত পদে। অভিভূতের মতো জিজ্ঞাসা করল, উনি কে?

—সতী, ঋষিবাবুর মেয়ে।

—সেকি? কবে এলেন ওঁরা?

—গতকাল রাত্তিরে। গিন্নীও এসেছেন।

—ঋষিবাবুর মতো লোক—দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, স্ত্রী-কন্যাকে এনে তুললেন এই নরককুণ্ডে! কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার আবার কি—অঞ্জলি বিরক্ত হয়ে বলল, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না? মেয়ে দেখাতে এনেছেন; কাজ শেষ হলেই আবার দেশে চলে যাবেন। কিন্তু, আপনি অমন করে কি দেখছিলেন? ছি ছি, কি ভাবলে বলুন তো—

—আশ্চর্য ! কত বয়স বলুন তো ওঁর ?

—হবে, কুড়ি কি পঁচিশ ! কিন্তু, আপনি—

—কিন্তু, কিন্তু, এ কি করে সম্ভব হ'তে পারে ?

—আপনার কি হয়েছে বলুন তো ? দিব্যেন্দুর নির্লজ্জতা দেখে অঞ্জলি বিরক্ত হয়েছিল, কারণ, সে-ই ভরসা দিয়ে ছাদে এনেছিল সতীকে, ভিজে কাপড় মেলে দেবার জন্যে। কিন্তু, এখন দিব্যেন্দুর ভাব-ভঙ্গি দেখে বিরক্তির স্থান গ্রহণ করল বিস্ময়। বলল, কি সব বলছেন, সম্ভব অসম্ভবের কথা ? হলো কি আপনার ?

—অসম্ভব নয়, অলৌকিক ! দিব্যেন্দু বলল, ওই ভদ্রমহিলাকে ঠিক ওই রকম বয়সেই আমি দেখেছিলাম, আজ থেকে অন্ততঃপক্ষে কুড়ি বাইশ বছর পূর্বে।

—কি বলছেন যা তা ! অঞ্জলি আশ্চর্য হয়ে বলল, স্বপ্ন দেখেছেন বুঝি ?

—স্বপ্ন নয়, সত্যি ! যদি শপথ করতে বলেন, তাও করতে পারি।

—কি আশ্চর্য। খুলেই বলুন না, কি হয়েছে ?

—শুনবেন ? দিব্যেন্দু বেশ একটু উত্তেজিতভাবেই তার স্মৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিল। শুনে, অঞ্জলি প্রথমে হলো বিস্মিত, তারপরে হাসি চাপল মুখ টিপে।

—বিশ্বাস করতে পারলেন না ?

—সে কি, বিশ্বাস করতে পারবো না কেন ?

—তবে হাসছেন যে ?

—হাসছি আপনার বুদ্ধি দেখে। অঞ্জলি বলল, মেয়ের চেহারা যে অবিকল মায়ের মতো হয়, এমন কথা কি আপনি কখনও শোনেন নি ? আপনি যাঁকে দেখেছিলেন, তিনি ঋষিবাবুর স্ত্রী—সতী তখনও জন্মায় নি !

দিব্যেন্দু মিনিটখানেক হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর কোন রকমে বলল, আপনি জানলেন কি করে ?

অঞ্জলি বলল, সতীর মায়ের কাছ থেকে। উনি তো এসেই আপনার খবর নিয়েছিলেন—আমার কাছে।

—তাই নাকি? কি বলছিলেন?

—জিজ্ঞাসা করছিলেন সামাধ্যায়ী মশায়ের ছেলেটি কেমন, কি করে—এই সব। আপনি নাকি একবার ওঁদের দেশের বাড়িতেও গিয়েছিলেন আট-ন' বছর বয়সের সময়, আপনার বাবার সঙ্গে। তখন নাকি আপনি খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন, ভা-রি লক্ষ্মী ছেলে ছিলেন—এই সব বলছিলেন আর কি।

অঞ্জলি আচমকা থেমে গেল, দরজার বাইরে স্বামীকে দেখে। বিভূতিও চোখাচোখী হতেই ঘরে ঢুকে বলল, তুমি এখানে? ওদিকে ন-টা বেজে গেছে যে! আফিস-টাপিস যেতে হবে না? রোজ রোজ এ রকম লেট করলে—

—আচ্ছা হয়েছে!—বলেই, স্বামীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অঞ্জলি আবার দিব্যেন্দুকে বলল, আপনার কিন্তু উচিত, ওঁকে একটা প্রণাম করে আসা।

—সেটা কি উচিত হবে? অযাচিতভাবে, ঘনিষ্ঠতা করতে যাওয়ার···অন্য অর্থও তো ওঁরা করতে পারেন!

—আপনার মন বুঝি তাই বলছে? অঞ্জলি আবার মুখ টিপে হাসল। তারপর, একটা মারাত্মক কটাক্ষ হেনে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিভূতি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল থাপ্পড় খাওয়া অসহায়ের মতো। অঞ্জলি চলে যেতেই বলল, দেখলেন দাদা, আক্কেলটা?

দিব্যেন্দু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আজ রবিবার।

শুনে বিভূতির কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল।

দিব্যেন্দু লক্ষ্য করল পরিবর্তনটা। বস্তুতঃ, এইটুকুর জন্যেই এখনও বিভূতিকে সহ্য করতে পারে সে। চাকরিজীবী স্ত্রীর ওপর

বেকার স্বামীর দাবী-দাওয়া চলে না। তাই, তাকে খালি পায়ে, নিঃশব্দে অনুসরণ করতে হয় স্ত্রীকে। ধরা পড়ে গিয়ে অজুহাত দেখাতে হয়, অফিসে লেট্ হওয়ার। কিন্তু, অভিনয়টা যখন সত্যিই ধরা পড়ে যায়—যখন সে সত্যিই জানতে পারে, মিথ্যেটা তার সত্যিই ধরা পড়ে গেছে, তখন, সেই মিথ্যেটাকে সত্যি প্রতিপন্ন করবার জন্য সে আর বাড়াবাড়ি করে না। লজ্জা পেয়ে মুখ কালি করে এখনও। হয়ত মনুষ্যত্ব বেকার স্বামীর পক্ষে এটুকু বাঁচিয়ে রাখাও কম বাহাদুরীর কথা নয়!

—কিছু দরকার আছে আমার কাছে? বিভূতিকে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

—আপনি কাল যা বলছিলেন—বিভূতি গুনগুন করে বলল, তাতে কত খরচ পড়বে?

দিব্যেন্দু নড়ে চড়ে বসল। তারপর, বিভূতির আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, সে কথা জেনে আর লাভ কি? আপনার তো কিস্যু নেই!

—পাঁচশো টাকায় হয় না?

—ওহো! দিব্যেন্দুর মনে পড়ল, পলিসি সারেণ্ডার করার কথাটা। বলল, বেশ, ওই পাঁচশো টাকাটা আগে আমার হাতে এনে দেবেন, তারপব ফারদার প্রোসিড করবো।—কিন্তু, আপনার হাত-খরচ চলবে কি করে? চিকিৎসার চাইতেও, নেশা করাটাই তো আপনার কাছে বড়। সেটার কি হবে? চুপ করে রইলেন কেন, জবাব দিন!

বিভূতি ঢোক গিলে বলল, ছেড়ে দোব।

—তা যদি পারেন, তাহলে—দিব্যেন্দু হঠাৎ থেমে গেল!

—তাহলে, পাঁচশো টাকায় কুলিয়ে যাবে?

—যাওয়া তো উচিত! দিব্যেন্দু ভরসা দিয়ে বলল, দরকার হলে, আমি না হয় আপনাকে ধার দোব! তারপর, আপনি যখন আবার

সুস্থ হয়ে উঠে রোজগার করবেন, তখন ঋণ শোধ করবেন। করবেন তো?

বিভূতি উত্তর দিল না; মুখ নীচু করে, বোকার মতো একটু হাসল।

—এখন বলুন দেখি। দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল, আপনার এই রোগটা প্রথম কবে ধরা পড়ে! প্রথমবার প্রহার খাওয়ার পরেই তো?

—হ্যাঁ!

—আপনার স্ত্রী জানেন?

—জানে নিশ্চয়ই। বিভূতি ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিল,—তবে, কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। আমিও কিছু বলতে পারি নি—

—বুঝেছি। কিন্তু, চিকিৎসা করান নি কেন?

—তার পরেই যে সব গোলমাল হয়ে গেল। কাকা ব্যাটাচ্ছেলে—

—বুঝেছি। আচ্ছা কাল সকালে একবার আসবেন। আপনাকে নিয়ে বেরুব।

চিকিৎসার ব্যাপারে, হাসপাতালের সেই জুনিয়ার সার্জেনটির পরামর্শই গ্রহণ করল দিব্যেন্দু। ওই হাসপাতালেরই প্রখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসককে যদি গোটা দুয়েক পুরো ফিস্ দেওয়া যায় তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে, তাহলে দৈনিক তিন টাকা হারে বেড পাওয়া যেতে পারে হাসপাতালেই।

পরদিন সকালে, অঞ্জলি অফিসে বেরিয়ে যাবার পরই দিব্যেন্দু বিভূতিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল স্পেশালিস্ট-এর উদ্দেশে। রোগীকে তিনি বেশ ভাল করেই পরীক্ষা করলেন। ভাল হয়ে যাবার আশাও দিলেন রোগীকে। কিন্তু, আসল কথাটা দিব্যেন্দুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন গোপনে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নজীর, এই শ্রেণীর রোগীদের সম্বন্ধে ভরসা পাবার মতো ভাল কথা বলে না। সাফল্যের

খতিয়ানে, শতকরা আড়াই থেকে তিনজনের বেশী ব্যাধিমুক্তকে খুঁজে পাওয়া যায় না। স্নুতরাং.........

তবুও দিব্যেন্দু নিরস্ত হলো না। হাজার খানেক টাকা নষ্ট করে, বরাতটাকে একবার বাজিয়ে দেখবার জন্যে প্রস্তুত হলো সে।

—দিব্যেন্দু—

স্পেশালিস্ট-এর চেম্বারে বেশ কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করে, অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় অত্যন্ত অবসন্নের মতোই বাড়ি ফিরছিল দিব্যেন্দু; কিন্তু, দোতলার বারান্দায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ঋষিবাবুর গর্জন শোনা গেল, দিব্যেন্দু—

দিব্যেন্দুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। ইতিপূর্বে অযাচিতভাবে, ঋষিবাবু কখনও তার সঙ্গে কথা বলেন নি! সে উৎকণ্ঠিতভাবে এগিয়ে গেল দশ নম্বরের দিকে। দেখল, একটা ছেঁড়া কাগজ হাতের তালুতে পিষতে পিষতে ঋষিবাবু তারই দিকে তাকিয়ে আছেন আরক্ত চোখে।

—আমাকে ডাকছিলেন?

ঋষিবাবু ভ্রূকুটি করলেন। বললেন, এ ব্যাটা গোল্ড মেডালিস্ট কোন্ গোয়াল থেকে মেডেল পেয়েছিল বলতে পারো?

—কি হয়েছে?

—ব্যাটাচ্ছেলের বিদ্যেটা একবার দেখো। বলে, ঋষিবাবু সেই পিষ্ট কাগজখানা দিব্যেন্দুর হাতে দিলেন। সে, ডাক্তার স্নুদর্শনের প্রকাণ্ড প্রেসক্রিপশানখানা পড়তে আরম্ভ করল।

—কাল সকালেই মেয়েটার পাকা দেখা—ঋষিবাবু বললেন, এখন দেখছি হাঁচছে হ্যাঁচ্ছো হ্যাঁচ্ছো করে। তাই ওকে একটা কল দিলাম। কিন্তু, দু' টাকা ফিস নিয়ে কি কাণ্ড করেছে একবার দেখো! পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে ডাক্তারখানায় পাঠিয়েছিলাম; ফেরৎ দিয়েছে, আরও আড়াই টাকা চেয়ে—

—ভদ্রলোক একটু চেক-আপের পক্ষপাতী! দিব্যেন্দু হাসি চেপে বলল, কিন্তু, হয়েছে কি? তরল সর্দির সঙ্গে একটু জ্বরো-ভাব তো?

—হ্যাঁ হে সিম্পল সর্দি—

—জিজ্ঞাসা করুন তো জলপিপাসা আছে কিনা।

—সতী। ঋষিবাবু আবার হুঙ্কার ছাড়লেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল সতী।

—তোর জলপিপাসা আছে?

একবার চোখ তুলেই আবার মুখ নীচু করল সতী; কোন জবাব দিল না।

—খেলে কলা পোড়া, কথার জবাব দে না? ঋষিবাবু ধমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন মা। রুগ্ন শীর্ণ চেহারার হেঁকো রোগী—সতীর মা হিসাবে কল্পনা করতে কষ্ট হয়। ভদ্রমহিলা চাপা গলায়, অথচ, বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, কি আরম্ভ করেছো তুমি? আকাটটাকে তো তুমিই এনে জুটিয়েছিলে—এ বেচারাকে দাঁতে পিষছো কেন তখন থেকে? দিব্যেন্দু, তুমি এ ঘরে এসো তো বাবা—

মেয়েকে নিয়ে মা চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দুও ঋষিবাবুর দিকে তাকাল।

—দেখো কি করতে পারো! ঋষিবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ব্যাটাচ্ছেলে এমন মেজাজ খারাপ করে দিয়ে গেল যে—

আর বাক্যব্যয় না করে দিব্যেন্দু পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। রায়গিন্নী বসেছিলেন একটা সদ্য কেনা সস্তা তক্তপোষের ওপর। বললেন, এসো। এই সতী এদিকে আয়। যা জিগগ্যেস করে, উত্তর দে।

সতী দাঁড়িয়েছিল ও পাশের একটা জানালার ধারে পিছন ফিরে, মায়ের ডাকে সাড়া দিল না।

—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন—দিব্যেন্দু রায় গিন্নীর উদ্দেশেই বলল, জলপিপাসা আছে কি না। আর…ক'দিন পায়খানা হয়নি।

—বল বাছা বল—রায় গিন্নী শ্রান্তকণ্ঠে বললেন, আর জ্বালাস নি।

—বললুম তো এ কিছু নয়!—সতী পিছন ফিরেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

—কিছু নয় তো জ্বরোভাব হয় কেন রে পোড়ারমুখী? রায় গিন্নী বিরক্ত হয়ে বললেন, হারামজাদীকে পইপই করে বারণ করলাম স্নান করিস নি—

—দেখি নাড়ীটা!—সতীর কাছে গিয়ে দিব্যেন্দু খপ করে তার নাড়ী ধরল।

সতী বোধহয় এতখানি আশা করে নি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে একবার মায়ের দিকে তাকিয়েই সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

ভাল করে নাড়ীর গতি লক্ষ্য করে দিব্যেন্দু হাত ছেড়ে দিল। তারপর বলল, বেশ জলপিপাসা আছে তো?

সতী উত্তর দিল না, যেমন ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনই রইল।

দিব্যেন্দু তখন একটু হেসে বলল, আমি তাহলে ধরে নিচ্ছি, আপনার জলপিপাসা আছে, আর, অন্ততঃপক্ষে দু'দিন পায়খানা হয়নি। কেমন?

সতী মুখ ফেরাল না; কিন্তু, এক রকমের মুখ-ভঙ্গি করল।

—কাগজ কলম দিন।

এতক্ষণে নড়ল সতী। পাশের টেবিলটার টানা খুলে কাগজ কলম বার করে দিল।

প্রেসক্রিপসান লিখে দিব্যেন্দু রায় গিন্নীকে বলল, একটা হোমিও-প্যাথিক ওষুধ দিচ্ছি মা। আপনাদের আপত্তি নেই তো?

রায় গিন্নী বিস্মিত হলেন। মাতৃ সম্বোধন শুনে নয়, ওষুধের কথা

শুনে। বললেন, হোমোপ্যাথী? তবে যে শুনেছিলাম, তুমি এ্যালোপ্যাথী করো।

—এ্যালোপ্যাথী করি? অর্থাৎ ডাক্তার?—দিব্যেন্দু একটু আশ্চর্য হয়েই বলল, কার কাছে শুনলেন? ভগবানবাবু নিশ্চয়ই বলেন নি!

—পাগল ছেলে?—রায় গিন্নী হেসে উঠে বললেন, তোমার কথা ভগবানের কাছে শুনতে হবে কেন—আমরা তোমাকে চিনি না? তোমার অবশ্য মনে থাকবার কথা নয়; কিন্তু—

আরম্ভ হল পরিচয় আদান প্রদানের পালা। রোগিনীর ওষুধ আনা স্থগিত রইল; দিব্যেন্দুরও মাপা অন্ন বরবাদে গেল; রায় গিন্নীর নিজের হাতে তৈরী এক রেকাবী চন্দ্রপুলি উদরস্থ করে, মনের আনন্দে গল্প করে চলল সে।

—হ্যাঁ বাবা, তুমি চা খাও না?—ঘণ্টাখানেক পরে রায় গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন।

—খাই মাঝে মাঝে—

—তবে জল চড়া, ও সতী!

দিব্যেন্দু জমে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই সতী রান্নাঘরে গিয়ে আত্ম-গোপন করেছিল। চন্দ্রপুলি পরিবেশনের সময়, মায়ের ডাকে একবার তাকে আসতে হয়েছিল এ ঘরে; আবার আসতে হলো।

—ওহো, রোগিনীকে দেখেই ওষুধের কথা মনে পড়ে গেল দিব্যেন্দুর। ব্যস্ত হয়ে বলল, গণ্ডা তিনেক পয়সা দিয়ে এটা আনিয়ে নিন। দু' বড়িতে এক ডোস্। আজই, দু' ঘণ্টা অন্তর এক ডোস্ করে খাইয়ে যান। তারপর, কাল সকালে—

—বিন্নীজকে পাঠিয়ে ওষুধটা আনিয়ে নে! রায় গিন্নী মেয়ের উদ্দেশে বললেন, তোর বাপ আছে নাকি ও ঘরে? থাকলে, জিগ্গ্যেস কর, চা খাবে কি না—

—বাবা বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ!

—তাহলে, দু' বাটি জল চড়া—

—তুমি ? সতী বিরক্ত হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। মা একটু লজ্জিতভাবেই বললেন, নে নে, তোকে আর গিন্নীপনা করতে হবে না। এক বাটি বাড়তি চা খেলে তোর মা মরবে না—

—আপনার চা খাওয়া বারণ নাকি ? দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল, কী অসুখ আপনার ?

—তুমি থামতো বাছা ! রায় গিন্নী এক ধমকে ব্যাধি প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে, অন্য কথা পাড়লেন।

আরও ঘণ্টা খানেক কেটে গেল।

বেশ মেয়েটি। ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকলে আরও যেন সুন্দর দেখায়। কিন্তু, কোন খবর দিলে না কেন ?—ক্রমাগত অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ার জন্যে দিব্যেন্দুর যথাযথভাবে মেহন্নৎ করা হলো না ; ঘরে এসে বসল।

অসুস্থ মানুষ অবশ্যই স্নান করবে না এবং স্নান না করলে ছাদেও আসবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু, একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল তো মায়ের !

রায় গিন্নীও বেশ লোক—খুব গপ্পে ! গতকাল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার জীবনের সব কথা জেনে নিয়েছিলেন তিনি ; নিজেদের সংসারেরও অনেক দুঃখের কাহিনী বলেছিলেন। এবং—

একটু উপদেশও দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। অঞ্জলির প্রসঙ্গে বলেছিলেন, চাকরি করে দিয়ে তুমি ওকে বাঁচিয়েছো—তোমার উপযুক্ত কাজই তুমি করেছো। কিন্তু, দুনিয়াটা যে বড্ড খারাপ বাবা ! তুমি কার ছেলে—কেমন ছেলে, সে সব তো কেউ জানবার চেষ্টা করবে না, বরং, আড়ালে নিন্দে করবে ওর সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে। তোমার উচিত বাবা—একটু সাবধান হওয়া।

উপদেশটা হজম করতে পারেনি দিব্যেন্দু। হেসে বলেছিল,

কিন্তু, আপনারও তো উচিত নয়, আমাকে সাবধান হতে বলা। আপনি নিজেই যখন জানেন, আমি কোন অন্যায় কাজ করতে পারি না, তখন, সাবধান হওয়ার তো কোন কথাই উঠতে পারে না।

—তা বটে! রায় গিন্নী যেন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলেছিলেন, তা হলেও, সমাজে বাস করতে গেলে,—

—বাঙলা দেশে, বিশেষতঃ কোলকাতার সহরে, আপনি আবার সমাজ দেখলেন কোথায়?—দিব্যেন্দু চেপে ধরেছিল রায় গিন্নীকে।

—তা বটে! রায় গিন্নী মুখ বেঁকিয়ে বলেছিলেন, মেগেঃ, ভাবতেও ঘেন্না করে। যারা মেয়ে বৌকে বাজারে পাঠায় রোজগার করে আনতে, তারা যে কেমন পুরুষ মানুষ তাও বুঝি না,—কেমন ভদ্দরলোক তাও জানি না! তবে কি জান বাবা, আমাদের এই বাঙলা দেশে—

—ঠিক কথা! দিব্যেন্দু বাধা দিয়ে বলেছিল, কিন্তু, আমি বাঙালী হলেও, বাঙলা দেশের বাঙালী তো নই।

—না বাবা,—রায় গিন্নী শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলেছিলেন, তুমি একেবারে তোমার বাবার মতো হয়েছো,—তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলো? আচ্ছা বেশ, এবার একটা সত্যি কথা বলো তো বাবা। এখনও বিয়ে করোনি কেন? বয়স তো কম হলো না? কারণটা কি?

—কারণ—দিব্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিয়েছিল, বৌকে বরণ করে ঘরে তুলবে কে? আমার তো কেউ নেই!

বিভূতি ঘরে ঢুকল। কুণ্ঠিত ভাবে বলল, আজ ওঁদের ফাইনাল ডিসিশান নেওয়ার দিন। আপনি একবার যাবেন না?

দিব্যেন্দুর মনে পড়ল, স্পেশালিস্ট এবং প্রবীন সার্জেন দু'জনে পরামর্শ করে আজই বলবেন—বিভূতিকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে নেওয়া হবে কি না।

—কিন্তু, আপনার সেই টাকার কি হলো?

—একটু মুস্কিল হয়েছে। পকেট থেকে একখানা ছাপানো ফরম বার করে বিভূতি বলল, আমি যে সত্যিই আমি, সেটা ওঁরা কনফার্ম করে নিতে চান কোন ম্যাজিস্ট্রেট, গেজেটেড অফিসার—নিদেন পক্ষে একজন হেড মাস্টারের কাছ থেকে। কিন্তু, আমি কোথায় পাবো এই সব লোককে ?

—আচ্ছা, ওর জন্যে আটকাবে না।—ফরমটা পকেটস্থ করে দিব্যেন্দু বলল, কিন্তু, আরও কথা আছে। আপনাকে আবার যদি হাসপাতালেই যেতে হয়, মিসেসকে কি বলবেন ?

বিভূতি চুপ করে রইল।

দিব্যেন্দু আবার জিজ্ঞাসা করল, আসল কথাটা তিনি জানেন তো ?

—ঠিক জানি না। বিভূতি ঢোক গিলে বলল, জানতে পারাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু, কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আমিও কিছু বলিনি কখনও। বরং—

—গোপন করবারই চেষ্টা করেছেন, কেমন ?

বিভূতি মাথা নেড়ে সায় দিল।

—এখন জানাতে আপত্তি আছে ?

বিভূতি সভয় ঘাড় নাড়ল।

—তাহলে,—দিব্যেন্দু চিন্তিত ভাবে বলল, তাহলে ওঁকে বরং বলা যাবে,—আপনার কিডনীতে যে আঘাতটা লেগেছিল, সেইটেই আবার রিল্যাপস করার জন্যে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। কেমন ? আচ্ছা, এখন চলুন, দেখি ওঁরা কি বলেন।

—কিন্তু, টাকাটা তো পাওয়া গেল না এখনও—

—আপাততঃ আমিই ধার দোব টাকাটা। তারপর, আপনি যখন টাকা পাবেন, সুস্থ হয়ে উঠে কাজকর্ম করবেন, তখন ঋণ শোধ করবেন। চলুন !

—একটু পরে গেলে হতো না ! অঞ্জু অফিস যাবার পর—

—ওঃ আচ্ছা, তুপুরেই বেরুনো যাবেখন। বিভূতি চলে গেল।

কিন্তু, অঞ্জলি আজ ছাদে এল না কেন?

এটা কি রকম হলো?

কি হতে পারে?—সম্ভব-অসম্ভব কাণ্ড-কারখানার কথা চিন্তা করতে গিয়ে, হঠাৎ যেন চমকে উঠল সে। এ সব কি চিন্তা করছে সে! পরস্ত্রীর মান-অভিমানের কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করবার জন্যই এ বাড়িতে বাস করছে নাকি সে?

খারাপ মন আরও খিঁচড়ে গেল,—হঠাৎ পাঁচ নম্বরের উকিল কন্যাকে দেখে। মেয়েটার নাম মনিকা। রমেশবাবুর মেজো মেয়ে। বয়স কুড়ির এপারে নয়; কিন্তু, এখনও ফ্রক পরে। মাঝে মাঝে শিখ মেয়েদের মতো পোশাক পরেও রাস্তায় বেরোয়।—এক গাদা ভিজে জামা-কাপড় নিয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে-তারের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছিল। হাওয়ায় উড়ছিল ফ্রক—

দিব্যেন্দুর অনুমতি না নিয়ে, মেয়েটা ছাদে এল কি সাহসে? কি ভেবেছে ও? দিব্যেন্দুর মতো লোককেও কি ওর পাড়াতুতো দাদাদের পর্যায়ভুক্ত মনে করল নাকি? কয়েকদিন পূর্বে উকিল-গিন্নী তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেছিলেন,—ভাই ঠাকুরপো বলে। সে একেবারেই আমল দেয়নি। কিন্তু, মেয়ে যদি জোর করে ঘরে ঢুকে দাদা পাতায়? তাহলে, কোন রাস্তা নেবে সে?

কেবল এই মেয়েটাই নয়, উকিল-গিন্নীর সব কটা মেয়েই, যেমনি বেহায়া তেমনি বে-পরোয়া। যেমন নিয়মিত স্কুল-কলেজে যায়, তেমনি রীতিমত প্লে করে তথাকথিত এ্যামেচার থিয়েটারে, আবার তেমনি বুক ফুলিয়ে বেহায়াপনা করে গাদা গাদা পাড়াতুতো দাদার সঙ্গে! এদের তুলনায় বরং ঢের ভাল ন' নম্বরের বিপাশা বাসু। এদের মতো সে-ও বাইরে থেকে রোজগার করে আনে। কিন্তু, কবে, কোন যুগে চিত্র-তারকা হয়েছিল, সেই দম্ভে আজও সে প্রতিবেশীদেরকে করুণার চক্ষে দেখে,—কথা বলে না! কিন্তু—

আজ যদি সে উকিল-কন্যাকে প্রশ্রয় দেয়, তাহলে একে একে ক্রমে ক্রমে আর সকলে যে ছাদে আসবে না তার নিশ্চয়তা কি!

মনিকা কিন্তু ঘরেও ঢুকল না, কোন রকম ঘনিষ্ঠতারও চেষ্টা করল না; কাজ সেরে নীরবেই নীচে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যেন্দু গর্জন করে উঠল, বাহাদুর—

বাহাদুর এসে দাঁড়াল। দিব্যেন্দু তাকে বুঝিয়ে বলল, এখন থেকে সর্বক্ষণ সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে রাখবি। আমি, মাইজী আর বিভূতিবাবু ছাড়া বিনা এত্তেলায় কাউকে ছাদে আসতে দিবি না বুঝলি?—দিলে তোর নোক্‌রী খতম্ হয়ে যাবে, বুঝলি?

বাহাদুরকে সে হয়তো আরও কিছু বুঝিয়ে বলতো; কিন্তু, বিভূতি ঘরে ঢুকল। বলল, চলুন দাদা, অঞ্জু বেরিয়ে গেছে—

বিভূতির হাসপাতাল-বাসই স্থির হলো, আপাততঃ দিন কুড়ির জন্য। একেবারে সব ব্যবস্থা করে দিব্যেন্দু বাড়ি ফিরল বেলা দুটোর পর। আহারে রুচি ছিল না; মেজাজও খিঁচড়ে গিয়েছিল ভীষণভাবে। তবুও, যৎকিঞ্চিতের বিনিময়ে পিত্ত রক্ষা করে, আবার সে বেরুবার মতলব করল কারখানার উদ্দেশে। যে কোন রকমেই হোক, অন্যমনস্ক থাকতে হবে তাকে এ ক'দিন—যতদিন না পালাতে পারছে এ বাড়ি ছেড়ে। সে কি করছে, বুদ্ধি দিয়ে তার পরিণাম বিবেচনা করবার মতো অবস্থা ছিল না! তবে, যে জন্যে করছে—সে সম্বন্ধে একটা আশার ভরসা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল উত্তেজিতভাবেঃ ওদেরকে সুখী করতে পারলে ভগবান তাকেও সুখী করবেন নিশ্চয়ই। সুতরাং কাজটা শেষ করে ফেলাই কর্তব্য, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এর জন্যে যদি তার কিছু অর্থদণ্ড যায়, সেও ভি আচ্ছা!

সদরে বেরুতেই দেখা হলো, ঋষিবাবুর চাকর বিরীজলালের

সঙ্গে। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ঢুকছিল সে, দিব্যেন্দুকে দেখে একটু সমীহ করে সরে দাঁড়াল।

—কি হে? দিব্যেন্দু ভরসা করে জিজ্ঞাসা করল, তোমার দিদিমনির বেমার সেরেছে?

—দিদিমনি তো আচ্ছি হ্যায়, মগর মাঈজী গড়বড়ায়া—

—কি ব্যাপার?

বিরীজলাল যা বলল, সেটা গোলমেলে। সতীর আজ পাকা দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু, সেটা হনুমান হাউস থেকে হয়নি—উত্তর কোলকাতার বাসিন্দা জনৈক আত্মীয়র বাড়ি থেকে হয়েছে। আজই, খুব ভোর বেলায়, সকলে সেখানে চলে গিয়েছিল। সেখানে, বরপক্ষ যথাসময়েই এসেছিলেন; কিন্তু, নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার বোধহয় হয়নি। বরপক্ষের উপস্থিতিতেই কর্তা-গিন্নীতে ভীষণ ঝগড়া হয় এবং গিন্নী স্থির করেছেন, আজই সন্ধ্যার গাড়িতে মেয়ে নিয়ে দেশে চলে যাবেন। তাই, বিরীজলাল তোরঙ্গটা নিয়ে যেতে এসেছে।

অর্থাৎ, একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু, তাতে দিব্যেন্দুর কি এসে যায়! সে, পরের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। প্রথমে গেল বৈজুর কাছে। জিজ্ঞাসা করল, স্বরাজের প্রাইভেট্ টিউটার ভদ্রলোক—একটা গবর্নমেণ্ট স্কুলের হেড্ মাস্টার নয়?

—হ্যাঁ। কেন?

—তাঁকে দিয়ে এইটে সই করিয়ে,—কাল আমাকে পৌঁছে দিবি। —বলে, বিভূতির দেওয়া সেই সারেণ্ডার ফরম্‌টা দিব্যেন্দু বৈজুকে দিল।

কাজ বুঝে নিয়ে বৈজু বলল, তিন-কামরার একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পেয়েছি সি. আই. টি. রোডে। চল, দেখে আসি।

—এখন দেখে লাভ কি! দিব্যেন্দু বলল, বিভূতি বেচারা আবার

হাসপাতালে গেল মাস খানেকের জন্যে। এখন আমি যদি হনুমান হাউস ছাড়ি, বৌটা একলা পড়ে যাবে। সেটা উচিত হবে না। বিভূতি আগে ফিরে আসুক, তারপর······মাসখানেক ঝুলিয়ে রাখতে পারবি না ফ্ল্যাটটাকে?

—তারা তো আর আমার বড় কুটুম নয়।

—তাহলে, মাসখানেক পরেই চেষ্টা করা যাবে। বুঝলি? আমি এখন কারখানায় চললাম। বৈজুকে দ্বিতীয় কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে দিব্যেন্দু তাড়াতাড়ি চলে গেল! সত্যিই, কারখানায় গেল সে। সেখান থেকে গেল সিনেমায়—রাত্রি ন'-টার শো-এ।

পরদিন সকালেও অঞ্জলি ছাদে এল না দেখে, দিব্যেন্দু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বিভূতির আবার নতুন করে হাসপাতাল যাওয়া সম্বন্ধেও কি তার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই? এ কি ব্যাপার? এর মধ্যে এমন কি ঘটল, যার জন্যে অঞ্জলি দিব্যেন্দুকেও এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে! একবার খবর নেবে নাকি উপযাচক হয়ে!

সিঁড়িতে হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দে পাওয়া গেল। একে একে দেখা দিলেন পাঁচ নম্বরের রমেশবাবু, ছ' নম্বরের নীলিমা দেবীর ছোট ভাই অজয় আর ন' নম্বরের বিপাশা বাসুর স্বামী প্রফুল্ল পুরকাইৎ। সকলেরই মুখের অবস্থা গুরু-গম্ভীর।

—কি ব্যাপার? দিব্যেন্দু বিরক্তি চেপে জিজ্ঞাসা করল।

—ইমপরট্যাণ্ট কথা আছে আপনার সঙ্গে! বলল প্রফুল্ল।

—কী কথা?

সাংঘাতিক কথা। বাহাদুর ছাদের দরজা খুলে না দেওয়ার জন্যে, অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছেন রমেশবাবু। তাঁর সংসারের অর্ধেক জামা-কাপড় এখনও ছাদেই পড়ে রয়েছে। এ রকম ব্যবহারের অর্থ কি? প্রশ্ন করল প্রফুল্ল।

—অর্থ নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। কিন্তু, আপনি কে?—দিব্যেন্দু ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি রমেশবাবুর এজেণ্ট?

—না না, তা নয়—বললেন রমেশবাবু।

—তবে উনি কেন কথা কইছেন, আপনি থাকতে?

—না, মানে আমরা জানতে চাই—

—তার আগে আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই—বাধা দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, আমি শান্তিপ্রিয় লোক। কেউ বিনা এত্তেলায় ওপরে আসে, এটা আমি পছন্দ করি না। কাল, আপনাদের মেয়ে এসে আমার অসুবিধে ঘটিয়েছিলেন; ফলে, আপনারা আজ অসুবিধায় পড়েছেন। যাকগে, আপনারা মাল নিয়ে যান। কিন্তু, আর যেন এ রকম না হয়—

—তার মানে? ' প্রফুল্ল চড়া গলায় বলল, ছাদটা তো বারোয়ারী। আপনি বাধা দেবার কে?

—আমি কে? দিব্যেন্দু পূর্বের মতোই ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনারা যেখানে ট্রেসপাস করেছেন, সেই ফ্ল্যাটের লিগ্যাল টেনাণ্ট।

—আ হা হা,—রমেশবাবু ঢোক গিলে বললেন, আপনারা চটাচটি করছেন কেন! এই সামান্য ব্যাপার···তার জন্যে······

—সামান্য ব্যাপার কি বলছেন মশাই।—প্রফুল্ল আরও চড়া গলায় বলল, আমি জানতে চাই ছাদটা বারোয়ারী কিনা!

—মানে,—রমেশবাবু বললেন, আরও অনেকেই তো ছাদে আসে, তাই···মানে।

—অনেকেই আসেন না, একজন আসেন। দিব্যেন্দু বলল, এবং আগে থাকতে তিনি আমার অনুমতি নিয়েছিলেন বলেই, আসতে পারেন। যাই হোক, এভাবে তর্কাতর্কি করে কোন লাভ হবে না। আপনাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে, বাড়িওয়ালাকে গিয়ে বলুন। আমাকে বিরক্ত করা চলবে না! আচ্ছা, এখন আপনারা আসুন, আমি একটু ব্যস্ত আছি।

—ওঃ আচ্ছা! প্রফুল্ল সবেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাকি দু'জনও অনুসরণ করল তাকে।

—আপনাদের মাল নিয়ে যান।—দিব্যেন্দু হেঁকে বলল।

রমেশবাবু অনেকগুলো ধাপ নেমে গিয়েছিলেন; ফিরে এসে, তারের ওপর থেকে জামা-কাপড়গুলো তুলে নিয়ে গেলেন।

যত্তো সব র‍্যাবিস! সমস্ত দিন মনে মনে গজগজ করে কাটাল দিব্যেন্দু। কিন্তু, রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। এইভাবে, এমনি করেই দিন কাটবে নাকি তার! গত রাত্রে এক মিনিটের জন্যেও চোখের দু' পাতা এক করতে পারে নি ভাল করে। দিনের বেলাতেও অশান্তি—উড়ো ঝঞ্ঝাট যেন ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। অথচ—

পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে কি যে করা উচিত, তাও ভেবে পাচ্ছিল না! তবে, আপাততঃ একটা কাজ নিশ্চয়ই করা কর্তব্য বলে মনে হলো তার। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আজ রাতে তাকে ঘুমোতেই হবে ভাল করে। নাহলে, আজকের অশান্তির জের চক্রবৃদ্ধিহারে দেখা দেবে আগামী কাল। সুতরাং মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য! তৎক্ষণাৎ ল্যাবরেটারীতে গিয়ে সে একটা মাইল্ড ব্রোমাইড মিকশ্চার তৈরী করতে বসল।

পরদিন সকালে—

ঘড়িতে দশটা বেজে গেল, শুনতে পেল দিব্যেন্দু। কিন্তু, চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারল না। তারপর, আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার পর ধড়মড় করে উঠে বসল—অদ্ভুত একটা সুড়সুড়ি অনুভব করে।

অঞ্জলি তখন তার গেঞ্জীর ভেতর হাত চালিয়ে দিয়ে বুকের উত্তাপ পরীক্ষা করছিল। দিব্যেন্দুকে উঠতে দেখেই সে সভয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গেই আবার কাছে এসে বলল, কি হয়েছে আপনার? কেন এমন করে পড়ে আছেন? গা-গতোর তো ঠাণ্ডা? তবে?

কিছু বুঝতে না পেরে দিব্যেন্দুও ক্যালক্যাল করে চেয়ে রইল। অঞ্জলির চোখে জল! বাহাদুরটাও কেমন যেন বিহ্বলভাবে চেয়ে

রয়েছে তার দিকে! হঠাৎ হলো কি এদের? তারপরেই মনে পড়ে গেল গত রাত্রের ব্রোমাইড খাওয়ার কথা।

—কি হয়েছে আপনার? অঞ্জলি আবার জিজ্ঞাসা করল উৎকণ্ঠিতভাবে, আপনি ডাক্তার—বুঝতে পারছেন না কিছু?

—পারছি বৈকি! দিব্যেন্দু আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, গ্রীন ব্যানানা—

—সে আবার কি?

—ওই তো বললাম, গ্রীন...মানে, কাঁচকলা। কিন্তু, আপনার ব্যাপার কি? দিব্যেন্দু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, বেলা সাড়ে এগারটা বেজে গেছে, অফিস যাননি আজ?

অঞ্জলি যেন একবার থমকে দাঁড়াল। তারপরেই, কোন কথা না বলে হঠাৎ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তখন, বিস্মিত দিব্যেন্দুকে সংবাদ সরবরাহ করল বাহাদুর: অত বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে দেখে সে-ই অঞ্জলিকে খবর দিয়েছিল ডেকে গিয়ে।

—আর কাউকে খবর দিয়েছিস নাকি রে গর্দভ?

—না। মাইজী ডাগদার ডাকতে বলছিল, আমিও যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনি উঠে বসলেন।

—তবু ভাল যে, গোবর মাঠময় করে ফেলিস নি। এখন যা, গোসলের ব্যবস্থা কর।

বাহাদুর নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল।

মানুষ কি ইচ্ছে করলেই মেসিন হতে পারে? আপ্রাণ চেষ্টা করেও, কতখানি স্বার্থপর হতে পারে মানুষ! বেচারা অঞ্জলি—

কি আছে তার? পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, স্বামী, সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত অর্থসম্পদ,—কি আছে তার? আছে সে নিজে। কিন্তু, একলা চলার কেতাবী বুলিটাকে সত্যিই কি কোন সুস্থ মানুষ সার্থক

করে তুলতে পারে—স্বাভাবিক মনুষ্যধর্মে জলাঞ্জলি না দিয়েও! দিব্যেন্দু নিজে কি পেরেছে?

সঙ্গে সঙ্গেই চমকে ওঠে দিব্যেন্দু। মনে পড়ে যায় ভগবানবাবু প্রমুখ শুভাকাঙ্ক্ষীদের একটা অযাচিত, অত্যধিক শোনা উপদেশ: মনের অগোচরে পাপ নেই দিব্যেন্দু! তোমার কর্তব্য, তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে ফেলা!

কিন্তু, এটা কি পাপ! কোটি কোটি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে,—মাত্র একটি মানুষও কি ব্যতিক্রম হতে পারে না? তার সঙ্গে অঞ্জলির বন্ধুত্বটা কি কোন অবস্থাতেই নিরঙ্কুশ হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না? অবশ্য, কামনা-বাসনাহীন জীব সে নয়। কিন্তু, জীব হলেও জানোয়ার তো সে নয়!

হাসি মুখের দুটো কথা শুনতে পাওয়ার প্রত্যাশা কি পাপ! প্রতিবেশীকে অসুস্থ দেখে, উৎকণ্ঠিত হওয়াটা কি অপরাধ! আর— সেই উৎকণ্ঠিতাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছা হওয়াটা কি অবৈধ?

অঞ্জলিদের বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে, সমস্ত দুপুর কাটিয়ে দিল দিব্যেন্দু উচিত-অনুচিতের যৌক্তিকতা নিয়ে। ভাবতে ভাবতে ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠছিল সে। ক্রমশই যেন অসম্ভব হয়ে উঠছিল তার পক্ষে—অত্যুগ্র বাসনাটাকে দমন করা। অগত্যা, উঠে পড়ে সে জামা-কাপড় পরতে আরম্ভ করল। ঠিক করল, হাসপাতাল থেকেই একবার ঘুরে আসবে সে। অবশ্য, বিভূতির সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা আজ নেই—এতক্ষণে হয়তো তার অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু, খবর নেওয়ার অজুহাতে সেই জুনিয়ার ডাক্তারটির সঙ্গে একটু গল্প করে আসতে দোষ কি! তবু তো কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকতে পারবে সে।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে জামায় বোতাম আঁটতে আঁটতে হঠাৎ নজর পড়ল অঞ্জলির দিকে। বেশ সেজে-গুজে ফ্ল্যাটের দরজায় চাবী আঁটছে সে।

[illegible] ...ভানো আর হলো না। অঞ্জলিকে গিয়ে ধরল, [illegible] ...চ্ছে। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চললেন এত সেজে-[illegible]

এগোতে এগোতেই, মুখ না ফিরিয়ে অঞ্জলি বলল, সে খবরে আপনার দরকার ?

দিব্যেন্দু পাশে পাশে চলতে চলতে বলল, বাঃ, দরকারটা বুঝি কেবল এক তরফাই হবে ?

—তার মানে ?

—আমার ঘুম দেখে কেউ যদি আফিস কামাই করা উচিত মনে করে, তাহলে আমারও কি উচিত নয়, কারুর হাঁড়ি-মুখ দেখে—

—আমার মুখের দিকে তো আপনাকে কেউ চাইতে বলে নি !

—আচ্ছা, মুখের কথা তাহলে যাক। মনের কথাটা বলে ফেলুন।

—তার মানে ?

—মানে, এত তেতে-মেতে চলেছেন কোথায় ?

অঞ্জলি গোঁ-ভরে এগিয়ে চলল, উত্তর দিল না।

—আচ্ছা কি ছেলেমানুষ বলুন তো আপনি ! ঘুম দেখে ভুল করলেন আপনি, আর দোষ হলো আমার ! বেশ মেয়ে যা হোক ! এখন দেখছি, সত্যিই একটা অসুখ করলে ভাল হতো !

—থাক আর বাহাদুরী করতে হবে না ! অঞ্জলি গজগজ করে বলল, আমি বলে ছাদে গিয়েছিলাম কাপড় তুলতে···আর উনি ভাবলেন·········

—ছাদে গিয়েছিলেন কাপড় তুলতে ? অফিস কামাই করে ?

—কে বলেছে, অফিস কামাই করেছি আমি ? আমি বলে আগে থাকতেই ঠিক করেছিলাম অফিস যাবো না আজ······

—ওঃ। আর চোখের জলটা ?

—এই খবরদার বলছি ! অঞ্জলি রুখে দাঁড়াল। বলল, বাজে কথা বললে ভাল হবে না বলছি !

—দরকার কি বাজে কথায়! তার চেয়ে কাজের কাজটা [illegible] আসা যাক চলুন! কোন্ সিনেমায় যাচ্ছিলেন?

অঞ্জলি একেবারে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—কি হলো?

—আপনি কি করে জানলেন? অঞ্জলি অভিভূতের মতো বলল, কিছু ভাল লাগছিল না, তাই ভাবলাম, একটু সিনেমা দেখে আসি! কিন্তু, আপনি জানতে পারলেন কি করে?

সাজ-গোজ দেখে—সময় মতো বেরুতে দেখে!—কথাটা মুখে এলেও কিন্তু চেপে গেল দিব্যেন্দু। বরং, একটা ঢোঁক গিলে বলল, আমার অন্তর্যামী বলে দিলেন।

অঞ্জলি আর কথা কইতে পারল না, নীরবেই এগিয়ে চলল মুখ নীচু করে।

—কোথায় চলেছেন? কি ছবি?

—ন' নম্বরের মণিকা বলছিল তার মাকে—অঞ্জলি কুন্ঠিতভাবে বলল—সুমিত্রা সেন নাকি একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাই ভাবছিলাম—

—আগুন জ্বালানো যদি দেখতে চান তো আমার সঙ্গে চলুন—

—কোথায়?

—চলুন না। এই ট্যাক্সি—

একটা আমেরিকান ছবি দেখে বেরুল ওরা। তারপর গিয়ে ঢুকল একটা সাহেবী রেস্তোঁরায়—রাত্রের আহারটাও সেরে নেবার ইচ্ছায়। দিব্যেন্দুর প্রাণে যেন জোয়ার এসেছিল। সে কাঁটা-চামচের নিখুঁত ব্যবহার শেখাতে আরম্ভ করল অঞ্জলিকে।

—ইস—অঞ্জলি হাসি চেপে বলল—মাত্র দু' ঘণ্টার মেয়াদেই একেবারে সাহেব বনে গেলেন!

—যস্মিন পরিবেশে যদাচার! শরৎ সামাধ্যায়ীর নন্দন যদি সাহেব হয়, তাহলে শশী শাস্ত্রীর নন্দিনীও মেম্ সাহেব—

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—কী ? এত বিনয় যখন, তখন নিশ্চয়ই গোলমেলে কথা ?

—ওমা বিনয় আবার কোথায় দেখলেন! অঞ্জলি অপ্রতিভভাবে বলল, জিজ্ঞাসা করছিলাম, বাঙালী মেয়ের আগুন জ্বালানো তো সহ্য করতে পারলেন না; কিন্তু, জাঙ্গিয়া-পরা সাদা পেত্নীগুলোর বেলেল্লাপনা তো দিব্বি উপভোগ করে এলেন ?

—কেন করবো না ? দিব্যেন্দু সহজভাবেই বলল, ওরা আমার কে ? ওরা কি আমার মা-বোনের জাত ? কই,—আপনাকেও তো তেমন অস্বস্তিবোধ করতে দেখলাম না—

—থামুন তো! ঝাঁঝিয়ে উঠে অঞ্জলি বলল, একেবারে যেন অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ এসেছেন। আমার সব জেনে বসে আছেন একেবারে—

—সাবধান। দিব্যেন্দুও চোখ পাকিয়ে বলল, আজই, কিছুক্ষণ আগে প্রমাণ দিয়েছি, আমি অন্তর্যামী! এখন আবার সন্দেহ করলে রেগে গিয়ে ভস্ম করে ফেলব—

—ইস কি আমার অন্তর্যামী রে!—অঞ্জলিও মুখ বেঁকিয়ে বলল, অন্তর্যামী না হাতী! একটি পয়লা নম্বরের হাঁদারাম—

—হাঁদারাম ? যথা ?

অঞ্জলি জবাব দিল না; ভুরু কুঁচকে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল!

দিব্যেন্দু আবার বলল, কি হলো ? কথাটা বুঝিয়ে বলুন হাঁদারামকে। আমি অন্তর্যামী না হতে পারি; কিন্তু, হাঁদারাম বন্‌তেও রাজি নই! বলুন, বলতেই হবে আপনাকে।

—কি আবার বলবো ? অঞ্জলি যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলল, বাবা একটা কথা বলতেন: মূর্খে ভোজ দেয় বুদ্ধিমানে খায়।

কথাটার মানে তখন মাথায় ঢুকতো না; আজ আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি।

—আমিও বুঝতে পারছি! প্লেটের ওপরে ঠং করে চামচ্‌টা ফেলে দিয়ে, দিব্যেন্দু চেয়ারে হেলে পড়ল।

অঞ্জলিও সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি বুঝতে পারছেন?

—ধন্যবাদ! দিব্যেন্দু আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে ভোজ দেওয়ার মতো বোকামী আমি আর কখনও করবো না। কথাটা বিশ্বাস করবেন।

—আমি তাই বললাম? ওঃ মাগো—বলে অঞ্জলিও উঠে দাঁড়াল। তারপর কি করবে, যেন বুঝতে না পেরেই, দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে, একেবারে রাস্তায়!

কিন্তু, ফুটপাথ ধরে কয়েক পা এগোবার পরই থামতে হলো তাকে! ভ্যানিটি ব্যাগটা টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে; না আনলে, হেঁটে বাড়ি ফিরতে তো হবেই, আরও অনেক রকমের অসুবিধায় পড়তে হবে।

—আরও একটু এগিয়ে চলুন! পিছন থেকে দিব্যেন্দু বলল।

অঞ্জলি মুখ তুলল না, নড়লও না, আরও যেন স্থির হয়ে দাঁড়াল!

—হোটেলের বয়গুলো উঁকি মারছে। দিব্যেন্দু আবার বলল, আরও একটু এগিয়ে চলুন।

অঞ্জলি তবুও কথা শুনল না। অগত্যা, দিব্যেন্দু এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

হঠাৎ নজরে পড়ল একটা বেবী ট্যাকসী খুব আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। সে হাঁক মারল, ট্যাকসী—

—থাক যথেষ্ট হয়েছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অঞ্জলি বলল, আমি একলাই যেতে পারবো।

—ভাল, এই নিন আপনার ভ্যানিটি ব্যাগ!

অঞ্জলি এতক্ষণ পরে মুখ তুলে তাকাল দিব্যেন্দুর দিকে। ওদিকে, ট্যাকসীটাও এসে থেমেছিল ফুটপাথ ঘেঁষে।

দিব্যেন্দু কোন কথা কইল না। অঞ্জলির পিঠে হাত দিয়ে সে আগে তুলে দিল তাকে গাড়ির মধ্যে। তারপর নিজেও উঠে পাশে বসল। বলল, রেড রোড ধরে দক্ষিণে চলো।

ট্যাকসী কার্জন পার্কের ধার দিয়ে পশ্চিমমুখো চলল। আরোহী দু'জন পাশাপাশি বসে রইল স্তব্ধ গম্ভীর মুখে।

রাস্তা ফাকা দেখে, ট্যাকসীটা সজোরে বেঁক্ নিল রেড রোডের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই, টাল সামলাতে না পেরে অঞ্জলি হুমড়ি খেয়ে পড়ল দিব্যেন্দুর গায়ের ওপর। এবং, তারপর—

আরম্ভ হলো এলোপাথাড়ী কিল-চড়-ঘুঁষি আর তার সঙ্গে কান্না চাপার আপ্রাণ চেষ্টা···কেন, কেন তুমি এমন করে বলবে? আমি কি করেছি তোমার···

বিভ্রান্ত দিব্যেন্দুর চমক ভাঙ্গে অবাঙ্গালী ট্যাকসী চালকের প্রশ্নে, কুচ গড়বড় হ্যায় বাবুজী?

—কুচ নেহি!

—মগর—বৃদ্ধ চালক আর কিছু বলল না; কিন্তু গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। অঞ্জলিও ভাল করে বসল সাবধান হয়ে।

কিন্তু, বিপদ হলো পরবর্তী চৌমাথার কাছে আসতেই। পাশের একটা ফুটবল ক্লাবের সবুজ-রঙা টেণ্টের ধারে মৃদু কদমে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একজন ফিরিঙ্গী সওয়ার সার্জেণ্ট; ট্যাকসীটা আচমকা তার সামনে এসে সজোরে ব্রেক্ কসল।

—এ কি? দিব্যেন্দু চীৎকার করে উঠল।

—গাড়ি বিগড়েছে বাবুজী, আপনাদের নেমে যেতে হবে।

—বটে? চালাকী মারবার আর জায়গা পাওনি?

—কি হয়েছে? গোলমাল শুনে জোর কদমে এগিয়ে এল সার্জেণ্ট। দিব্যেন্দু সক্রোধে তার নালিশ জানালো; কিন্তু, জবাবে,

বৃদ্ধ চালক যা বলল তা একেবারে আশাতীত। শুনেই, সার্জেণ্ট ঘোঁড়া থেকে নেমে গাড়ি ঘেঁষে দাঁড়াল।

—আপনি কে? গাড়ির মধ্যে অবনতমুখী অঞ্জলির দিকে চোখ রেখে সার্জেণ্ট বলল দিব্যেন্দুর উদ্দেশে, কোথা থেকে আসছেন? যাবেন কোথায়? আপনার সঙ্গিনীর পরিচয় কি?

দিব্যেন্দুর গলা শুখিয়ে গিয়েছিল। ঢোক গিলে সে বলল, আমি···আমিও জানতে চাই, আমার মতো একজন বৈধ নাগরিককে কতখানি জ্বালাতন করবার অধিকার তোমাকে দিয়েছে—তোমাদের আইন?

—বলছি। তার আগে আমার কথার জবাব দাও!

—আগে আমার কথার জবাব দাও। দিব্যেন্দু সামলে নিয়ে বলল, দেখি তোমার নম্বর? এই ড্রাইভার, তোমারও লাইসেন্স বার করো, জলদি—

—ওয়েল বাবু! সার্জেণ্ট নরম গলায় বলল, আমার কথার জবাব না দিলে তোমাকে ফাঁড়িতে যেতে হবে যে! তার চাইতে—

—বেশ বেশ, চলো, তোমার ফাড়িতেই চলো। দিব্যেন্দু সগর্জনে বলল, আমিও দেখতে চাই তোমাদের দৌড় কতো।—চলো ওঠো এই গাড়িতেই।

সার্জেণ্ট কিন্তু গাড়িতে উঠল না। ঘুরে গিয়ে অঞ্জলির কাছে দাঁড়াল। তারপর সবিনয়ে বলল, মাননীয়া মহাশয়া, আপনি দয়া করে বলবেন কি—ওই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?

—উনি আমার স্বামী! আরক্ত চোখে, নির্বিকারভাবেই কথাগুলো উচ্চারণ করল অঞ্জলি।

—আমি দুঃখিত। সার্জেণ্ট ঘুরে এসে, লজ্জিত মুখে জড়িয়ে ধরল দিব্যেন্দুর হাত দুটো। বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি কিছু মনে করো না। অসংখ্য বদমাইশ লোকের জন্যে, দু' একজন ভদ্র ব্যক্তিকেও মাঝে মাঝে অসুবিধায় পড়তে হয়। প্লিজ্ ফরগেট্

এ্যাণ্ড ফরগিভ। এবার আপনারা সুস্থ-মনে ফিরে যান। এই ড্রাইভার—

দিব্যেন্দুর মাথার মধ্যে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল; আর একটা কথাও বেরুল না তার মুখ দিয়ে। সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল—অঞ্জলির দিকে নয়, সার্জেণ্টের দিকে।

কিন্তু, সেল্ফ স্টার্টার গর্জে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলি চট করে দরজা খুলে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

—কি ব্যাপার? সার্জেণ্ট সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—ধন্যবাদ! অঞ্জলি বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল, ট্যাকসী চড়বার ইচ্ছে আর আমাদের নেই। শুনছো, নেমে এসো মিটিয়ে দাও ও লোকটার ভাড়া।

দিব্যেন্দু সুবোধ বালকের মতোই নেমে এল গাড়ি থেকে। তারপর, মনি ব্যাগ বার করল পাঞ্জাবীর পকেট থেকে, টাকা বার করবার জন্যে।

—এক মিনিট প্লিজ্! সার্জেণ্ট বাধা দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি পরিস্থিতিটা। অত্যন্ত স্বাভাবিক, আপনাদের এই অসন্তুষ্টি। কিন্তু, দয়া করে আমাকে ব্যবস্থা করতে দিন। এই ড্রাইভার, জলদি দুসরা ট্যাকসী বোলাও—বহুৎ জলদি।

বৃদ্ধ চালক তৎক্ষণাৎ চলে গেল গাড়ি নিয়ে। তখন, সার্জেণ্ট পকেট থেকে সিগারেট বার করে দিব্যেন্দুর দিকে এগিয়ে ধরল।

দিব্যেন্দু পূর্বের মতোই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, কথা কইতে পারল না। তখন অঞ্জলিই বলল, ধন্যবাদ, ও ধূমপান করে না।

—দুঃখিত। প্যাকেটটা পকেটস্থ করে সার্জেণ্ট তখন অন্য কথা পাড়ল। বলল, আপনারা শান্তিপ্রিয় নাগরিক—আপনাদের জানবার কথা নয়; পাবলিক সারভেণ্ট হিসাবে, আমাদেরকে যে কি পরিমাণ

নোংরা ঘেঁটে বেড়াতে হয় রোজ রাত্রে, তা জানেন একমাত্র ভগবান! সেই যুদ্ধের সময় থেকে, এই মাঠে-ময়দানের আঁধারে-আবডালে, প্রতি রাত্রে, কত যে অবৈধ কাণ্ড কারখানা ঘটে চলেছে, তা দেখে-শুনে, আপনারা তো দূরের কথা, আমরাই তাজ্জব বনে যাই মাঝে মাঝে। যুদ্ধের সময়, তবু একটা স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পেতাম আমরা। কিন্তু, এই শান্তির সময়, প্রতি রাত্রে, যাদেরকে আমরা ফাঁড়িতে সোপার্দ করি, তাদের কেউই তো সুদীর্ঘকালের জন্যে দেশছাড়া ঘরছাড়া সৈন্যবাহিনীর কেউ নয়!

পরের পর দু'খানা ট্যাকসী এসে থামল। নতুন ট্যাকসীতে স্বামী-স্ত্রীকে তুলে দিয়ে, সার্জেণ্ট স্মিতমুখে শুভরাত্রি কামনা করল। অঞ্জলির উদ্দেশে বলল, আপনার স্বামী সম্ভবতঃ এখনও শান্ত হতে পারেন নি: ওঁকে প্রসন্ন করবার ভার আপনার ওপর দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হলাম কিন্তু! শুভরাত্রি—

—শুভরাত্রি! অঞ্জলি হাসিমুখেই বলল।

তারপর—

দুটি প্রাণীর প্রাণস্পন্দন সীমিত হয়ে রইল কেবলমাত্র তাদের বিস্ফারিত আঁখির বিমূঢ় দৃষ্টির মধ্যেই। উদ্বেলিত হৃদয়ের অত্যুগ্র বাসনা বিফল হলো বিকল দেহযন্ত্রের গভীরে। কত কথা ছিল বলবার—কত কিছু ছিল জানবার। অথচ—

মরুভূমির চোরাবালিকে সর্বস্ব গ্রাস করবার অধিকার দিয়ে, দুজনেই যেন নির্বিকার নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করতে লাগল চরম ক্ষণটির জন্য।

—শুনছেন, বাড়ি এসে গেছে। শেষ পর্যন্ত অঞ্জলিই সচেতন করল দিব্যেন্দুকে।

সদরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল প্রফুল্ল আর অজয়। দেখে, দিব্যেন্দু মুখ নীচু করে অঞ্জলির পেছন পেছন বাড়ি ঢুকল।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল উকীল-গিন্নী আর নীলিমা।

দেখে, দিব্যেন্দু অঞ্জলির পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেল তেতলায়।

তারপর—

ঘরে ঢুকে সামনের আয়নায় নিজের মুখখানা দেখেই চমকে উঠল সে।

এ কোন রসাতলের পথে এগিয়ে চলেছে সে !

বুদ্ধিজীবীর অস্থির মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবিম্বেও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সঙ্গে সঙ্গে। নিজের সুদীর্ঘ ঋজু দেহ, সুগঠিত মাংসপেশী আর প্যারালাল বারের দাক্ষিণ্যে কৌশলে অর্জিত অতি-আকর্ষণীয়, অতিরিক্ত স্ফীত বক্ষঃদেশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে যেন আবার ফিরে পায় নিজেকে ! বিবর্ণ মুখ আরক্ত হয় ! নতুন করে মনে পড়ে যায়—সে শরৎ সামাধ্যায়ীর সন্তান, ঠাকুর বাবার বংশধর—

তার মতো লোককেও মেনে নিতে হবে মিথ্যাচারের এই কুৎসিত কৌশল ? নাহলে, তার বাঁচবার অধিকার থাকবে না আজকেকার এই স্বাধীন দুনিয়ায়। দিব্যেন্দুর মাথার ভেতরটা যেন ঝাঁঝাঁ করে ওঠে।

সার্জেনটা সত্যিই যদি ওদেরকে ফাঁড়িতে নিয়ে যেতো, তাহলে কি হতে পারতো ? তার তরফে তো কোন অন্যায় ছিল না। সে তো কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না ! তবে ? প্রতিবাদীদের তরফে সত্যিই যদি কোন গলদ না থাকে, তাহলে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বিপদ এড়াবার প্রশ্ন ওঠে কেন ? একজন শিক্ষিতা সাবালিকা ভদ্রমহিলার সঙ্গে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের বন্ধুত্ব থাকাটা, আজকেকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্যায় বা অবৈধ তো নয় ! তবে কেন অঞ্জলি অমন একটা সাংঘাতিক মিথ্যা কথা বলতে গেল ?

সমাজের ভয়ে ? কিন্তু, স্বাধীন ভারতের মনুষ্য-সমাজ তো রাষ্ট্র-

কবলিত। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের কোন ধারা তো তারা অমান্য করেনি। তবে?

লোকলজ্জার আশঙ্কায়? কিন্তু, আজ এমন লোক কেউ আছেন নাকি এদেশে, যাঁর চরিত্রের মহিমায় প্রভাবান্বিত হতে পারে কোন বর্তমানী?

বিশেষতঃ, যে মেয়ে একদিন শশী শাস্ত্রীর মতো বাপকেও অবজ্ঞা করেছিল, অবিশ্বাস করেছিল তাঁর পিতৃস্নেহের আন্তরিকতায়, অশ্রদ্ধা জানিয়েছিল শরৎ সামাধ্যায়ীর মতো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকেও, অন্নদাতা পিতার মুখে চূণকালি মাখাতে সাহস করেছিল, আইন-স্রষ্টা রাষ্ট্র-পিতাদের ভরসায়,—সে হঠাৎ ভয় পেয়ে মিথ্যা বলতে গেল কিসের ভয়ে?

হুজ্জুতিতে পড়বার ভয়ে? কিন্তু, যে মেয়ে একদিন ব্রাহ্মণ সামাধ্যায়ীর সন্তানকে বিবাহ করবার ভয়ে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বিভূতিকে স্বামীত্বে বরণ করেছিল হরেক রকম হুজ্জুতিকে তুচ্ছ করে,—সে সাহসিনীর তো থানা-পুলিশের সামান্য হুজ্জুতিতে ভয় পাবার কথা নয়!

তবে কি?

দিব্যেন্দু ব্যতিব্যস্ত হয়ে কলঘরে ছুটে যায়। থাবড়ে থাবড়ে জল দেয় ঘাড়ে, মাথায়। তারপর, ক্রমাগত মাথা মোছে গামছা দিয়ে, আর পায়চারী করে ছাদের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত। ভাবে—

যে মেয়ে একদিন বিভূতির মতো একটা লোককে বিবাহ করেছিল ভালবেসে, সে শরৎ সামাধ্যায়ীর ছেলেকে স্বামী বলে পরিচয় দেবার সাহস পায় কোথা থেকে? হোক হুজ্জুতি এড়াবার মিথ্যা অজুহাত; কিন্তু, এ স্পর্ধা তার হলো কি করে? অঞ্জলির মতো একটা কুল-ত্যাগিনী মেয়ে—কোন বুদ্ধিতে, কিসের জোরে, দিব্যেন্দুর মতো লোককেও অপমান করতে সাহস করে? বলতে পারে—মূর্খে ভোজ দেয়, বুদ্ধিমানে খায়?

—কি হয়েছে বলুন তো ?

দিব্যেন্দু চমকে উঠল, দরজায় বাইরে নীলিমাকে দেখে।

—কেমন আছেন বিভূতিবাবু ? নীলিমা আবার জিজ্ঞাসা করল !

দিব্যেন্দু মুখ তুলল কিন্তু খুলতে পারল না !

নীলিমা আবার বলল, ভয় পাবার মতো কিছু হয়েছে নাকি ?

দিব্যেন্দু এবার কথা কইতে পারল। আড়ষ্টভাবে বলল, আজ তো ঠিক বলতে পারছি না।

দিব্যেন্দুর ভাব-ভঙ্গি দেখে নীলিমাও যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। বলল, আপনি তাহলে একবার নীচে চলুন। ভাল করে বুঝিয়ে বলুন অঞ্জলিকে। বেচারা বোধহয় বড্ড কাঁদছে !

—কাঁদছে ?

—তাইতো মনে হলো। নীলিমা বলল, আপনি যে রকম গম্ভীরভাবে ওপরে উঠে এলেন ; আর, ও যেভাবে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করল ; আমার কেমন যেন ভাল লাগল না। দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকলুম ; কিন্তু, সাড়া পেলাম না। হয়তো কান্না চাপছে।

দিব্যেন্দুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। গলা ঝেড়ে বলল, কিন্তু, কান্নাকাটি করবার মতো তো কিছু হয় নি।

—তা না হোক ! নীলিমা যেন একটু হাসল। বলল, সকলেই তো আর আপনার মতো ডাক্তার নয়। ও বোধহয় বড্ড ভয় পেয়েছে। আপনি একটু ভরসা দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন চলুন।

—চলুন ! দিব্যেন্দু উঠে পড়ল। কিন্তু, কি সম্বন্ধে কি বুঝিয়ে বলবে সে—কাকে ? কথাটা মনে হতেই সমস্ত শরীরটা যেন তার থর থর করে কেঁপে উঠল। বিন্‌বিন্ করে ঘাম বেরুতে লাগল প্রতিটি রোমকূপ থেকে।

—ওকি ! দিব্যেন্দুকে একতলার সিঁড়ি ধরতে দেখে নীলিমা সবিস্ময়ে বলল, আবার চললেন কোথায় ?

—চট্ করে একবার জেনে আসি, ফোন করে। বলে দিব্যেন্দু নেমে গেল।

মোড়ের মিত্র ফার্মেসীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল তার, খরচা দিয়ে ফোন করবার। হাসপাতালের খবর পেতেও খুব বেশী অসুবিধা হলো না। যথাসময় অপারেশান হয়ে গেছে। রোগী বেশ ভাল ভাবেই স্ট্যাণ্ড করেছে অপারেশান। শুনে, মনের মধ্যে যে গ্লানিটা জমে উঠেছিল, সেটা যেন একটু কমল। আস্বস্ত হয়েই বাড়ি ফিরল সে!

ইতিমধ্যে অঞ্জলি দরজা খুলেছিল এবং নীলিমা, অজয় ও স-কন্যা উকীল গিন্নী প্রমুখ প্রতিবেশীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অধোমুখে বসেছিল নীরবে। দেখে, দিব্যেন্দু আর ঘরে ঢুকল না ; বাইরে থেকেই বক্তব্য জানিয়ে চ৮ে: গেল—চিন্তা করবার কিছু নেই ; বিভূতিবাবু বেশ ভালই আছেন।

আজও মেহন্নৎ করা হলো না। বিরক্তিভরে শয্যা ত্যাগ করতে গিয়েই হঠাৎ নজর পড়ল সাত নম্বরের দিকে। পাশের খোলা জানলাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, অঞ্জলি স্নান সেরে, ভিজে জামা-কাপড়গুলো মেলে দিচ্ছে নিজেরই ঘরের সুমুখে, বারান্দার রেলিং-এ। দেখে, দিব্যেন্দুর বুকখানা ধড়াস্ করে উঠল।

তবে কি অঞ্জলি সচেতন হয়েছে! ঘনিষ্ঠতার পরিণাম ভেবে সত্যিই কি সাবধান হলো সে এতদিন পরে! নাহলে, ছাদে আসা বন্ধ করবে কেন ? ভাবতে ভাবতে, বুকখানা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায় হঠাৎ। কিছুক্ষণ নীরবেই বসে থাকে দিব্যেন্দু, অসহায়ের মতো। তারপর, একসময় জোর করে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে।

কি যেন কি একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছিল তার জীবনে ; তা থেকে অকস্মাৎ আশাতীতভাবে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারটা, তাকে যেন কিছুতেই সহজ স্বাভাবিক করে তুলতে পারছিল না। কেমন যেন

রেগে যাচ্ছিল মনে মনে—কার ওপর কে জানে! কাজ-কর্ম সব চুলোয় গেল; জলযোগান্তে তাকিয়ার ওপর আড় হয়ে পড়ল সে খবরের কাগজ নিয়ে।

প্রথমেই দেখে নিল, তার ওষুধের বিজ্ঞাপনগুলো যথাযথভাবে পরিবেশিত হয়েছে কি না। তারপর নজর দিল, শেয়ার বাজারের পাতায়। অতঃপর লক্ষ্য করল, বড় হেডিং-এর খবর। কিন্তু,—

মাঝপথেই, মাঝারি আকারের একটা হেডিং-এ নজর আটকে গেল তার। পড়তে আরম্ভ করল, মেনকা দাসী বনাম পুলিশের মামলার বিবরণী। দেখল, সওয়াল-জবাবের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছুই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। মেনকা দাসীর নগদ সঞ্চয়ের পরিমাণ নাকি পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশী। অনেক টাকা আয়-কর দেন তিনি। তিনিই খরচ জোগাচ্ছেন এ মামলার এবং তদ্বিরকারী অনাদি মুকুজ্জে হচ্ছে তাঁরই নাত-জামাই। মেনকা দাসীর বড় মেয়ে মৃতা জ্ঞানদা দাসীর একমাত্র সন্তান রানীবালাকে নাকি বিয়ে করেছে অনাদি মুকুজ্জে।

একটু গুছিয়ে বসল দিব্যেন্দু। দেখল, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও বেরিয়ে পড়েছে। সওয়ালের জবাবে মেনকা দাসী প্রকাশ করেছেন, হনুমান হাউসের বর্তমান মালিকের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কটা হচ্ছে শাশুড়ী জামাইয়ের। তবে, মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই।

—কেন?

—সে মেয়ে এখন ভদ্র গেরস্থ হয়ে গেছে। ঘেন্না করতে শিখেছে মা-মাসীকে। আর···মা-মরা বোনঝিটাকে বঞ্চিত করে, সর্বস্ব গ্রাস করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করছে ওই ভগবান মুখপোড়ার সঙ্গে।

পয়েন্ট অফ অর্ডার ওঠে। তারপর, আবার আরম্ভ হয় সওয়াল-জবাব: গত পয়লা মে তারিখের পর, ওই মেয়েই তো ভয় পাইয়ে

দিয়েছিল মাকে। সে-ই তো তাড়াতাড়ি বাড়িগুলো বিক্রী করিয়ে দিলে ভগবানদাসকে—সিকির সিকি দামে। এখন, মতলব করেছে, নগদ টাকাগুলোও বাগিয়ে নেবার। হারামজাদী বলে, নগদ টাকা ফেলে না রেখে ভগবানের শেয়ার কেনো। আমি রাজি না হওয়াতেই তো ওই দারোগা মুখপোড়াকে টাকা খাইয়ে লেলিয়ে দিয়েছিল সেদিন !

আবার পয়েন্ট অফ অর্ডার ওঠে। হাকিম মামলা মুলতুবী রাখেন।

কিন্তু, অঞ্জলির আক্কেল কি? দিব্যেন্দুর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দেবার মতো বিবেচনা রাখে, অথচ হাসপাতালবাসী স্বামীকে একদিনও দেখতে যাবার বুদ্ধি হলো না! শুনলে, লোকে বলবে কি? এখনকার ব্যাপারটা আর আগেকার মতো নেই। বর্তমান প্রতিবেশীরা শিখ নয়, বাঙ্গালী। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে, সকলেই প্রায় এক-আধবার খবর নিয়ে এসেছে বিভূতির। অথচ, খোদ সহধর্মিণী একদিনও হাসপাতাল মাড়াল না! গতকাল, উকীলগিন্নী তো রীতিমত মুস্কিলেই ফেলে দিয়েছিল তাকে !

—কি ব্যাপার বলুন তো ভাই ঠাকুর-পো? এ্যাদ্দিন আসছি, অথচ, অঞ্জলিকে তো একদিনও আসতে দেখলাম না !

দিব্যেন্দুর গলা শুখিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু, সামলা নিয়েছিল বিভূতি। বলেছিল, তার পক্ষে তো বিকেলে আসা সম্ভব নয়। অফিস থেকে বেরিয়ে, আবার কমার্স কলেজে যেতে হয় যে! সে অন্য সময় আসে !

ভাগ্যিস! বিভূতির বুদ্ধির তারিফ করেছিল দিব্যেন্দু! একলা পেয়ে বলেছিল, ভাগ্যিস! আমি তো ভেবেছিলাম, আপনিও সামলাতে পারবেন না, মনের দুঃখুটা প্রকাশ করে ফেলবেন !

বিভূতি সংক্ষেপে বলেছিল, আপনি আমার বড় ভাইয়ের মতো! আশীর্বাদ করুন, দুঃখু করবার মতো দুর্বুদ্ধি আর যেন আমার না হয় !

বিভূতি-চরিত্রের পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে দিব্যেন্দু। বুঝতে পারে তার নিগূঢ় কারণটাও। কিন্তু, ভেবে পায় না অঞ্জলির বুকখানা কি ধাতু দিয়ে গড়া! সেদিন, এই মেয়েটারই ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে সে—ঠাকুরবাবার ছেলে—একটা নির্জলা মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। সার্জেণ্টের কবল থেকে মুক্তি পেয়েও, বাড়ির লোকের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল আর একটু হলে; যদি না, নীলিমা ভুল বুঝে অন্য সন্দেহ করতো। কিন্তু—

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে দিব্যেন্দুর। ভীষণ ইচ্ছে করে, অঞ্জলিকে ডেকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু, কিছুতেই পেরে ওঠে না। যে মানুষ, এতদিনকার এত কিছু ভুলে গিয়ে, এখন তাকে এড়িয়ে চলতে চায় সর্বতোভাবে, তার সঙ্গে উপযাচক হয়ে কথা কইতে কেমন যেন রাগ হয়ে যায় তার। অথচ, অস্থির হয়ে ওঠে, কি করবে ভেবে না পেয়ে। শেষ পর্যন্ত—

একটা অজুহাত পায় সে বৈজুর কল্যাণে। ছোট্ট একটা বাহারে বোতল হাতে করে, ল্যাবরেটারীতে ঢোকে বৈজু। বলে, কারখানা থেকে এই এ্যাসিডটা পাঠিয়ে দিয়েছে। কোথায় রাখবো?

—এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি তুই? দিব্যেন্দু খিঁচিয়ে ওঠে!

—বম্বেতে। এটা কোথায় রাখবো?

—ওই আলমারীটার মাথায় রাখ। দিব্যেন্দু বিরক্ত হয়ে বলে, বম্বে গিয়েছিলি তো আমাকে বলে গেলি না কেন? আমি এদিকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি সেই সারেঙ্গার ফরমটার জন্যে!

—ফরম? বোতলটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে, বৈজু বেশ একটু আশ্চর্য হয়েই ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, সে ফরম তোকে দেয় নি?

—কে দেবে?

—তোর বন্ধুনী? আমি তো পরের দিনই ফরম সই করিয়ে দিয়ে গিয়েছি তোর বন্ধুনীর হাতে। তুই তখন বাড়ি ছিলি না।

তাই, কর্তার সারেণ্ডার গিন্নীকেই দিয়ে গিয়েছিলাম! তোকে কিছু বলে নি? কী রকম মেয়েমানুষ রে বাবা!

—ওঃ তাই! ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দিব্যেন্দু সামলে নেয়। বলে, ওঃ তাহলে ঠিক আছে।

—মামা তোকে ডেকেছে পার্ক স্ট্রীটে। বৈজু প্রস্থানোদ্যত হয়ে বলে, বিশেষ দরকার, আজই সন্ধ্যের পর যাস্।

—যাব। কিন্তু, তুই এরই মধ্যে চললি যে? কাজের লোক হয়ে উঠছিস নাকি?

—কাজের লোক নয়, চরিত্রবান হচ্ছি!

—চরিত্রবান হচ্ছিস? সে কি রে?

—আর সেকি! সজোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বৈজু বলল, মামার মতলব! সেদিন চালান দিলে বম্বেতে। ফিরতে না ফিরতেই আজ আবার চালান দিচ্ছে জলপাইগুড়িতে—আচমকা ভিজিট করে রেডি স্টকের লিস্ট নিয়ে আসবার জন্যে। বদমাইসী করবার ফুরসুৎ কোথায় আমার! চললাম—

—আঃ, দাঁড়া না একটু! বাধা দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, তোকে যে একটা বাড়ি খুঁজতে বলেছিলাম?

—শুনছিস্ ফুরসুৎ নেই আমার। ওটা তুই-ই খুঁজে নিস্, তোর ফুরসুৎ হলে। বলে, বৈজু সত্যিই চলে গেল!

বৈজুর ফুরসুৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না দিব্যেন্দুর। সে সঙ্গে সঙ্গেই দোতলায় নামল এবং কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সটান গিয়ে ঢুকল অঞ্জলির ঘরে।

দরজাটা ভেজান ছিল। ভেতরে কাপড় বদলাচ্ছিল অঞ্জলি অফিস যাবার জন্যে। দেখেই, প্রস্থানোদ্যত হলো দিব্যেন্দু। কোন রকমে বলে এল, একটা দরকার ছিল……আচ্ছা, পরে হবে'খন।

আবার ল্যাবরেটারীতে এসেই ঢুকল দিব্যেন্দু। কিন্তু, এবার বসে পড়ল সে। চেষ্টা করেও ভুলতে পারছিল না, অঞ্জলির সন্ত দেখে আসা চেহারাখানা।

মিনিট পাঁচেক পরে অঞ্জলি এল অফিসের পোশাক পরে। মুখে বিচিত্র হাসির সুস্পষ্ট আভাষ। কিন্তু, চুপ করেই রইল সে।

দিব্যেন্দুও চট্ করে ভেবে পেল না, কি ভাবে কথাটা পাড়বে। অন্যদিকে তাকিয়ে অজুহাত হাতড়াতে লাগল।

—তবু ভাল যে বীরপুরুষের ভয়টা একটু কমেছে! শেষ পর্যন্ত অঞ্জলিই বলল।

—ভয়? দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, ভয় কিসের?

—থাক্, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা দিতে হবে না।

অঞ্জলি ভুরু বেঁকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, এখন বলুন, এতদিন পরে আবার আমাকে দরকার পড়ল কেন?

কথা বলার ভঙ্গিটা একেবারেই ভাল লাগল না দিব্যেন্দুর। তাই সে-ও আর কথা বাড়াল না, কাজের কথা পাড়ল। বলল, বৈজু আপনাকে একটা ফরম দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু, আপনি তো সেটা আমাকে দেন নি!

অঞ্জলির গাম্ভীর্যটা যেন আরও বেড়ে গেল। বলল, সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি নর্দামায়।

—এ্যাঁ?

—হ্যাঁ। আমি যখন উপোস করছিলাম, তখন তো কই ও ফরমের কথা মনে পড়েনি আপনাদের! আজ হঠাৎ ফরম বেরুল কেন? আমি রোজগার করছি বলে?

দিব্যেন্দু হাঁ করে চেয়েই রইল। অঞ্জলির মতো মেয়ের গলা দিয়ে যে এ রকম কর্কশ আওয়াজ বেরুতে পারে, এ যেন সে ভাবতেই পারছিল না।

—আপনি কেবল বীরপুরুষই নন—মহাপুরুষ! অঞ্জলি যেন

আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। বলল, জিগ্যেস করি, একটা লোফারের জন্যে এত খরচ করে মরছেন কেন? কেন এত মাথাব্যথা আপনার ওই লোকটার জন্যে? কি ভেবেছেন আপনি? আমার উপকার করছেন?

—তাছাড়া আর কি! দিব্যেন্দু আড়ষ্ট গলায় বলল।

—আজ্ঞে না! আপনি আমার সর্বনাশ করছেন!

—সর্বনাশ করছি? আপনার? আমি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! কি সম্পর্ক আমার ওই লোকটার সঙ্গে? আজ বাদে কাল যাকে আমি ডিভোর্স করবো, তার জন্যে খরচ করে চলেছেন আপনি আমার ভালর জন্যে? বলিহারী বুদ্ধি বটে আপনার! বলে, অঞ্জলি অন্যমনস্কভাবেই হাত বাড়াল সেই বাহারে বোতলটার দিকে!

—হাঁ হাঁ হাঁ, হাত দেবেন না!

—কেন? অঞ্জলি থমকে গিয়ে বলল, কি আছে ওতে?

—এ্যাসিড। সাংঘাতিক এ্যাসিড।

—ওঃ! অঞ্জলি সরে গিয়ে বলল, যাকগে, এখন বুঝতে পারছেন আমার কথা? আমাকে যদি সত্যিই সুখী করতে চান, তাহলে, ও লোকটাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। বুঝতে পারলেন?

—এ সব কি বলছেন যা তা? দিব্যেন্দু অভিভূতর মতো বলল, ডিভোর্স করবেন কি—

—হ্যাঁ, আমি মনস্থির করেছি! অঞ্জলি গম্ভীরভাবেই বলল, কিছু খরচ-পত্র আছে, তাই অপেক্ষা করতে হবে দু' এক মাস।

—কি বলছেন যা তা! দিব্যেন্দু ব্যাপারটাকে তরল করবার উদ্দেশ্যে বলল, পাগলামী করবেন না। ডিভোর্স চাইলেই পাওয়া যায় না—

—যাবে। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। আপনার

জানবার কথা নয়; কিন্তু, আমার কাছে এমন প্রমাণ আছে, যার ওপর কোন আদালতের কোন কথা চলবে না! কিন্তু, দোহাই আপনার, আপনি আর আমার ভাল করবার চেষ্টা করবেন না, ওকে নিয়ে মাতামাতি করে।—বলে, অঞ্জলি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দিব্যেন্দু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে দিব্যেন্দু অনেকক্ষণ বসল বিভূতির কাছে; কিন্তু, ভাল করে কথা কইতে পারল না। কিছুতেই ভুলতে পারছিল না, অঞ্জলি তাকে কি সাংঘাতিক কথা বলেছে আজ সকালে।

ব্যাপারটা বিভূতিরও দৃষ্টি এড়াল না। হেসে জিজ্ঞাসা করল, দাদার মাথায় বুঝি নতুন ফরমুলা এসেছে? ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন যে!

—ফরমুলা নয়। দিব্যেন্দু গম্ভীর ভাবেই বলল, প্রবলেম্।

—প্রবলেম্? কার প্রবলেম্? আমার নাকি?

—তা বলতে পারেন।

—ব্যাপার কি দাদা? খুলেই বলুন না?

—আপনার সেই সারেঙার ফরমটা—রুগ্ন মানুষকে আঘাত দিতে প্রবৃত্তি হলো না দিব্যেন্দুর; কোন রকমে কেবলমাত্র ফরম সংক্রান্ত গণ্ডগোলের কথাটা বলল।

শুনে, বিভূতি কিন্তু আগেকার মতো মেজাজ খারাপ করল না; বরং একটু যেন হাসবার চেষ্টা করেই বলল, সব দিক বিবেচনা করে দেখলে, আপনি কিন্তু খুব বেশী দোষ দিতে পারেন না বেচারাকে!

বিভূতি অনুরোধ করছে দিব্যেন্দুকে, অঞ্জলির ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ না হতে।

—কিন্তু, এদিকের কি হবে? দিব্যেন্দুকে চিন্তা করবার অবসর না দিয়ে বিভূতি অন্য কথা পাড়ল। বলল, শুনছি, আর দিন সাতেক পরেই ছেড়ে দেবে আমায়। তখন আমি নিজে গিয়েই নিয়ে

আসবোধন সারেণ্ডারের পাওনাটা। কিন্তু, ইনজেকশান নেওয়ার কি হবে? দু বেলা দুটো করে নিতে হবে এক মাস। তারপর একটা করে মাস দেড়েক। কোন ডাক্তারকে দিয়ে নিতে গেলে ফিস দিতে হবে। তাতে অনেক খরচ পড়ে যাবে। তাই ভাবছিলাম, আপনাদের কারখানায় তো অনেক হাফ ডাক্তার রয়েছে; কারুর সঙ্গে ফুরণ করলে হয় না?

কথাগুলো খুব ভাল লাগল দিব্যেন্দুর; কিন্তু, প্রস্তাবটা সমর্থন করতে পারল না। বলল, ইনজেকশানগুলো ইনটার মাসকিউলার নয়, সাব কিউট্যানিয়াস। কোয়াক দিয়ে চলবে না।

—তাহলে তো অনেক খরচ পড়ে যাবে!

—চেষ্টা করতে হবে খরচ কমাবার। আমাদের গোল্ড মেডালিস্টকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

—সেটা কি উচিত হবে? বিভূতি একটু যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বলল, আমার রোগের রহস্যটা চাউর হয়ে যাবে না?

—না। দিব্যেন্দু ভরসা দিয়ে বলল, রোগীদের কথা গোপন রাখা ডাক্তারদের ধর্ম। আপনার ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হঠাৎ ঢং করে গং পড়ল হাসপাতালের। দিব্যেন্দু উঠে পড়ল।

সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটে যেতে হবে; কিন্তু, ভগবানদাদুর সন্ধ্যা হয় অনেক রাত্রিতে। অগত্যা, দিব্যেন্দু ময়দানে গিয়ে বসল মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে। সকালে, সে সাংঘাতিক সিদ্ধান্তর কথা অঞ্জলি তাকে জানিয়েছিল, সেটাকে তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের সাময়িক উত্তেজনা বলে উড়িয়ে দিতে পারছিল না সে। তার সন্দেহ হচ্ছিল, ইতিমধ্যে, নিশ্চয়ই উকীলের পরামর্শ গ্রহণ করেছে অঞ্জলি। কিংবা সেই অতসীদির মতো কারুর পাল্লায় পড়েছে। নাহলে, ডিক্রী পাওয়ার স্বপক্ষে অতখানি আত্মবিশ্বাস এল কি করে! কিন্তু, পরিণামে, দিব্যেন্দু কোন রকম ফ্যাসাদে পড়বে না তো?

অথচ, নিজের ভুলটাও···বুঝতে মন চায় না তার।

একদিন যার ঘরনী হতে ভয় পেয়েছিল অঞ্জলি ভুল বুঝে, আজ তাকেই তার ভাঙাঘর জোড়া দেবার চেষ্টায় তৎপর দেখে যদি আত্মবিস্মৃত হয় সে, তাহলে দিব্যেন্দু কি করতে পারে?

কেউ যদি একটা ভুলের মাসুল জোগাতে গিয়ে আরও বেশী করে ভুল করতে আরম্ভ করে সেক্ষেত্রে দিব্যেন্দু কি করতে পারে! সে তো আজও খরচ করে চলেছে ওদেরই দাম্পত্য জীবনে শান্তি আনবার জন্যে!

একজনের পরোপকার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক কারণেই আর একজনের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু, সেই শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে যদি আরও কিছু মিশিয়ে ফেলে আর একজন, তাহলে, সেই পরোপকারী বেচারা অপরাধী হতে যাবে কোন যুক্তিতে!

একজনের বিলম্বিত নিদ্রা দেখে যদি আর একজনের চোখে জল আসে! যদি সে অফিস কামাই করে নতুন চাকরীর তোয়াক্কা না রেখে! যদি সে ভয় পেয়ে ভুলে যায় লোকলজ্জার ভয়—সকলের সামনেই প্রকাশ করে ফেলে উৎকণ্ঠা, তাহলে দিব্যেন্দু কি করতে পারে! তাকে বিশেষভাবে বিচলিত করে, সেদিনকার রেড্‌ রোডের ঘটনাটা। কিন্তু, এঁর মধ্যে তার অপরাধ কোথায়! এতাবৎকালের মধ্যে, সে তো কখনও লঙ্ঘন করেনি তার পৌরুষ-ধর্মের অনুশাসন—জ্ঞানতঃ। তবে?

এতদিনের এত দুর্বল মুহূর্তের মধ্যেও যে মেয়ে কখনও আত্ম-প্রকাশ করেনি! কি পাইনি, তার হিসাব মেলাবার দুঃখ ভুলেও কখন ভাষা পায়নি যার কণ্ঠে, হঠাৎ সে যদি আজ নীরব কণ্ঠকে সরব করে তোলে—বাকি-বকেয়ার জের মিটিয়ে দিয়ে নতুন জীবন যাপন করবার প্রলোভনে, তাহলে—

দার্শনিক পিতার বৈজ্ঞানিক পুত্র বিচলিতভাবে মাথা নাড়ে।

না না, সে পারবে না! হোক অকারণ, হোক অর্থহীন,

আজকের কারণে, গতকালের পরিচয়টাকে সে কলঙ্কিত করতে পারবে না। পারবে না, বিভূতিকে ত্যাগ করে অঞ্জলির প্রলোভনে ইন্ধন জোগাতে। কারুর কাছেই ছোট হতে পারবে না সে! ভোজের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে বরং মহামূর্খ সাজবে সে; কিন্তু,...ছিঃ

দিব্যেন্দু উঠে পড়ল। কিন্তু, মাথাটা ঠাণ্ডা হওয়ার পরিবর্তে আরও যেন গরম হয়ে উঠতে লাগল। অঞ্জলির সমস্যা তো ছিলই, তার ওপর আবার ভগবানবাবুর জন্ম-শাসনের আবদারটা তাকে যেন একেবারে পাগল করে দেবার উপক্রম করছিল। মুক্তি পাওয়ার বুদ্ধি নয়, সমস্যারও সমাধান নয়, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল সে সংযম হারাবার আশঙ্কায়। অঞ্জলির জন্য বাড়ি বদলালে খরচ বাড়বে। ভগবান-বাবুকে সাফ জবাব দিলে উপার্জন কমবে। ভবিষ্যতে নিজের কারখানা গড়ে তোলবার আশা তার কোনদিনই পূর্ণ হবে না। সুতরাং—

সেদিনকার মতোই গোলাপী পরিবেশে ভগবানবাবু আরাম করছিলেন। পার্থক্যের মধ্যে ভুরিভোজনের কোন আয়োজন ছিল না। চাট হিসাবে খান কয়েক ফাউল কাটলেট রাখা ছিল একটা ট্রের ওপর। তাই, ভাগ করে দিলেন দিব্যেন্দুকে।

—কি হে, অনেকদিন তো হয়ে গেল, মাথায় কিছু এলো? ভগবানবাবু মোলায়েম ভাবে কাজের কথা পাড়লেন।

—আসবে আসবে। অত ব্যস্ত হলে কি চলে?

—ব্যস্ত হই কি আর সাধে রে ভাই! শ্মশান-বৈরাগীর মতো উদাসভাবে তাকিয়ে ভগবানবাবু বললেন, আমি যদি তোমার মতো অসংসারী একলা মানুষ হতে পারতাম, তাহলে কি আর ব্যস্ত হতাম! তাহলে, তোমারই মতো রয়ে বসে দিন কাটিয়ে দিতাম স্বপ্ন দেখে দেখে! কিন্তু, বিপদ বাধিয়েছে যে মাথাখানা! জেগে ঘুমোতে যে

কিছুতেই পারি না। যাকগে, আর মাসখানেকের মধ্যে দিতে পারবে তো ?

—বোধহয়।

—হুঁ! ভগবানবাবু চোখ বুজলেন। মিনিট দুয়েক সেইভাবেই কেটে গেল! তারপর, হঠাৎ খুব গম্ভীরভাবে ডাকলেন, দিব্যেন্দু ?

—আজ্ঞে ?

—তুমি কি বেকার ?

—আজ্ঞে না। দিব্যেন্দু ঘাবড়ে গেল।

—তবে কি কোন বেয়াড়া রকমের ব্যাধিগ্রস্ত ?

—নিশ্চয়ই না।

—তাহলে এত বয়স পর্যন্ত বিয়ে করো নি কেন ?

দিব্যেন্দু জবাব দেবে কি, হাঁ করে চেয়েই রইল।

—কি হে ভড়কে গেলে নাকি ? ভগবানবাবু ঢুলু ঢুলু চক্ষে পিট-পিট করে তাকালেন। বললেন, আমিও ভড়কে গিয়েছিলাম চিঠিখানা পেয়ে,—এখন সামলে উঠেছি।

—কি চিঠি ? কার চিঠি ?

—পত্রাঘাত করেছেন রায়-বাঘিনী।

—রায়-বাঘিনী ?

—মানে, ঋষি রায়ের পরিবার গো। পত্রঘাত করেছেন আমাকে। ওফ, ঋষি শালা আচ্ছা খেল দেখালে বটে বুড়ো বয়সে। শালা একেবারে কমপাউণ্ড ইনটারেস্ট আদায় করে ছেড়েছে। ভগবানবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর দিব্যেন্দুর মুখের অবস্থা লক্ষ্য করে আবার আরম্ভ করলেন, তুমি তো আর জানো না সে সব কেচ্ছা! জানলে, আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেতো।

—কি হয়েছিল ? দিব্যেন্দু যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

—ঋষির বাবা—ভগবানবাবু বললেন, পরমেশ রায় অনেক খোঁজ করে ছেলের বৌ এনেছিলেন গরীব বামুন পণ্ডিতের ঘর থেকে।

বৌ-এর রূপ দেখিয়ে ছেলের মকারান্ত ব্যায়রাম ছাড়াবেন বলে। আশ্চর্য কাণ্ড হে! যে ঋষি একাসনে বসে দু' বোতল পার করে দিতো, সে কি না সত্যিই ভাল ছেলে হয়ে গেল বছর দুয়েকের মধ্যেই! ভাবতে পারো রায়-বাঘিনীর দাপটখানা? শেষ পর্যন্ত, আমাকেই কি না উপদেশ দিতে আরম্ভ করলে, বদ খেয়ালি ছেড়ে দিয়ে বরং বৌয়ের ভুঁড়ি কমাবার চেষ্টা কর। ওফ—

—কি আপদ! দিব্যেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, আসল ব্যাপারটা কি সেটা খুলে বলবেন তো?

—ওহো! ভগবানবাবু যেন একটু সচেতন হলেন। বললেন, ব্যাপার বড় সাংঘাতিক হে—

—মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে; কিন্তু, মায়ের বর পছন্দ আর কিছুতেই হয় না। ঋষি যত পাত্র যোগাড় করে আনে, রায়-বাঘিনী সব ছেঁটে দেয়। মেয়ের বয়স যখন চোদ্দ-পনেরো, তখন থেকে আরম্ভ হয়েছে। আর, এখন বোধহয় তার বয়স হলো তেইশ-চব্বিশ। জমীদার-বাচ্ছা মানেই হচ্ছে ঋষি রায়ের সংস্করণ। অতএব আউট অফ দি কোশ্চেন। বামুন-পণ্ডিতের ছেলে নিজে খেতে পায় না, বৌ-কে খাওয়াবে কি। সুতরাং···কেরানী, স্কুল মাস্টার, প্রফেসার, ব্যবসাদার ফড়ে,—সব অচল। তাদের দারিদ্র্য, বুদ্ধি-শুদ্ধি, সাহেবীয়ানা, মনোবৃত্তির সঙ্গে কি অমন লক্ষ্মী প্রতিমা মানিয়ে চলতে পারবে? গলায় দড়ি দেবে। ফলে, বছর দশেকের মধ্যে ডজন দশেক পার্টি রিজেকটেড হয়ে গেল।—ভগবানবাবু হঠাৎ থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ হে, তোমাদের সমাজে দো-পড়া ব্যাপারটা কি বলতো?

দিব্যেন্দু বুঝিয়ে দিল।

—তবেই বোঝ! মায়ের দাপটে মেয়েটা একবার দো-পড়াও হয়ে গেল। এর পর কি আর পৈত্রিক বাড়ীতে বসে মেয়ের সম্বন্ধ করা চলে! চেষ্টা চলতে লাগল অন্য জায়গা থেকে। শেষ পর্যন্ত, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ঋষি একটা পাত্র জুটিয়ে আনলে মাস তিনেক

পূর্বে। পাত্র সরকারী চাকরী করে। বিলেত ফেরৎ। অতএব কনফার্মড চরিত্রবান। বয়স পঁয়ত্রিশ। বিষয়-সম্পত্তি অবশ্য নেই ; কিন্তু, উপার্জন হাজার টাকার ওপর। সর্বোপরি, মাত্র হাজার পাঁচেক টাকার এগেনষ্টে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে একটা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা মেয়েকে। এ ছেলে কি অচল ? তুমিই বলো ?

—নিশ্চয়ই নয়।

—রায়-বাঘিনীও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন। অন্ততঃ তাই ভাবিয়েছিল তাঁর দেহের অবস্থা। মরে যাবার আগে যা হোক একটা হিল্লে করে যাবেন মেয়েটার। ফলে, দু' পক্ষের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। হবু-শাশুড়ী হবু-বৌ দেখেই পাঁজির খোঁজ করলেন। আশীর্বাদের দিনস্থির পর্যন্ত হয়ে গেল। কিন্তু—

—কি ? আবার ফেঁসে গেল নাকি ?

—না হলে, রায়-বাঘিনী আজ আমার তোয়াজ করে ! তুমি তো জান না, সে সব দিনের কথা। ওই বাঘিনী একদিন আমার মাথায় গোবর-গোলা জল ঢেলে দিয়েছিল। অপরাধ—আমিই নাকি ওঁর পতি-পরম-গরুটিকে উচ্ছন্নে দিচ্ছিলাম। অথচ, বুঝলে ভায়া, তোমার ভাবীও ঠিক ওই রকম ভাবতো ঋষিকে। কিন্তু, কখনও জল ঢালেনি মাথায়।

—আপনি আবার বে-লাইনে চলে যাচ্ছেন !—দিব্যেন্দু বলল, এবার কেন ভেস্তে গেল বিয়েটা, সেটা আগে বলুন ?

—ভেস্তে গেল, হবু বেয়ান ঠাকরণের জবর আক্কেলে ! রাজ-যোটকের কল্পনা করে তিনি এমন আত্মহারা হয়ে ছেলের গুণকীর্তন আরম্ভ করলেন যে—

—কি হলো ?

—আশীর্বাদ করতে এসে ঠাকরুণ বেশ দম্ভভরেই ছেলের বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে দিলেন। কেমন করে, কাকে ধরে, কি কায়দায় সে অমন একটা চাকরী বাগিয়েছে। নাহলে, বিলেত ফেরৎ তো

আজকাল ঘাটে-আঘাটায় গড়াচ্ছে! খোকা মাইনে তো পায় মাত্র শ'-চারেক, ডিয়ারনেস নিয়ে; কিন্তু, উপরির কল্যাণে, মাসিক উপার্জন তার হাজারের ওপর। চালাকী কথা? কিন্তু, রায়-বাঘিনী এক কোপেই সব সাফ করে ফেললেন। তাঁর কন্যা, অমুক পণ্ডিতের দৌহিত্রী, অমুক রাজার নাতির নাতনী হবে কি না একটা চোরের বৌ? আর সেই প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করেছে একটা চোরের মা চুন্নী? এতবড় স্পর্ধা? শ্বশুর বেঁচে থাকলে, আজ যে তোদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলতেন—গুম খুন করতেন —নিদেন পক্ষে, থামে বেঁধে চাবকে চামড়া উঠিয়ে দিতেন। অগত্যা, ঋষি রায় পালাল। পালাবার আগে হেঁকে বলে গেল গিন্নীকে, আমি যদি আর কখনও মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করি, তাহলে পরমেশ রায়ের ব্যাটা নই। মেয়ের মা যদি কখনও মেয়ের বিয়ে দিতে পারে, তবেই বাপ সংসারে ফিরবে। আদারওয়াইজ সম্পর্ক খতম। ঋষি শালা এখন অজ্ঞাত বাস করছে অর্জুনের মতো।

—এত কাণ্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে? দিব্যেন্দু সকৌতুকে বলল।

—কাণ্ড আরও গড়িয়েছে। পরমেশ রায় আলাদা করে হাজার পনের টাকা রেখে গিয়েছিলেন নাতনীর বিয়ের জন্যে। রায়-বাঘিনী হঠাৎ টের পেয়েছেন স্বামী দেবতাটি তাঁর মামলা মকর্দ্দমার পেছনে তার থ্রি-কোর্থ উড়িয়ে দিয়েছেন। ব্যাপারখানা বোঝ একবার।

—বুঝলাম! দিব্যেন্দু আন্দাজে ঢিল ছুড়ল। একটু হেসে বলল, তাই বুঝি তাঁর মনে পড়েছে, আমার মতো একটা পাত্রকে?

—ক্ষেপে গেলে নাকি হে? ভগবানবাবু আরক্ত চোখে তাকালেন। বললেন, ওঁরা উপযোচক হয়ে জামাই করতে চাইবেন তোমার মতো একটা আকাটকে? আশ্চর্য তোমার আশা তো?

দিব্যেন্দু একেবারে যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল!

ভগবানবাবু মিনিট খানেক সময় নিলেন শান্ত হতে। তারপর বললেন, রায়-গিন্নী আমাকে পত্র লিখে জানিয়েছেন, মেয়ের বাপ

যখন বিগড়েছে, তখন, পিতৃবন্ধুকেই দায়িত্ব নিতে হবে এ ব্যাপারে। তাঁর দেহের যা অবস্থা, তাতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ, এখন আমি যা করবো তাই হবে। বুঝলে ?

ভগবানবাবু আবার অন্যমনস্ক হলেন মিনিট খানেকের জন্য। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, কি হে, মুখখানা অমন শুখিয়ে গেল কেন ? অসুখ করলো নাকি হঠাৎ ?

—আজ্ঞে না তো !

—তবু ভাল ! এখন, যা জিজ্ঞাসা করবো তার সাফ জবাব দাও। ঋষির মেয়েকে বিয়ে করতে চাও ?

প্রস্তাবের অভিনবত্বে, দিব্যেন্দুর বুদ্ধি-বিবেচনা যেন লোপ পেয়ে গেল হঠাৎ। কথা বেরুল না গলা দিয়ে।

ভগবানবাবু তখন আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখ বাপু, তুমি যত বড় পণ্ডিতই হও না কেন, আমি তোমাকে চিনি। তোমার বাপ তোমাকে যে কি মাল বানিয়ে গেছেন, সে কথা তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। তাই তোমাকে এই শেষবারের মতো জানিয়ে দিচ্ছি. জীবনে সুযোগ আসে মাত্র এক-আধবার। এই মওকায় আমি তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারি। নাহলে, নিশ্চিত জেনো, তোমার দুঃখে একদিন শ্যাল-কুকুরেও কাঁদবে না। এখন বলো ?

কি বলবে দিব্যেন্দু ! সতীর মতো মেয়ে তার গৃহলক্ষ্মী হবে— এও কি সম্ভব !

ভগবানবাবু আবার আরম্ভ করলেন, তুমি যে কোন ঝাড়ের বাঁশ, আমি তা হাড়ে হাড়ে জানি। আরও ভাল করে জানি ঋষিদের বংশ পরিচয়। তোমার মতো একটা গোঁয়ারের বরাতে সত্যিই যদি সতীর মতো একটা বৌ জোটে, তাহলে জেনো, পূর্ব-জন্মে তোমার অনেক সুকৃতি ছিল। এখন বলো, ফুলে ফুলে মধু লুটবে না—

—কিন্তু! দিব্যেন্দু গুনগুন করে বলল, আমার যে আবার একটু বদনাম রটে গেছে। সতীর মতো মেয়ে কি আমাকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন?

—না। ভগবানবাবু গলা ঝেড়ে বললেন, ও সব কেতাবী কাব্যি কথার মানে ওদের মতো গেঁইয়া মেয়েরা জানে না। জানতে চাইবে না কোনদিন। তবে এটা জানি, যে বাঘিনী একদিন ঋষির মতো শিশুপালকে ভেড়া বানিয়েছিল, তার বাচ্ছার পক্ষে, তোমার মতো খিনি কেষ্টকে টিট করতে বেশী সময় লাগবে না। এখন সাফ জবাব দাও, আমার কথা শুনে চলবে কি না?

—কবে আবার আপনার কথা শুনিনি আমি? দিব্যেন্দু যেন একটু রেগে গিয়েই বলল।

—তাই নাকি। ভগবানবাবু তাকিয়ার ওপর হেলে পড়লেন। বললেন, তাহলে দেখা যাক, তোমাকে ঝোলানো যায় কি না। তবে—

—আবার কি? দিব্যেন্দু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

—ঋষি শালা না আবার বাগড়া দেয়! ও আবার তোমার ওপর চটা কি না।

দিব্যেন্দুর বুকখানা ধড়াস করে ওঠে। বলে, উনি আমার ওপর চটা নাকি?

—ভীষণ। ঋষির ধারণা, যারা লীগ্যাল রাস্তায়, প্রকাশ্যে চরিত্র নষ্ট করে, তারা একদিন ভাল হলেও হতে পারে। কিন্তু, যারা চরিত্রবান সেজে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে, তারা চিরকালই ক্রিমিন্যাল থেকে যায়।

—তাহলে কি হবে?

—কি আবার হবে! ভগবানবাবু ব্যাজার হয়ে বললেন, তুমি কি বলতে চাও, আমি লোকটা ঋষির চাইতেও গাধা? যাও যাও, বাড়ি গিয়ে ঘুমোও গে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে।

দিব্যেন্দু কিন্তু উঠতে পারে না। আরও কিছু শোনবার প্রত্যাশা করে।

—কি হে জমে গেলে নাকি? ভগবানবাবু ভ্রূকুটি করে বললেন, এখানেই রাত কাটাতে চাও নাকি?

—কি যা তা বলছেন! দিব্যেন্দু লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলতে বলতে গেল, মদের সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানটাও গিলে খেয়েছেন!

সেদিন সারারাত জেগে স্বপ্ন দেখল দিব্যেন্দু: একদিনের দেখা—একটিও কথা-না-বলা একটা ছোট্ট মানুষকে নিয়ে যত রকম ভাবে স্বর্গ রচনা করা যেতে পারে, তার প্রস্তুতি চলতে থাকে তার মনের গহনে। ক্রমে, স্বল্প-পরিচিতা যেন চির-পরিচিতার রূপ পরিগ্রহ করে। রূপান্তরিত হয় তার কৌমার্যের গাম্ভীর্য, সদ্য-পরিণীতার সলজ্জ ভঙ্গিমায়—কল্পনার দর্পণে। নীরব সরব হয় না। কিন্তু হৃদয় নিঃসংশয় হয় তার সর্ব-সত্তার অনিন্দ্য রূপায়ণে। সেই প্রথম-প্রণয়-ভীতার নিরুদ্ধ কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় না কোন কালের কোন পরিকল্পিত ভাষা। কিন্তু, কল্পকালের শাশ্বত ভরসা যেন পরিস্ফুট হয় নতমুখীর আনত-দৃষ্টিতে।

ওগো বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক, পরিণামদর্শী গ্রন্থকীট—ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে, একান্তভাবে নির্ভর করো এই সনাতনী সেকালিনীর ওপর। বিনিময়ে, পূর্ণ হবে তোমার আজীবনের চরম চাওয়া। তোমার মনের শান্তি, বংশের গৌরব, কোনদিনও ব্যাহত হবে না কারুর শিক্ষা-দীক্ষা বা আত্মসম্মানের অহমিকায়।

তন্দ্রা আসে ভোরের হাওয়া গায়ে লাগতে। ঘুম ভাঙ্গে বেলা দশটার পর একটা অতি পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে, দাদা—

—একি! আজই ডিসচার্জ করে দিল নাকি?

—হ্যাঁ। কিন্তু, আপনার কি হয়েছে? এত বেলা পর্যন্ত—

—ও কিছু নয়। গিন্নীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—না। অফিসে চলে গেছে।

—বাহাদুর ! মেজাজী গলায় হুকুম করল দিব্যেন্দু—বিভূতিবাবুর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।

খুশ মেজাজের আতিশয্যটা আর একজনেরও নজর এড়ায় না। সে লক্ষ্য করে, এতদিন যারা ছিল দিব্যেন্দুর একান্ত অবজ্ঞার পাত্র, তাদেরই সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে সে। রমেশবাবু তাঁর দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে, কতবার কত রকমভাবেই তো অনুরোধ করেছেন দিব্যেন্দুকে, ভগবানবাবুর এস্টেটের কিছু কাজ-কর্ম পাইয়ে দেবার জন্যে। দিব্যেন্দু কখন গ্রাহ্যও করে নি। কিন্তু, এবার একদিন তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল ভগবানবাবুর কাছে। অজয়টাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না সে,—বোনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পয়সায় কলেজী-বিলাস করে বলে। কিন্তু, সেদিন তাকে ভরসা দিল, কোন রকমে বি. এস-সি.-টা পাশ করে ফেলুন, ভাল ব্যবস্থা করে দোব আর. সি. কেমিক্যালস-এ। অমন যে গোল্ড মেডালিস্ট—যে লোক উল্টে অবজ্ঞা করতো দিব্যেন্দুকে "কোয়াক" বলে, তার সঙ্গেই যেন ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল সব চাইতে বেশী—বিভূতিকে উপলক্ষ করে। দেখা গেল, সুদর্শন ডাক্তার বিভূতিকে নিয়মিতভাবে ইনজেকশান দিয়ে যাচ্ছে, দিব্যেন্দুর খাতিরে, বিনা পারিশ্রমিকে। দাক্ষিণ্যের কারণটাও অপ্রকাশ রইল না। জানা গেল, দিব্যেন্দুর সুপারিশে, সে "ছুঁচ" হাতে ঢুকে পড়েছে ভগবানবাবুর বাড়িতে—তাঁর স্ত্রীকে ইনস্যুলিন দেবার জন্যে। এবং, অদূর ভবিষ্যতে, কোন বৃহত্তর স্থানে, "ফাল" হয়ে বেরুবারও সম্ভাবনা আছে তার। শেষ পর্যন্ত, বিভূতির বরাতেও শিকে ছিঁড়ে গেল—

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ইদানীং আগের চাইতেও খারাপ হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। খুব দরকার না পড়লে অঞ্জলি কথা বলতো না বিভূতির সঙ্গে। কিন্তু, কিছুদিন যাবৎ তাকে নিয়মিতভাবে দশটা-পাঁচটা করতে দেখে, একদিন সে আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। বলল, কি ব্যাপার! চাকরী হলো নাকি?

বিভূতি খুব খুশী হলো প্রশ্ন শুনে। এক গাল হেসে বলল, চাকরী নয়—ব্যবসা শিখছি। ভগবানবাবুর কারখানায় যে লোকটা প্যাকিং বাক্স জোগান দেয়, তার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছেন দিব্যেন্দুবাবু। কাজ শিখতে পারলে, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—বুঝিছি। মাইনে কত হলো?

—মাইনে? মাইনে আবার কিসের? বিভূতি আশ্চর্য হয়ে বলল, লোকটার ওপর দিব্যেন্দুবাবুর কম্যাণ্ড আছে বলেই, বে-কায়দায় পড়ে ব্যবসা শেখবার সুযোগ দিচ্ছে আমাকে। এইটেই কি যথেষ্ট নয়?

—চমৎকার! বলে, তখনকার মতো মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল অঞ্জলি। কিন্তু, দুদিন যেতেই আবার জিজ্ঞাসা করল, মাইনে তো পাওনা! কিন্তু, গাড়িভাড়া, টিফিন, লণ্ড্রী-খরচ এগুলো জুটছে কোথা থেকে?

—দিব্যেন্দুবাবু রোজ এক টাকা করে হাত-খরচ দেন যে!

—এইভাবে একটা ভালমানুষকে এক্সপ্লয়েট্ করতে লজ্জা করে না তোমার? আমার তো গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে!

—বাঃ, তা আমি কি করবো, বিভূতি অসহায়ভাবে বলল, আমি তো—আমার সেই সারেণ্ডার ভ্যালুটা নগদ ধরে দিয়েছিলাম ওঁকে। উনি আবার সেটা আমার কাছেই জমা রাখলেন যে!

—সে আবার কি?

—সেই যে পাঁচশো ছেচল্লিশ টাকা—ইনস্যুরেন্স কোম্পানির। টাকাটা আবার আমার কাছেই জমা রেখেছেন উনি। মাঝে মাঝে

অবশ্য পরীক্ষা করে দেখেন, খরচ করে ফেলেছি কি না। কিন্তু আমিও এবার খুব সাবধানে—

—বুঝেছি! অঞ্জলি আর কোন প্রশ্ন করল না। কিন্তু, গাম্ভীর্য তার আরও বেড়ে গেল! একজন অ-সংসারী মানুষের খেয়াল-খুশীর দৌলতে কেউ যদি উপকৃত হয়—সে সম্বন্ধে সমালোচনার অবকাশ থাকলেও, অভিযোগ করবার কিছু নেই। কিন্তু, বিশেষ একজনের সম্বন্ধে কেউ যদি বিশেষভাবেই নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন করে, তাহলে—

তার কি অর্থ হয়, ভেবে পায় না অঞ্জলি; কিন্তু, চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। এতদিনকার অভ্যাস ত্যাগ করে, কেন যে একজন ছাদে যাওয়া বন্ধ করল, সে সম্বন্ধে কিছুই কি জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে না আর একজনের!

আর একজনের মনের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে সঙ্গীন হয়ে উঠছিল। দেখতে দেখতে দু-মাস কেটে গেল; কিন্তু, ভগবানবাবুর তরফ থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। নিয়মিতভাবে না হলেও, মাঝে মাঝে অবশ্য দেখা হয় তাঁর সঙ্গে। কাজ-কর্মের কথাবার্তাও হয় দু-চারটে; কিন্তু, আসল কথাটা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করতে পারে না সে। ভগবানবাবুও অবশ্য পার্ক স্ট্রীটের মেজাজে থাকেন না দিনের বেলায়; কিন্তু, রাতের আসরেও যে আর ডাক পড়ে না তার···

অথচ, ভগবানবাবুর ভরসাতেই ইতিমধ্যে সে একটা ফ্ল্যাট দেখে এসেছে সি. আই. টি. রোডে। ভাড়া প্রায় ডবল; কিন্তু, সতীকে নিয়ে সংসার পাতবার উপযুক্ত নীড় নিঃসন্দেহ। বাড়িটা তৈরি হয়ে গেছে। আনুষাঙ্গিক শেষ হতেও আর বেশী দেরি নেই। অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি বায়না করে না ফেললে, অমন সুন্দর ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হয়ে যাবে নিশ্চিত। অথচ,···

ক-দিন ধরেই একটা সন্দেহ উঁকি মারছিল মনের মধ্যে, সেটা

হঠাৎ যেন বিশ্বাসে পরিণত হবার উপক্রম করে : রায় বাঘিনী যত বড় বাঘিনীই হোন না কেন, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করবার মতো সাহস নিশ্চয়ই রাখেন না ! সুতরাং, ভগবানবাবু আর কি করতে পারেন !

কিন্তু, ভগবানবাবুরও কি উচিত নয়, কথাটা তাকে খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে দেওয়া ?

সঙ্গে সঙ্গেই আবার, ওই অনুচিত কাজটার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনের সন্দেহটা বিপরীত যুক্তিও জোগায়। ভগবানবাবুর আর যা-ই থাক লজ্জা সরমের বালাই নেই। সুতরাং, দিব্যেন্দুকে নিরাশ করবার দরকার হয়নি বলেই বোধহয় এখনও তিনি চুপ করে আছেন। অতএব—

বাড়িটা বায়না করে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। রায় গিন্নী যদি একান্তই অপারগ হন তাকে জামাই করতে—তাহলেও, তাকে বাড়ি বদলাইতেই হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। নিজের সুবিধার জন্য নয়, অঞ্জলির মঙ্গলের জন্য তাকে সরে যেতেই হবে এ বাড়ি ছেড়ে। বিভূতির অনুপস্থিতির জন্যই এতদিন সে বাড়ি বদলাতে পারে নি : কিন্তু, এখন ও অজুহাত অচল। ওদের স্বামী-স্ত্রীকে সুখী দম্পতিরূপেই দেখতে চায় সে এবং সেই কারণেই তার তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া উচিত এ বাড়ি ছেড়ে। এমন কি—নিজের পৌরুষ ধর্মের ওপর অতিরিক্ত আস্থা না রেখে, তার কর্তব্য, অচিরেই একটা বন্ধন স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যৎ-বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে চিরতরে নিরুদ্ধ করে ফেলা। ...বাঙলা দেশে, কুমারী কন্যা বলতে একমাত্র সতীকেই বোঝায় না নিশ্চয়ই। কিন্তু—

সতীও কি তার বাপের মতো ক্রিমিন্যাল ভাবে তাকে ?—কথাটা মনে হতেই, দিব্যেন্দুর বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুমড়ে মুসড়ে একাকার হয়ে যায়। মন বলে, সতী অঞ্জলি নয়। বয়সে সাবালিকা হলেও, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার ধার ধারে না সে। সুতরাং নিজের

শুভাশুভ সম্বন্ধে যেমন কোন ধ্যান-ধারণা থাকতে পারে না তার, তেমনি থাকতে পারে না কোন নিজস্ব অভিমত—ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে! সেকালিনীদের মতো সে কেবল একান্তভাবে বিশ্বাস করে তার বাপ-মাকে, তার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে। কিন্তু—

ঠাকুরবাবার অকালকুষ্মাণ্ড কি তাঁর কোন সাধই পূর্ণ করতে পারবে না! চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে তার অনেকদিন আগেকার একটা কথা স্মরণ করে। সেদিন বাবা বলেছিলেন, দেখিস যদি পারিস, ওই রকম একটা মা নিয়ে আসিস তোর ছেলের জন্যে!... বরাতের কথা ভেবে একটু হাসবারও চেষ্টা করে সে।

সে হাসি কারুর নজরে পড়ে না, কিন্তু, মুখ-চোখের অবস্থা লক্ষ্য করে একজন। তার তো ইচ্ছে করে অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করতে; কিন্তু গলার মধ্যে কি যেন একটা আটকে যায় প্রতিপক্ষর তরফে...নিষ্ঠুরতা দেখে!

নিষ্ঠুরতা নয় তো কি! সেই ময়দান স্ক্যাণ্ডালের পরের দিন থেকে কেন যে সে ওপরে যাওয়া বন্ধ করেছে; তার আসল কারণটা কি দিব্যেন্দু বুঝতে পারেনি বলতে চায়! কী ভেবেছে ও? অঞ্জলি নিজের কলঙ্কর ভয়ে এড়িয়ে চলছে দিব্যেন্দুকে! যে মেয়ে একদিন বিদ্রোহ করে বিবাহ করেছিল, সে আর সহ্য করতে পারছে না প্রতিবেশিনীদের অন্তর-টিপ্পনী! আহা, এমন না হলে আর ব্যাটাছেলের বুদ্ধি!

কিংবা, সত্যিই হয়তো কিছু বোঝেনি ও! এই তো সেদিন—যেদিন ডিভোর্সের কথাটা বলে ফেলেছিল সে, সেদিন তো একটু খোঁচা দিয়েছিল বীর পুরুষের ভয় ভেঙ্গেছে বলে। কিন্তু, কই, ও তো আর আগেকার মতো হয়ে উঠল না! বরং বারণ করা সত্ত্বেও, আরও যেন বেশী মাতামাতি করছে তার জীবনের ওই দুষ্টগ্রহটাকে নিয়ে! জলের মতো টাকা খরচ করছে এমন একজনের

পৌঁছনে যার সঙ্গে তার কোন রকম সামাজিক সম্পর্কই আর থাকবে না কদিন পরে।

সত্যি বাপু! এই পুরুষ জাতটার বুকের ভেতরটা যে কি দিয়ে তৈরি তা বোধহয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও জানেন না! মেয়েদেরকে কষ্ট দিতে পারলে ওরা যেন আর কিছুই চায় না। সাধে কি আর লোকে বলে, ব্যাটাছেলেগুলো যেমনি স্বার্থপর তেমনি নিষ্ঠুর!

কিন্তু, আর একজনের চির-পরিচিত শীর্ণ মুখ দেখে কিছু বোঝা না গেলেও, তার কোটরাগত মণির নির্বিকার দৃষ্টি কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন হয়। তাই, সেদিন সকালে অঞ্জলি যখন মুখ কালো করে কাপড় মেলে দিচ্ছিল নিজের ঘরের সুমুখের বারান্দায়, নীলিমা এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে ওঁর?

—কার? অঞ্জলির বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

—দিব্যেন্দুবাবুর?

—কি হয়েছে ওর?

—আপনি কিছু জানেন না?

—না তো। আপনি কি করে জানলেন?

—বাহাদুরের অবস্থা দেখে তাই তো মনে হলো। নীলিমা বলল, এমন অসহায়ের মতো এসে বললে, মাঈজী, আমাকে বার্লি বানাবার কানুনটা শিখিয়ে দিতে পারো জলদি! আমি বললাম, বার্লি কি হবে? ও বললে, মালিক গড়্‌বড়িয়েছে। এক্ষুনি কারখানায় যেতে হবে ডাংদার সাহেবকে খবর দিতে—

—তারপর? অঞ্জলির চোয়ালদুটো ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল।

নীলিমা অঞ্জলির ভাবান্তরটা লক্ষ্য করল না, বলল, কি আর করি! বেচারাকে আশ্বস্ত করে বললাম, তুমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস, আমি বার্লি তৈরি করে দিচ্ছি!—আপনি একবার দেখে আসুন না, কি হলো ওঁর?

—আমার সময় কোথায়, অফিস যেতে হবে না!—বলেই অঞ্জলি

হঠাৎ ঢুকে গেল নিজের ঘরের মধ্যে। দেখে, নীলিমার ছোট্ট চোখদুটো একবার যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে ফিরে গেল সে।

বালিশটাকে সাপটে জড়িয়ে ধরে উবুড় হয়ে শুয়েছিল অঞ্জলি—কতক্ষণ কে জানে। হঠাৎ বিভূতির সাড়া পেয়ে একটু সামলে শুলো।

—এ কি! এমন করে শুয়ে যে! অসুখ করল নাকি?

অঞ্জলি কোন উত্তর দেওয়া দরকার মনে করল না, যেমন ছিল তেমনিই শুয়ে রইল। দেখে, বিভূতি একবার ঢোক্ গিলল। শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিল বার কয়েক। তারপর, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্ত্রীর পিঠের ওপর।

—কি হয়েছে অঞ্জু—কথাটা শেষ করতে পারল না বিভূতি, ছিট্‌কে পড়ে গেল মেঝের ওপর। অঞ্জলিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বারান্দায় বেরিয়েই তার প্রথম নজর পড়ল নীলিমার ওপর। একটা কিছু হাতে করে তেতলায় উঠছিল সে।—অর্থাৎ, তার মতো নীলিমাও স্কুল কামাই করেছে দিব্যেন্দুর জন্য।...কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার সখ হয়েছে! আস্পর্ধা বটে।—অঞ্জলি [illegible] আবার নিজের ঘরে গিয়েই ঢুকল।

—এর মানে?—বিভূতি তখনও মেঝের ওপর বসেছিল মুখ কালো করে। বলল, আমি জানতে চাই এর মানে কি?

অঞ্জলি থমকে দাঁড়াল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, কিসের মানে জানতে চাও তুমি?

মুখের কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হলো না বিভূতির পক্ষে। মনের অগোচরে যে পুরুষ মানুষটা ঘুমিয়েছিল এতদিন, তার তন্দ্রা ভাঙ্গলেও জড়তা কাটেনি তখনও। তাই, তার কণ্ঠযন্ত্রটা

যেন বিকল হয়ে গেল সাময়িকভাবে। ওদিকে, পেটের মধ্যেও যেন আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে। সেই ভোর রাত্রে উঠে খিদিরপুর ডকে গিয়েছিল সে এক চালান কেরোসিন কাঠ ডেলিভারি নেবার জন্যে। সেখান থেকে ভয়সা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে ফিরেছিল পার্টির কারখানায়—বৈঠকখানায়। ইতিমধ্যে এক বাটি চা খাবারও অবসর পায়নি সে। তারপর খদ্দেরকে মাল ডেলিভারি দিয়ে, দালালীর টাকা পকেটস্থ করে যখন বাইরে বেরুল, তখন বিবেচনা করে দেখল, রাস্তায় পয়সা নষ্ট না করে, একেবারে বাড়ি ফিরে স্নানাহার করাই ভাল—যদিও উপার্জনটা আশাতীতই হয়েছিল। অথচ—

ঘরে ঢুকে অঞ্জলিকে ওই রকম আলুথালুভাবে শুয়ে থাকতে দেখে, সে না হয় একটু দৌর্বল্যই প্রকাশ করে ফেলেছিল বহুকাল পরে। কিন্তু, তাই বলে, অমন করে ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে হবে! অঞ্জলি কি তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়? স্বামী হিসাবে তার কি এটুকু অধিকারও নেই!

অঞ্জলি ইতিমধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। ফিরল, একটা রেকাবীতে খান কয়েক পাঁউরুটি স্লাইস নিয়ে। দেখে, বিভূতির বুকের জ্বালা পেটের আগুন একাকার হয়ে গিয়ে মাথায় উঠে গেল হঠাৎ। সামলাতে না পেরে সবেগে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

মুখের খাবার ফেলে রেখে লোকটা বেরিয়ে গেল এই ভর্ দুপুর বেলায়! অঞ্জলি কেমন যেন হয়ে গেল। কিন্তু, মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই তার মাথার মধ্যে ঝাঁঝাঁ করে উঠল—এতদিন পরে এ স্পর্ধা ওর হলো কী করে! কার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে ও আজ এতখানি সাহস দেখাতে পারলে!

আবার যেন নতুন করে মনে পড়ে গেল সদ্য-ঘটা ঘটনাটা! ঢোঁড়ার কেউটা হবার স্পর্ধা!—উপবাসী কালনাগিনীর জীবনে

সে যে কি বিপর্যয় ঘটায়, যেন, তারই চরম প্রমাণ দাখিল করবার জন্য সে মনস্থির করে ফেলল তৎক্ষণাৎ। সে এক্ষুনি যাবে অতসীদির কাছে। দাখিল করবে সেই অকাট্য প্রমাণ, যার সাহায্যে চিরকালের মতো যবনিকা টেনে দেওয়া সম্ভবপর হবে তার জীবনের এই দাম্পত্য প্রহসনের ওপর। কিন্তু—

অতসীদির কাছে যাবার পূর্বে আর একজনকেও জানিয়ে দিয়ে যাওয়া দরকার,—তার অপাত্রে ভিক্ষাদানের ঔদার্যটা ইতিমধ্যে কি নিদারুণ বিষোদ্গার করতে আরম্ভ করেছে।

অনেকদিন পরে আবার তেতলার দিকে চলেছিল অঞ্জলি। তাই বোধহয় তার হৃদ্‌যন্ত্রের গতিটা বেড়ে গিয়েছিল ভীষণভাবে। তাই বোধহয় পুরোন দিনের কথাগুলো আর মনে পড়ল না তার ;— চুরি করে একবার দেখে নিতে হলো নীলিমার ঘরের দিকে। চোরের মতোই সিঁড়ি ভাঙ্গতে হলো পা টিপে টিপে। এবং—

বড় জ্বালায় জ্বলে পুড়ে ভাবনা-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়েছিল বলেই বোধহয়, কাঁপা হাতে খিল লাগিয়ে দিল সে সিঁড়ির দরজাটাতে।

দিব্যেন্দু তখন বিছানার ওপর আড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল, আর মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল দশ নম্বরের দিকে। কাগজে সেদিন মেনকাদাসী বনাম পুলিশী মামলার রায় বেরিয়েছিল। হাকিম অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু, মন্তব্যগুলোর ওপর সে যথোচিতভাবে মনঃসংযোগ করতে পারছিল না দশ নম্বরের জন্য। জন কয়েক কুলীর সাহায্যে ফ্ল্যাটের জিনিষপত্রগুলো নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—সেই বিরীজ লাল। অর্থাৎ, ঋষিবাবু ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছেন। কিন্তু, কেন?

ঋষিবাবুর এই আকস্মিক ফ্ল্যাট্ ত্যাগের কার্য-কারণ সম্পর্কটা— কষ্টকর হলেও, বিশ্লেষণ না করেও পারছিল না সে। হঠাৎ একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনে সচেতন হলো।

অঞ্জলি কাছে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল শরীর টান করে। মিনিটখানেক পরস্পরের দিকে নীরবেই তাকিয়ে রইল দুজনে।

—কি ব্যাপার এতদিন পরে? দিব্যেন্দুই নীরবতা ভঙ্গ করল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, হঠাৎ রণরঙ্গিণী মূর্তিতে কেন?

—আপনার নাকি অসুখ করেছে?

—কে বললে?

—মিস্ নীলিমা সেন।

—ওঃ! বলে, দিব্যেন্দু আবার চোখ ফেরাল দশ নম্বরের দিকে।

—ব্যাপারখানা কি, আমরা জানতে পারি না?

—ও কিছু নয়।

—কিছু নয়? তাই বুঝি ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হয়েছিল?

—ডাক্তার? ও হো, ডাক্তার গুপ্তের কথা বলছেন! উনি তো কেমিস্ট। ডেকে পাঠিয়েছিলাম কারখানার কাজে; চিকিৎসা করাবার জন্যে নয়।

—তাই নাকি! অঞ্জলির নাকের গোড়াটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছিল। বলল, অসুখ করেনি তো শুয়ে থাকা হয়েছে কেন, শুনি?

—ও কিছু নয়। ব্রোস্টিংয়ের সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই বাঁ পা-টা সজোরে ঠুকে গিয়েছিল বারের গায়ে।

অঞ্জলি এইবার মুস্কিলে পড়ল। ভেবে পেল না, এই রকম সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে আর কি প্রশ্ন করা যেতে পারে। অবশ্য, অসুস্থ মানুষের আনুষঙ্গিক সেবা-পথ্যাদি সম্বন্ধে আরও দু' চার কথা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। কিন্তু, মিস নীলিমা সেন যখন রয়েছেন তখন অঞ্জলির আর দরকার কি এই সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভদ্রতা করবার.........

—ও কি হচ্ছে? দিব্যেন্দু হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে উঠল। বলল, চোখ মোছো শীগগির—শীগগির—

অঞ্জলিও অবুঝ নয়। কিন্তু, ইচ্ছা সত্ত্বেও হাতের আঁচলটা তার চোখ পর্যন্ত পৌঁছল না। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল কণ্ঠযন্ত্রটা।

একেবারে হকচকিয়ে গেল দিব্যেন্দু। তারপর কি করবে ভেবে না পেয়ে, ডান পাশ ফিরে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল অঞ্জলিকে সচেতন করবার জন্যে। ফলে যেটুকু কাণ্ডজ্ঞান অঞ্জলির তখনও ছিল, তাও ভেসে গেল। দিব্যেন্দুর স্পর্শ পেয়েই সে ধপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপর।

হাঁটু দুটোর মধ্যে মুখ গুঁজে কান্না চাপার সেই অমানুষিক চেষ্টা দেখে দিব্যেন্দুও আত্মবিস্মৃত হলো। ভুলে গেল অঞ্জলি পরস্ত্রী—তার কেউ নয়। চাপা গলায় ডাকল, অঞ্জু, লক্ষ্মীটি, শোন—

—খেলে কলাপোড়া! ঠিক সেই মুহূর্তেই ধাক্কা পড়ল সিঁড়ির দরজায়ঃ ওরে ব্যাটা বেঁটে বামন, ভর দুপুর বেলায় দরজা বন্ধ করলি কেন রে?

আওয়াজ পেয়েই দিব্যেন্দু উঠে বসতে গেল। কিন্তু, অঞ্জলি সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। ভাল-মন্দ ভূত-ভবিষ্যৎ সব কিছু একাকার হয়ে গেল বর্তমানের আকস্মিকতার কাছে। নিদারুণ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল তার অশ্রুসিক্ত চোখদুটি। সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল থরথর করে। উদগ্র আবেগে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল কণ্ঠস্বর। হাত দুটোও শক্তি হারাচ্ছিল কুণ্ঠাকণ্টকিত হয়ে। তবুও, সমস্ত শরীরের ভর দিয়ে সে নিরস্ত করবার চেষ্টা করল দিব্যেন্দুকে। কোন রকমে শুধু বলতে পারল, না—

—আরে যাঃ! বৈজু এবার বিরক্ত হয়ে হুঙ্কার ছাড়ল, ওরে ব্যাটা বাঁটকুলেশ্বর—

—দাঁড়া আসছি! উদ্দেশে সাড়া দিয়ে দিব্যেন্দু সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়াল অঞ্জলিকে নিয়ে। ফিসফিস করে বলল, চট করে ঢুকে পড়ো রান্নাঘরে। শীগগির।

অঞ্জলি কথা শুনল। তখন দিব্যেন্দু খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে সিঁড়ির দরজা খুলে দিল।

—কি রে ঠ্যাং ভাঙ্গলি কি করে? কোথায় ঢুকেছিলি, এ্যাঁ? ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করতে করতে বৈজু আরম্ভ করল, দরজা বন্ধ করে করছিলি কি? ঘুমোচ্ছিলি নাকি? নাঃ, তুই মাইরী একটা দামড়া ট্যাঁড়স! ঘোড়ার ডিমের প্যারালাল বার করে আখেরে তোর লাভটা হলো কি বলতো? তোর বুক দেখে অনেক ইয়ে হয়তো হিংসে করবে। কিন্তু, তোর বরাতে ঠ্যাং ভাঙ্গা ছাড়া আর কি লাভ হলো বল তো?

—থাম থাম, অসভ্যতা করিস নি।

—কেন রে! আমরা দুজন তো এখন একলা! দোকলা আসবার চান্স আছে নাকি?

দিব্যেন্দু ভ্রূকুটি করল। দেখে, বৈজু অন্য সুর ধরল। বলল, তোর বাহাদুর গেল কোথায়? আমার যে টি-টাইম হয়ে এল।

—তাকে পাঠিয়েছি একটা কাজে। এক্ষুনি এসে পড়বে।

—হুম, তোকেও তাহলে ফ্ল্যাট হতে হয়! তা ক'দিন ভুগবি মনে করেছিস?

—ক'দিন আবার, কালই খাড়া হয়ে উঠব। কিন্তু, তোকে খবরটা দিলে কে? ডাক্তার গুপ্তে?

—হ্যাঁ। চিকিৎসা-পত্তর কিছু করছিস না কি?

—পায়ে লাগিয়েছি সেই মেওয়ারি টোটকাটা!—সেই যে তোর নানীর কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলাম। আর—দিব্যেন্দু হঠাৎ থেমে গেল বাইরের দিকে নজর পড়াতে। বৈজু দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল বলে অঞ্জলির পলায়ন-পর্বটা দেখতে পেল না। বলল, আর কি?

—আর বালি চালাচ্ছি আজকের দিনটা।

—সেরেছে! বৈজু ভাবিত হয়ে বলল, বৌ-এর কাছে শুনেছি,

বার্লি জ্বাল দেওয়া নাকি সাংঘাতিক ব্যাপার। তোর বাহাদুর ব্যাটা সেই তৈরি করে নি তো?

—বাহাদুর নয়, মিস সেন তৈরি করে দিয়েছেন।

—মিস সেন? মানে, সেই গোমড়ামুখী মাস্টারনীটা?

—আঃ, তুই কি কস্মিন্ কালেও ভদ্রলোক হবি না?

—যাচ্চোলে! চোখদুটো বড় বড় করে বৈজু বলল, সামান্য বার্লিতেই এত!

—আঃ! দিব্যেন্দু আবার ধমক দিতে গেল; কিন্তু থেমে গেল দরজার কাছে একটা শব্দ শুনে। স্বয়ং নীলিমা এসে ঘরে ঢুকল একটা জামবাটি হাতে করে। দেখে, দু'জনেরই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। শুনতে পায়নি তো?

—ইস্! দিব্যেন্দুই প্রথমে সামলে নিল। বলল, আপনি আবার কেন কষ্ট করলেন? ছি ছি দেখুন তো! বাহাদুরকে বললেই হোত!

—বাহাদুর বাড়ি নেই। বলে, নীলিমা এগিয়ে এসে সাবধানে বাটিটা নামিয়ে রাখল জানালার কানাচে। তারপর গিয়ে ঢুকল দিব্যেন্দুর রান্নাঘরে, দুটো গেলাস নিয়ে আসবার জন্যে।

—ইয়ে, আমি আজ চলি। বৈজু উঠে পড়ল।

—আহা, দাঁড়া না!

—নাঃ, চলি। বৈজুর মুখের অবস্থাটা দিব্যেন্দুর চাইতেও করুণ হয়ে উঠেছিল। সুযোগ পেয়েই সরে পড়ল সে।

—দেখুন তো কি মুস্কিলে ফেললেন আমাকে। নীলিমা ফিরতেই দিব্যেন্দু আবার বলল, আমার এই সামান্য ব্যাপার, তার জন্যে আপনি স্কুল কামাই করে…ছি ছি, অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন আপনি!

নীলিমা গেলাস দুটোর সাহায্যে বার্লি ঠাণ্ডা করছিল, থেমে গিয়ে বলল, অন্যায় কাজ…করেছি আমি?

—তা একটু করেছেন বৈকি! কথাটা যখন মুখ ফসকে বেরিয়েই গিয়েছে, তখন আর কথা ঘোরাবার বৃথা চেষ্টা করল না দিব্যেন্দু। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আপনি কি জানেন না, আমার কি সুনাম বেরিয়েছে এ বাড়িতে! সেই জন্যেই তো আমি বিশেষ ভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলাম বাহাদুরকে, যেন অঞ্জলি দেবীকে কোন খবর না দেয়। কিন্তু, ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি, আপনাকে খবর দিয়ে আর এক কাণ্ড করে বলল। আপনি হয়তো খেয়াল করেন নি। কিন্তু, আমি জানি, এর জন্যে কথা শুনতে হবে আপনাকে।

—জানি। নীলিমা আবার বার্লি ঠাণ্ডা করতে লাগল।

—জানেনই যদি, তাহলে কেন স্কুল কামাই করে এ কাণ্ড করতে গেলেন?

—ও সবে আমার কিছু হয় না। নীলিমা গেলাস এগিয়ে দিয়ে বলল, খেয়ে নিন এটা।

—আপনার কিছু হয়না!—অঞ্জলির কিছু হয়না! বিভূতির চামড়া তো দেখি আরও মোটা। কিন্তু, শুনতে যে আমারও ভাল লাগে না!

—জানি। খেয়ে নিন এটা।

দিব্যেন্দু বার্লি খেয়ে গেলাসটা নামিয়ে রাখতে গেল; কিন্তু বাধা দিয়ে, নীলিমা উচ্ছিষ্ট গেলাসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা জানেন সব! কিন্তু, কি যে জানেন, জানিয়ে গেলেন না কেবল সেইটুকু! অদ্ভুত...

শুয়ে শুয়ে নীলিমার চরিত্রটাই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতে লাগল দিব্যেন্দু:

গম্ভীর-প্রকৃতির এই ভদ্রমহিলাটিকে এ বাড়ির বাসিন্দারা সামনে সমীহ করে যে পরিমাণ, ঠিক সেই ওজনে আড়ালে ভেংচি কাটে গোমরামুখী, শুখনো কাঠ প্রভৃতি বলে। বেচারার অপরাধ,

সে আর সকলের মতো নয়। যে মেয়ে একদিন শিক্ষিকার জীবনকেই বেছে নিয়েছিল সংসার প্রতিপালন করবার জন্যে, সে কি করে সচেতন থাকতে পারে নিজের দেহ-দেউলের ক্রমিক অবনতি সম্বন্ধে। উদয়-অস্ত মাস্টারী করে যাকে পেট চালাতে হয়, তার পক্ষে আড্ডা মারবার অবসর কোথায়! শিক্ষাব্রতীর স্বাভাবিক সংস্কার বশে কেউ যদি প্রতিবেশীর তারল্যকে প্রশ্রয় দিতে অপারগ হয়, তাহলে কি তাকে গোমরামুখী বলে অবজ্ঞা করা উচিত! কিন্তু, এই যে তিরিশ না পেরতেই তিপান্নের ভারচ্যু ভর করেছে ভদ্রমহিলার দেহযন্ত্রে, এর জন্যে দায়ী কে?—কে?

—আমি রে আমি। অন্ধকারে ভূতের মতো পড়ে আছিস কেন? আলো জ্বালবো?

—নাঃ, ভাল লাগছে না।

—জ্বর হলো নাকি?

—জ্বর তো আজ একটু হবেই। কিন্তু, তুই আবার উদয় হলি কোত্থেকে? গিয়েছিলিই বা কোথায়?

—গিয়েছিলাম তো বাড়িতেই। তারপর ঘরে ঢুকে মনে পড়ল, আসল কাজটাই করা হয়নি। বৈজু পকেট থেকে একটা খামে আঁটা চিঠি বার করে বিছানার ওপর ফেলে দিল। বলল, মামা বলেছিল, চিঠিটা তোকে এ্যাট্ ওয়ান্স ডেলিভারি দিতে। শালার গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ডবল খাটতে হলো আমাকে।

—গোয়েন্দাগিরি! চিঠি ফেলে রেখে দিব্যেন্দু খাড়া হয়ে বসল। তুই গোয়েন্দাগিরি করে এলি নাকি? কার ওপর?

—ওই ব্যাটা অনাদি মুকুজ্জেটার ওপর। ব্যাটা মামলায় জিতে খুব ভোজ লাগিয়েছে। সত্যি, মামার যে কি বাহাত্তুরে ধরল বাহান্ন না পেরতেই! ওকে টিট্ করা যত অসম্ভব হয়ে উঠছে ততই যেন গোঁয়ার্তুমী বেড়ে যাচ্ছে মামার। আরে, ও সব সাজা ছোটলোকদের টিট্ করা কি চাট্টিখানি কথা!

—সাজা ছোটলোক! কার কথা বলছিস?

—ওই ব্যাটা অনাদি মুকুজ্জে। ছিল সদ্ ব্রাহ্মণের ছেলে; ক্ষত্রিয় হতে গিয়ে নিজেও জাত খোয়ালে, মামাকেও ফেললে নিদারুণ ফ্যাসাদে!

—সে আবার কি রে? কই, এতদিন তো কিছু বলিস নি?

—শুনলুম সবে আজ সকালে—বৈজু বিরক্ত হয়ে বলল, অতদিন আগে বলবো কি করে?

—ব্যাপারখানা কি খুলেই বল না ছাই!

বৈজু জমে বসে কেচ্ছা আরম্ভ করল অনাদি মুকুজ্জের। ওদিকে অঞ্জলি ফুঁসতে লাগল নিজের ঘরে বসে।...হতচ্ছাড়াটার জন্যে বৃথাই গেল তার অফিস কামাই করাটা। কিন্তু, নীলিমাটারও কি স্পর্ধা! কি ভেবেছে ও? শুখনো কাঠে ফুল ধরবে!

পরদিন সকালে—

ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর দিব্যেন্দুর প্রথমেই নজরে পড়ল, বালিশের ধারে পড়ে থাকা সেই চিঠিখানা, বৈজু যেটা দিয়ে গিয়েছিল গত সন্ধ্যায়। খাম ছিঁড়ে পড়তে আরম্ভ করল সে:

বড্ড ব্যস্ত। তাই তাড়াতাড়ি এই পত্র মারফৎ নির্দেশ দিচ্ছি তোমাকে। ঋষি কাবু হয়েছে। তার বৌ বোধহয় শীগগিরই পটল তুলবে। অতএব, এই শ্রাবণ মাসের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে তোমাকে। না হলে, আরও এক বছর বসে থাকতে হবে কালাশৌচের জন্যে। আমার ইচ্ছে, বাঘিনীর অবস্থার কথা বিবেচনা করে কোন রকমে নম নম করে কাজ সারা। তাই খবরটা এখনও গোপনে রেখেছি। পরে, একদিন হৈহৈ করলেই হবে'খন। ঋষিরও ট্যাকের অবস্থা ভাল নয়। বোধহয়, হাজার তিনেকের বেশী বার করতে পারবে না। তা হোক, তুমি ঝুলে পড়বার জন্যে প্রস্তুত

থেকো। দিন দশেক পরে, পরের পর কটা শুভদিন আছে। আশা করছি, তারই একটাকে কাজে লাগাবো। মোদ্দা, তুমি প্রস্তুত থাকবে। হয়তো, একদিনের মধ্যেই আশীর্বাদ সেরে বিয়ে দিতে হবে তোমার।…

চিঠি পড়ে, বেশ কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল দিব্যেন্দু। এতদিন পরে, সত্যিই কি তাহলে…

হঠাৎ নজর পড়ল, অঞ্জলির জামা-কাপড়গুলো আবার আগেকার মতোই শুখচ্ছে ছাদের ওপর। দমে গেল সে। তারপর—

আরও মুষড়ে পড়ল বিভূতিকে দেখে। গতকাল অত কাণ্ড-কারখানার মধ্যে এই লোকটার কথা একবারও মনে পড়েনি তার। কেমন যেন একটা অপরাধবোধের গ্লানি আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

—দাদা আপনার নাকি একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে!—কুণ্ঠিতভাবে ঘরে ঢুকে বিভূতি জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছেন এখন?

—ও কিছু নয়।—বিভূতির সকুণ্ঠ ভঙ্গিটাই সাহসী করে তুলল দিব্যেন্দুকে। গম্ভীরভাবে বলল, গতকাল কোথায় ছিলেন?

বিভূতি একবার গলা ঝাড়ল। উত্তর দিতে পারল না।

প্রতিপক্ষর সঙ্কোচটা যেন আরও নিশ্চিন্ত করল দিব্যেন্দুকে। আরও গম্ভীরভাবে সে প্রশ্ন করল, জবাব দিচ্ছেন না কেন? কোথায় ছিলেন?

—গুদোমে।

—হেতু? নিজের ঘরে আর জায়গা হচ্ছে না?

—তা নয় তো কি! বিভূতি একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়ল। অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে, অসংলগ্নভাবে, অনেক দিনের অনেক জমান দুঃখই প্রকাশ করে ফেলল সে। বাদ দিল কেবল গতকালের ঘটনাটা। বলল, ও আমাকে ডিভোর্স করতে চায়! করুক যা খুশী, আমি বাধা দেব না। তাই তো চলে যাচ্ছি দেশ ছেড়ে।

অভিমানীকে দিব্যেন্দু সান্ত্বনা দিল না। বরং একটু যেন শ্লেষ প্রকাশ করেই বলল, অ, স্ত্রীকে ডিভোর্স করবার সুযোগ দেবার জন্যে দেশত্যাগ করতে চান আপনি! ভাল কথা। কিন্তু আবার নন্দদুলালের মতো নাকে কাঁদছেন কেন? আপনি কি মনে করেন, আপনার মতো ডিফিটিস্ট মেণ্টালিটির লোককে কেউ সহানুভূতি দেখাবে?

—আপনি বুঝতে পারছেন না! বিভূতি যুক্তি দেখাল, ও কি আমার মা ঠাকুর্মার মতো। ও হচ্ছে একেলে সাড়ে তের টাকা দামের বৌ!

—থামুন! আচমকা ধমকে উঠল দিব্যেন্দু। বলল, তের টাকাই হোক আর তের পয়সাই হোক, একটা মেয়েকে যে সামলাতে পারে না, সে আবার পুরুষ মানুষ বলে পরিচয় দেয় কোন লজ্জায়!

বিভূতি মাথা নীচু করে বসে রইল। দিব্যেন্দু আবার বলল, ও সব ছেলে-মানুষী ছাড়ুন! চেষ্টা করুন সত্যিকার পুরুষ মানুষ হতে—ওর স্বামী হতে! তখন কি যেন বলছিলেন, দেশ ছাড়ার কথা?

বিভূতি তার বক্তব্য পেশ করল: কয়েকজন লাইনের লোকের সঙ্গে জানাশোনা হয়ে যাওয়ার ফলে, একটা সাব্‌কন্‌ট্রাক্‌টারীর সুযোগ পেয়েছে সে হাজারীবাগ অঞ্চলে। ওখানকার একটা কাঁচের কারখানায় প্যাকিং বাক্স জোগান দেবার কন্‌ট্রাকট। এখন, দিব্যেন্দু যদি দয়া করে, সেই ৫৪৬ টাকাটা তাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার করবার অনুমতি দেয় মাস ছয়েকের জন্যে, তাহলে, সে আগামী কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়তে পারে। বস্তুতঃ এই অনুমতিটুকু নেবার জন্যেই সে আজ এসেছে। নাহলে, এ বাড়ির চৌকাঠও সে মাড়াত না।

প্রস্তাব শুনে দিব্যেন্দু কিছুক্ষণ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। বলল, আপনি এরই মধ্যে এমন কাজের-কাজী হয়ে উঠেছেন!

—আপনার টাকাটা পেলে—বিভূতি বলল, আমার মূলধন দাঁড়াবে হাজার। আমার তো বিশ্বাস দাঁড়িয়ে যেতে পারবো।

—হাজার? দিব্যেন্দু সবিস্ময়ে বলল, বাকি ৫০০ টাকা দিচ্ছেন কে?

—কেউ দিচ্ছে না তো! ওটা আমি নিজেই রোজকার করেছি—দালালী করে।

—দালালী করে? বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হাজারীবাগে খরচ কম। লাভের টাকাটা মূলধনে বাড়বার সুযোগ পাবে। এখন, আপনি যদি—

—বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। দিব্যেন্দু উৎসাহ দিয়ে বলল, এই তো চাই! কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে? আমি তো ভাবতেই পারিনি, আপনি ইতিমধ্যে এতখানি এগিয়ে পড়েছেন। বেশ বেশ, কালই আপনি বেরিয়ে পড়ুন।

—তাই যাব। কিন্তু, এদিকের কি হবে? বিভূতি সঙ্কুচিত ভাবে বলল, ইনজেকসানটা কি আরও চালাতে হবে?

—এখন কেমন বোধ করছেন আপনি?

—ভাল। বোধহয়, একেবারে সেরে গেছি আমি। কিন্তু গোল্ডমেডেল বিশ্বাস করে না। বলে—

—ওর কথা বাদ দিন। আপনি আরও একটা কোর্স নিয়ে রাখুন। ওখানকার কারখানায় ডাক্তার আছেন নিশ্চয়ই! তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নেবেন।

—আর পাস্নুমা?

—ওটা আরও বছর খানেক চালাতে হবে।

—তাহলে—

—হ্যাঁ, চলে যান আপনি। তারপর, একটু গুছিয়ে নিয়েই, অঞ্জলিকে নিয়ে যাবেন এসে।

—আমারও তাই ইচ্ছে! কিন্তু, ও কি যাবে?

—যাবে না মানে? নিয়ে যেতে জানলেই যাবে। কিন্তু, আপনি যেন আবার ছেলেমানুষি করে বসবেন না! নিজের ঘর থাকতে কেউ গুদোমে গিয়ে রাত কাটায় না হোটেলে খায়! যান, ঘরে যান—

বিভূতি হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

অঞ্জলি স্থির করেছিল, আজও অফিসে যাবে না। কিন্তু স্বামীকে সপ্রতিভভাবে ঘরে ঢুকতে দেখেই মতলব বদলে ফেলল। ভুরু কুঁচকে বলল, চাল নেব নাকি?

—নেবে বৈকি! বিভূতি সোৎসাহে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু বাধা পড়ল। বারান্দা দিয়ে তখন সদলবলে প্রফুল্ল যাচ্ছিল তেতলার দিকে; দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আর কে ও? মিস্টার হালদার নাকি? কাল কোথায় ছিলেন মশাই সারাদিন? নিন নিন চট্‌ করে সই করে দিন একটা—

—কিসের সই? বিভূতি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল।

—একতলার আবর্জনা সাফ করতে হবে। অজয় এক গাদা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, পুলিশ তো কোন কম্মে এল না! তাই, বাপের বাপেদের কাছে অ্যাপিল করছি আমরা।

বিভূতি নেড়ে চেড়ে দেখল, দশ পাতা ফুলস্কেপের প্রকাণ্ড আবেদন পত্র। আবেদন করছে হনুমান হাউসের ভাড়াটিয়ারা কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের কাছে। নালিশটা হচ্ছে মালিকের বিরুদ্ধে, বেশ্যা ভাড়াটে পোষণের জন্য এবং আবেদনটা হচ্ছে, মামলার মাধ্যমে কালহরণের সমস্যাটাকে বিবেচনা করে অচিরেই নিম্ন স্বাক্ষরকারী ভদ্রসন্তানদের ভদ্রভাবে বাঁচবার উপায় করে দেবার জন্যে।

—এ মতলব মন্দ নয়। বিভূতি বলল, কিন্তু, টেনান্সি তো আমার নামে নয়।

—আরে তাতে কি হয়েছে! প্রফুল্ল বলল, একমাত্র রমেশবাবু ছাড়া আমি, অজয়, গোল্ডমেডেল—কেউই তো টেনাণ্ট নই এ বাড়ির। আমরা সব সই করেছি সাপোর্টার হিসাবে। দেখছেন না, পাড়ার সকলেই সই করেছেন।

—হুঁ! স্বাক্ষরকারীদের নামগুলো দেখতে দেখতে বিভূতি বলল, টেনাণ্টরাও তো দেখছি সকলেই সই করেছেন, কেবল—

—হ্যাঁ, ওপরওয়ালার সই নেওয়াটা বাকি আছে। প্রফুল্ল মুচকে হেসে বলল, কি করি বলুন, যখনই ট্রাই নিতে যাই, তখনই দেখি ভদ্রলোক মহিলাদের নিয়ে ব্যস্ত।

—আঃ, কি সব বাজে বকছেন! রমেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন, মিস্টার চৌধুরীর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে কাল আর যাইনি—এখন যাচ্ছি। নিন, আপনার সইটা করে দিন।

প্রফুল্ল কলম এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি তো ওপর থেকেই নামলেন, দেখলাম। ওপরওয়ালার মেজাজ এখন কেমন? যাওয়া চলবে?

—তা যান না। বিভূতি দস্তখত শেষ করে বলল, মেজাজ ওঁর ভালই আছে।

সত্যিই বেশ মেজাজী হাসি হাসল দিব্যেন্দু। বলল, বাঃ বেড়ে মতলব বার করেছেন তো বাড়িওয়ালা! নিজের বিরুদ্ধেই নালিশ!

—এ ছাড়া আর উপায় কি বলুন! রমেশবাবুও হেসে বললেন, যখন দেখা যাচ্ছে পুলিশ অসহায়; ওদিকে, মামলা করেও ওদের তোলা যাবে না—

—কেন যাবে না?

—না, অনাদি মুকুজ্জের খোঁটা বড্ড শক্ত। দরকার হলে ও সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যাবে।

—সে কি! সে যে অনেক টাকার ব্যাপার! ওকে দেখে তো গাধা বলে মনে হয় না।

—সেই কথাই তো বলছি। রমেশবাবু বিরসমুখে বললেন, টাকার ব্যবস্থা ও অনেকদিন আগেই করে ফেলেছে। যত টাকার দরকার ও আদায় করবে···কাছ থেকে।

নামটা শুনেই ভীষণভাবে চমকে উঠল দিব্যেন্দু। ইনি ভারতমাতার একজন বরেণ্য সন্তানরূপে দেশপূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। বস্তুতঃ, যাঁরা আজ আইন প্রবর্তন করে দেশের লোককে সচ্চরিত্র করতে বদ্ধপরিকর, ইনি তাঁদের শুধু অন্যতমই নন্—নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। অথচ—

—কি বলছেন মশাই? দিব্যেন্দু বিমূঢ় বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, উনি টাকা জোগাচ্ছেন অনাদিকে? কেন?

—ব্ল্যাকমেলের ভয়ে। রমেশবাবু অসহায়ের মতো বললেন, উনিই যে আসল বাবা ওই রানীবালার। রানীর মাকে লেখা অনেক চিঠি—অনেক মনিঅর্ডারের রসিদ যে খুঁজে বার করেছে অনাদি ব্যাটা। সুতরাং—

—বুঝিছি। দিব্যেন্দু সংক্ষেপে বলল, আচ্ছা এটা রেখে যান। পড়ে দেখি ভাল করে।

—তাহলে কি ও বেলায় আসবো?

—তাই আসবেন।

ইতিহাসের পাতায় এমন অসংখ্য দেশনেতা স্মরণীয় হয়ে আছেন, যাঁদের শয়তানীর তুলনায় সদ্য শোনা ভণ্ডামীর নজীরটা নিতান্তই তুচ্ছ। তবুও, এ লোকটা দেশের লোক বলেই বোধহয় দিব্যেন্দুর মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেল। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সামনে পড়ে থাকা দৈনিকটার ওপর। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল ওই লোকটারই ছবি—একটা মহতী জনসভায় বাণীদাতার পোজ-এ।

—আজও বার্লি চলবে নাকি?—বেজার মুখে ঘরে ঢুকল অঞ্জলি।

বলল, বলুন তাড়াতাড়ি। মিস নীলিমা তো দেখলাম তৈরি হচ্ছেন স্কুল যাবার জন্যে। চট করে বারণ করে আসি।

—যত্তো সব ইগ্নেসিয়ার রুগী!—দিব্যেন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, এমন না হলে আর মেয়েছেলের বুদ্ধি!

—আর ব্যাটাছেলের বিবেচনাটাই বা কেমন শুনি! অঞ্জলি ঝঙ্কার দিয়ে বলল, আমি কি মরে গিয়েছিলাম, যে সাত তাড়াতাড়ি নীলিমার ডাক পড়ল বার্লি তৈরি করবার জন্যে?

—মরেছিলে কি বেঁচেছিলে তা আমি জানবো কি করে!—দিব্যেন্দুও উত্তেজিতভাবে বলল, আমি তো এতদিন কারুর টিকি দেখতে পাইনি।

—কেন ডাকতে কি হয়েছিল, শুনি?

—কেন ডাকতে যাব আমি? আমার কি অধিকার আছে যে··· দিব্যেন্দু হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল।

—ওঃ যত অধিকার বুঝি এখন নীলিমাতেই বর্তেছে!

—ওফ—দিব্যেন্দু আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

—কি হলো?—অঞ্জলি এগিয়ে এল সন্ত্রস্তভাবে।

—কিছু নয়।—দিব্যেন্দু সামলে নিয়ে বলল, বিভূতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে? তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন?

অঞ্জলি থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক সেকেণ্ড। তারপর দুম দুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দিব্যেন্দুও চোখ বুজল নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে।

বেলা দেড়টার পর দেখা দিল বৈজু। দিব্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল, তুই এসেছিস! বাঁচালি ভাই!

বৈজু খাতির পেয়ে ঘাবড়ে গেল। চোখ মিটমিট করে বলল, তোর হলো কি রে?

দিব্যেন্দু বলল, খালি নাক ঠেকে যাচ্ছে কাগজে।

—নাক ? কি হলো নাকে ?

—আঃ নাকে আবার কি হবে ! দিব্যেন্দু বলল, কাল সারাদিন বার্লি চালিয়ে আজ দুধ-পাঁউরুটি খেয়ে ফেলেছি পেট ভরে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তুই একটু ঝেড়ে গল্প আরম্ভ কর দেখি।

—গপ্পো ? দেখছিস কাজের তাড়ায় তড়বড় করে বেড়াচ্ছি আমি !—বলেই বৈজু হন্তদন্ত হয়ে ছাদে বেরিয়ে গেল। সটান চলে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল পূব দিকের পাঁচিল ঘেঁষে।

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে দিব্যেন্দুও খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াল বৈজুর পাশে। দেখল, নীচের উঠোনে, সেই তুলসী-মঞ্চটার পাশে যে বকুল গাছটা আছে, তারই ছায়ায় পায়চারি করছে অনাদি আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে।

—চিনতে পারছিস লোকটাকে ? বৈজু মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করল।

—চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে। কে বলতো ?

—সেই দারোগাটা। একদিন মেনকাদাসীকে ঠেঙ্গিয়েছিল। এখন একেবারে অন্য মূর্তি ধরেছে চাকরী যাবার ভয়ে। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ট্রিক্চারটা পড়েছিস তো !

—পড়েছি। বেশ ভাল রায় দিয়েছেন ভদ্রলোক।

ঘরে ফিরে বৈজু এমনভাবে জানলার ধার ঘেষে বসল, যাতে দশ নম্বরের দিকে নজর রাখা যায়। গম্ভীরভাবে বলল, সত্যি, মামা যে কি সব কাণ্ড আরম্ভ করল ওদের নিয়ে! এদিকে হালে পানি না পেয়ে এখন মতলব করেছে হায়ার লেভেলে মুভ করবার। চুলোয় যাক—

—হ্যাঁ, চুলোয় যেতে দে ওসব কথা। দিব্যেন্দু বলল, কিন্তু, তুই ওদিকে অত ঘন ঘন কি দেখছিস ?

—একটা পার্টি আসবে দশ নম্বরের ফ্ল্যাট দেখতে। তাই তেগে বসে আছে।

—ঋষিবাবু কি সত্যিই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিলেন নাকি? দিব্যেন্দু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কাল তোকে জিজ্ঞাসা করবো ভেবেছিলাম। তা তুই এমন কেচ্ছা আরম্ভ করলি অনাদি মুকুজ্জের যে—

—ছেড়ে দেবে না তো কি করবে? বৈজু বেজার হয়ে বলল, এদিকে ভাঁড়ে যার ভবানী তার আবার কোলকাতায় ফ্ল্যাট রেখে নবাবী করা কেন! মামা খুব রেগে গেছে লোকটার আক্কেল দেখে। পরশু থেকে তো আমাদের ওখানেই রয়েছে। মামা কাঁচা খিস্তি ছাড়ছে সমানে।

—ঋষিবাবু তাহলে অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরেছেন?

—শুধু ফিরেছেন? ফিরেই একটা ফৌজদারী বাধিয়েছেন বাড়ির প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে—

—প্রাইভেট টিউটার! তারা তো সব নিরীহ জীব—

—নিরীহ বলেই তো বীরত্বটা অত বেশী করে দেখিয়ে ফেলেছিলেন। শুনলাম, ল্যাংটো করে, থামে বেঁধে, আগা-পাশতলা চাবকে দিয়েছেন। ওদিকে সে ছোকরাও—ছাড়া পেয়ে আগে গিয়ে উঠেছিল থানায়, তারপর উকীলবাড়ি, শেষে গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে।

—ছোকরা প্রাইভেট টিউটার! দিব্যেন্দু সকৌতুকে বলল, ঋষিবাবু কি মেয়ের জন্যে ছোকরা টিউটার রেখেছিলেন নাকি?

—আঃ! মেয়ের টিউটার হতে যাবে কেন! ছোট ভাইপোর টিউটার।

—কি করেছিল সে ছোকরা?

—কি করেছিল! বৈজু হঠাৎ যেন কেমন থমকে গেল। বলল, তা আমি কি করে জানবো!

—সত্যিই জানিস না?

—খেলে কলাপোড়া! বৈজু বিরক্ত হয়ে বলল, পরের ঘরের কেচ্ছা আমি জানবো কি করে!

—ঠিক, না জানাই উচিত! দিব্যেন্দু মাথা নেড়ে বলল. আচ্ছা, কাল যে চিঠিখানা দিয়ে গিয়েছিলি, তাতে কি লেখা ছিল জানিস?

—মামার প্রাইভেট মতলবের কথা আমি জানবো কি করে!

দিব্যেন্দু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৈজুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখের ভাব দেখে সন্দেহ হলো, বৈজু বোধহয় চিঠির মর্মার্থটা সত্যিই জানে না।

—কি রে বাপু, অমন করে চেয়ে রইছিস কেন!—বৈজু যেন একটু অস্বস্তিবোধ করল। বলল, আবার কিছু করেছে নাকি মামা? কিন্তু, যাই করুক, তোর কিন্তু উচিত নয় মামাকে চটানো।

—তোর মামা চটেছেন নাকি আমার ওপর?

—না হলে ডেকে না পাঠিয়ে, চিঠি লেখে! বৈজু বলল, কতদিন থেকে তোর খোসামোদ করছে একটা কনট্রাসেপটিভের জন্যে। কিন্তু তুই কেবলি টাল-বাহানা করে এড়িয়ে যাচ্ছিস।

—কি দরকার আমার খোসামোদ করবার! দিব্যেন্দুও বিরক্ত হয়ে বলল, আমি ছাড়া কি তাঁর কারখানায় আর কেউ কেমিস্ট নেই!

—ওইখানেই তো প্যাঁচে পড়েছে মামা! বৈজু বলল, তোর মতো গেঁতো কেমিস্ট বোধহয় দুনিয়ায় কেউ নেই। কিন্তু, তোর নামডাকটাও তো আর যা তা নয়। আজ পর্যন্ত তুই যত ফরমুলা দিয়েছিস মামাকে, সবগুলোই সেণ্ট পারসেণ্ট সাকসেসফুল হয়ে বাজার-চালু হয়েছে। লাইনের কারবারীরা সক্কলে তেগে বসে আছে তোকে লুফে নেবার জন্যে—যদি মামাকে ছাড়িস। এ ক্ষেত্রে মামা কি উটকো কেমিস্টের কেরামতী দেখবার জন্যে স্পেক্যুলেট করতে পারে, না তোকে চটাতে পারে! তাই নিজের ওপরেই চটছে মনে মনে। কিন্তু, তুই তো ভাই জানিস, মামা সত্যিই ভালবাসে তোকে। একটা মধ্যপন্থা বার করতে পারিস না?

সযত্নে গোপন করে রাখা মনের বিশ্বাসটা যদি অপরের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে, তাহলে আনন্দ হয় বইকি! কিন্তু আনন্দের

আত্মবিশ্বাসে কতখানি স্বার্থত্যাগ করা শান্তিপ্রিয় বুদ্ধিজীবীর পক্ষে সম্ভবপর! স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে মনের শান্তি—জীবনের আদর্শবাদের আপোষ চলতে পারে কি! সত্যকে বুদ্ধি দিয়ে বিকৃত করলে অবশ্য মধ্যপন্থা বার করা যায়। কিন্তু, সকলেই কি সব কাজ পারে!—কেন করতে যাবে সে! এ দুনিয়ায় কার ধার ধারে সে! তবে, একটা কাজ সে পারে—

—লোকটার হলো কি! বৈজু উঠে পড়ে বলল, দুটোয় আসবার কথা, এদিকে তো তিনটে বেজে গেল। আমি বরং সদরে গিয়ে দাঁড়াই!

—দাঁড়া। দিব্যেন্দু বলল, তোকে সি. আই. টি রোডের একটা বাড়ির কথা বলেছিলাম, মনে আছে?

—আছে, কেন?

—তুই আজই একবার যা সেখানে। যদি পাওয়া যায়, সব ঠিক-ঠাক করে আয় একেবারে!

—কি ব্যাপার! বৈজু আশ্চর্য হয়ে বলল, আবার বাড়ি বদলানোর পোকা মাথায় ঢুকল কেন! ডবল বন্ধুনী সামলাতে পারছিস না?

—আঃ!

—আচ্ছা আচ্ছা, আজই যাবো'খন সেখানে।

বৈজু চলে যাবার পর দিব্যেন্দু সেই আবেদন পত্রটা নিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু, মনকে আচ্ছন্ন করে রইল ভগবানবাবুর চিঠিখানা। কি করবে সে? ভবিষ্যতের আশায় অতীতকে ভুলে সংসার করা কি সম্ভবপর হবে তার পক্ষে? নাঃ, ব্যাপার যে ভাবে গড়িয়ে চলেছে, আর যেন নিজের ওপর ভরসা রাখা যাচ্ছে না! কি করবে সে? মেনে নেবে, নিয়তি কেন বাধ্যতে? পুরুষকার বলে সত্যিই কি কিছু নেই? বুদ্ধিজীবীর অস্থির মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

—কি আশ্চর্যি ভাই ঠাকুরপো—বলতে বলতে স-কন্যা উকীল-গিন্নী ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কাল থেকে যখনই মনে করেছি, যাই, দেখে আসি একবার রোগা মানুষটাকে। ওমা, তখনই দেখি ওই মুখপোড়া আগলে বসে আছে।

উকীল-গিন্নী জমে বসে কুশল সমাচার গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরেই এলেন নীলিমার মা—হাঁপানির জন্যে ভগবানের মুণ্ডপাত করতে করতে। তারপর এল অজয়, কলেজ থেকে ফিরে। অতঃপর দেখা দিলেন রমেশবাবু, আদালত শেষ করে। শেষে, যে কখনও আসে নি, সে-ও এল। সহানুভূতি বা দুশ্চিন্তা নয়। নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই দেখতে এলেন সকলে—একটা অদ্ভুত প্রকৃতির পালোয়ান লোক শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে কি করে!

আতিশয্যটা দিব্যেন্দুকে কাহিল করে ফেললেও ভদ্রতা ভুলল না সে। বিপাশার পিছনে প্রফুল্লও এসেছিল। তাকেও বসতে বলল।

রীতিমত সেজে এসেছিল বিপাশা। তার অতি-প্রসাধনের উগ্র গন্ধে সমস্ত তেতলাটা যেন রম রম করছিল। মিষ্টি করে হেসে সে বলল, শুনলাম, একসারসাইজ করতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছেন!

অন্যান্য এসেন্সের মধ্যে থেকে ওডিকোলনের গন্ধটাকে এতক্ষণে সঠিকভাবে চিনতে পারল দিব্যেন্দু। সে বিপাশার ভদ্রতার উত্তরে ভদ্রতা করতে লাগল বটে; কিন্তু, গন্ধটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

ওদিকে প্রফুল্ল উসখুস করছিল। বলল, এদিকে কিন্তু পাঁচটা বাজে।

—কোথাও বেরুচ্ছিলেন বুঝি? দিব্যেন্দু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল।

—আর বলেন কেন! আর এক রকমের হাসি হেসে বিপাশা বলল, ওপাড়ার স্টুডেণ্টরা কি যেন একটা সম্মেলন করছে। আবদার

ধরেছে, আমাকে সেখানে গিয়ে চীফ-গেস্ট হতেই হবে। এত করে বলি, শরীর আমার ভাল নয়! কিন্তু, কে শোনে কার কথা!

—সত্যি ভাই ঠাকুরপো! উকীল-গিন্নী সঙ্গে সঙ্গেই গদগদ হয়ে বললেন, সেদিন কি চেহারা ছিল বিপাশার। ওর ছবি এলে কি কাণ্ড যে হতো তখন—

—একজ্যাক্‌টলি। প্রফুল্ল বলল দিব্যেন্দুর উদ্দেশে, আপনি তো শুনেছি কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিকিৎসা করেন। ওর শরীরটাকে আবার আগেকার মতো করে দিতে পারেন?

—কি বলেন! বিপাশাও হাসিমুখে বলল, দেব নাকি একটা সীটিং?

প্রসঙ্গটা একেবারে আশাতীত। বিরক্তি চেপে দিব্যেন্দু বলল, পরে জানাব। আপাততঃ আমার একটু বিশ্রাম করা দরকার।

ইঙ্গিতটা বৃথা গেল না। বিপাশা সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থানোদ্যত হলো। বলে গেল, দেখবেন, ভুলবেন না যেন। নমস্কার।

—নমস্কার!

—বেলা গেল, আমরাও উঠি। আবার কাল আসবো'খন খবর নিতে। মেয়েরাও একে একে প্রস্থান করলেন। কিন্তু, অজয়, রমেশবাবু আর প্রফুল্ল বসেই রইল।

—কি ব্যাপার? দিব্যেন্দু অগত্যা জিজ্ঞাসা করল, কোন কথা আছে নাকি?

—সেই অ্যাপীলটা? রমেশবাবু বললেন, পড়ে দেখেছেন তো?

—ওহো! দিব্যেন্দু বালিশের তলা থেকে কাগজগুলো বার করে রমেশবাবুর হাতে দিল।

—কই? পাতা উল্টে যথাস্থানে নজর দিয়েই রমেশবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। বললেন, সই তো করেন নি?

—না মশাই ওটা পারবো না। দিব্যেন্দু সহজভাবেই বলল,

ওদের জন্যে আমার তো কোন অসুবিধা হয় না। অকারণ পেছনে লাগতে যাব কেন বলুন!

সকলেই মিনিটখানেক হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর প্রফুল্ল বলল, ওদের সম্বন্ধে সরকার কি আইন পাশ করেছেন, আপনি কি তা জানেন না?

—জানি বৈকি।

—তবে? এতবড় একটা বে-আইনী ব্যাপারকে আপনি জেনে শুনে প্রশ্রয় দিতে চান?

—আমার কথা থাক, আপনাদের কথা বলুন! দিব্যেন্দু বিরক্তি চেপে বলল, হঠাৎ এত আইনভক্ত হয়ে উঠলেন কেন? সরকারের সব আইনকে কি আপনারা মেনে চলেন, না ভাল মনে করেন?

—ও সব বাজে কথা রাখুন। প্রফুল্ল উগ্রস্বরে বলল, আমি জানতে চাই, আপনি ওদের তাড়াতে রাজি আছেন কি না?

প্রফুল্লর মেজাজ দেখে দিব্যেন্দু ভ্রূকুটি করল। কিন্তু সংযম হারাল না। বলল, তাড়িয়ে দিলে ওরা যাবে কোথায়? যারা ওদের কাছে আসে, তারাই বা যাবে কোথায়?

—কোথায় যাবে তা আমরা কি জানি?

—আপনাদের সরকার তবু একটু দরদ দেখিয়েছেন আশ্রম তৈরীর আশা দিয়ে। সেখানে গিয়ে ওরা নাকি চাটনী তৈরী করবে। তা যতদিন না চাটনীর আড়ৎ তৈরী হয়, ততদিন সকলকে মিলে মিশেই থাকতে হবে। উপায় কি?

—মিলে মিশে থাকতে হবে? বেশ্যাদের সঙ্গে? কি বলছেন মশাই?

—ঠিকই বলছি। একদিন এই বাড়িগুলো, এই পল্লীটা ওদেরই ছিল। ওরা কোন ভদ্রপল্লীতে গিয়ে হানা দেয়নি; ভদ্রলোকেই ওদের ভিটেতে এসে চড়াও হয়েছে আইন ট্যাকে করে। কিন্তু ওরা তো আর রাতারাতি উবে যেতে পারে না কর্পূরের মতো।

আপনাদের যদি অসুবিধা হয়, আপনারাই তাহলে উঠে যান এখান থেকে।

—এই তাহলে আপনার শেষ কথা?

—আহা, রাগারাগি করছেন কেন? প্রফুল্লকে বাধা দিয়ে রমেশ-বাবু দিব্যেন্দুর উদ্দেশ্যে বললেন, দেখুন আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। আপনি নিশ্চয়ই এটা সমর্থন করেন না!

—আপনিও একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক রমেশবাবু। দিব্যেন্দু জবাব দিল, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এ বৃত্তিটা কারুর সমর্থন অসমর্থনের ধার ধারে না। চলেছে, চলছে, এবং চিরকালই চলতে বাধ্য। আপনাদের নয়া-জমানার ভগবানেরা মেরে কেটে বৃত্তিটার নাম বদলে দিতে পারেন; কিন্তু উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা স্বয়ং সত্যিকার ভগবানেরও নেই।

—হয়তো তাই! রমেশবাবু হাসিমুখেই বললেন, কিন্তু, আপাততঃ আমাদের মতো ভদ্রলোকদের সামাজিক অবস্থাটাও আপনার বিবেচনা করা উচিত।

—উচিত বলেই তো আপনাদের লয়ে লয় দিতে পারছি না। আমার তো মনে হয়, পাড়াতুতো দাদাদের বোন হওয়ার চাইতে বা ওড়িকোলন খেয়ে ভদ্রতা বজায় রাখার চাইতে, যথাস্থানে গিয়ে মদ খেয়ে ছোটলোক সাজা ঢের কল্যাণকর—স্বাস্থ্য এবং সমাজের পক্ষে।

—আর এক মুহূর্ত নয়। রমেশবাবুর একটা হাত ধরে হেঁচকা টান মারল প্রফুল্ল। বলল, উঠুন এক্ষুনি—এক্ষুনি।

—এই তাহলে আপনার শেষ কথা? রমেশবাবু অগত্যা উঠতে উঠতে বললেন।

—আর একটা কথা আছে। দিব্যেন্দু বলল, আপনি ঠিক জানেন তো ওরা বেশ্যা?

রমেশবাবু গাল চুলকে বললেন, শুনেছি কালিঘাটের মালা বদল করে ওদের কি সব হয়। কিন্তু, আজকের দিনে ও সব তো টিকবে না!

—আমি ও পয়েণ্ট তুলি নি। বলছি, আজকের দিনে বেশ্যা বলে কিছু নেই। আইনতঃ সকলেই ভদ্রলোক—সকলেই সমান। প্রমাণ করতে না পারলে আপনাদেরকেই মুস্কিলে পড়তে হবে।

—মশাইয়ের বেশ্যা প্রীতিটা দেখছি সাংঘাতিক!—প্রফুল্ল সশ্লেষে বলল, তা মুস্কিলটা বাধাবেন কে? মশাই নাকি?

—সময় কই? খেটে খেতে হয় যে! দিব্যেন্দু বলল, আমার ঘরে তো আ:ব রোজগেরে বৌ নেই যে বসে বসে খাওয়াবে।

—কিঃ?

—থামলেন কেন? দিব্যেন্দু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আইন তো অনেক জানেন! পরের ঘরে ট্রেসপাশ করলে কি হয় জানেন?

—আহা এ সব কি হচ্ছে! রমেশবাবুই শেষ রক্ষা করলেন। বললেন, আপনারা দেখছি সকলেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। চলুন—চলুন—

কিন্তু, রমেশবাবুর মতো ঠাণ্ডা মানুষও মেজাজ হারালেন দোতলায় নেবে। প্রফুল্লর উদ্দেশে বললেন, আপনাকে সঙ্গে নেওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল।

—বটে? প্রফুল্ল রুখে দাঁড়াল।

—কি হলো? ও ধারে ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল সুদর্শন, এগিয়ে এসে বলল, কি হলো মশাই?

—যা হবার তাই হলো। গোবর একেবারে মাঠময় করে দিয়ে এলেন ইনি।

—গোবর? আমি মাঠময় করলুম?

—নয় তো কি? রমেশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, কাকে মেজাজ দেখাতে গিয়েছিলেন আপনি? ওকে কি একটা রকফেলো ঠাওরে ছিলেন যে, ফিলিম এ্যাক্‌ট্রেসের স্বামী সেজে রোয়াব নেবেন? কোন কম্মের নয়, কেবল কাজ ভণ্ডুল করতে পারেন আপনি!

—বটে? প্রফুল্ল উগ্রস্বরে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু,

সুদর্শন তাকে টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। প্রফুল্ল বলতে বলতে গেল, আমাকে অপমান? আচ্ছা দেখি, কেমন করে তোমার মেয়ে চান্স পায়!

রমেশবাবু অতঃপর অজয়ের হাত ধরলেন। বললেন, এখনও আশা আছে, যদি তুমি একটা কাজ করতে পারো।

—বলুন।

—দেখ, ওই অঞ্জলি মেয়েটাকে যদি বাগাতে পারো! ওর কথা কিছুতেই ফেলতে পারবে না চৌধুরী।

—বুঝেছি। অজয় তৎক্ষণাৎ অঞ্জলির ঘরের সুমুখে গিয়ে ডাকল, অঞ্জুদি—

সঙ্গে সঙ্গে রমেশবাবুও নীলিমার দ্বারস্থ হয়ে ডাক দিলেন, মা লক্ষ্মী—

কিন্তু, প্রস্তাব শুনে নীলিমার নির্বিকার মুখও আরক্ত হয়ে উঠল। এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেলল সে ঃ এ সব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আমাকে টানছেন কেন? আমি কেন ওঁকে অনুরোধ করতে যাব? আর, যে লোক আপনাদেরকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে আমার অনুরোধই বা রাখবে কেন তা তো বুঝতে পারছি না।

—মা লক্ষ্মী, আমার বয়সটাকে অবজ্ঞা করো না। রমেশবাবু অসহায়ের মতো বললেন, অ্যাপীলটা আন-অ্যানিমাস হওয়া চাই-ই। আমি বলছি, তোমার অনুরোধ ও না রেখে পারবে না। এ বাড়ির এতগুলো লোকের জন্যে এটুকু কষ্ট তুমি স্বীকার করবে না মা লক্ষ্মী?

—এ কিন্তু আপনার অন্যায় অনুরোধ!

—জানি! তবুও অনুরোধ করছি, তুমি শুধু গিয়ে একবার অঞ্জলির পাশে দাঁড়াও। কথা কইতে হবে না। তোমার ব্যক্তিত্বেই কাজ হবে। এসো!

অগত্যা, নীলিমাকে ওপরে যেতেই হলো। ফিরল, প্রায় এক ঘণ্টা পরে, অঞ্জলির সঙ্গে।

ওদিকে, রমেশবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে বসেছিলেন নিজের ঘরে; অঞ্জলি সটান তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলো। নীলিমাও তার পিছনে গেল, কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো।

—দেখি সেই অ্যাপীলটা? কলম আছে?

—এই যে—রমেশবাবু সাগ্রহে কাগজ কলম দিলেন অঞ্জলির হাতে।

কলম নিয়ে অঞ্জলি নিজের স্বাক্ষরটার ওপর ভাল করে দাগা বোলাল। তারপর, কাগজ-কলম দিল নীলিমার হাতে।

নীলিমা অঞ্জলির মতো দাগা বোলাতে পারল না; নিজের স্বাক্ষরটাকে কেটে দিল কোন রকমে। তারপর নীরবেই বেরিয়ে এল অগ্রবর্তিনীর পিছন পিছন।

না, এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি নীলিমার জীবনে। কখনও যে ঘটতে পারে, তাও সে কল্পনা করেনি কখনও। একটা অজানা জগতের অচিন্ত্যপূর্ব সত্যাসত্য একেবারে যেন বিভ্রান্ত করে ফেলেছিল তাকে। সত্যিই যেন মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল তার এতদিনকার এত কিছু জানা।

—একটা ছোট্ট ব্যাপারকে এত বড় করে তুলছেন কেন?—অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করেছিল দিব্যেন্দুকে।

—একটা মারাত্মক ব্যাপার নিয়ে যারা ছেলেখেলা করে, তাদের দলে ভেড়বার মতো প্রবৃত্তি নেই বলে।—দিব্যেন্দু উত্তর দিয়েছিল।

দিব্যেন্দু কেবল নিজে পার্টি হতে চায় নি এই বেশ্যা-বিতাড়ন অভিযানের। কিন্তু, অঞ্জলি তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল দলে টানবার জিদ্ ধরে।

নীলিমার চোখের সামনে আবার যেন ভেসে ওঠে অস্পষ্ট

দিব্যেন্দুর আরক্ত মুখখানা। তার উত্তেজিত কণ্ঠের অকাট্য যুক্তিগুলো। অবশ্য, যাঁদের উদাহরণ স্থাপন করে দিব্যেন্দু তার বক্তব্য পরিবেশন করেছিল, সেই সব সেন্‌জার, সরোকিন, টোয়েন-বী প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের নামও শোনেনি সে কখনও। কিন্তু, বিচলিত হয়েছিল তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে। বিস্মিত হয়েছিল, দিব্যেন্দুর পড়াশোনার পরিমাণটা কল্পনা করে। শেষে, মনস্থির করবার মনটাকেও হারিয়ে ফেলেছিল সে, একটা প্রত্যক্ষ ঘটনার উদাহরণ শুনে। দিব্যেন্দু বলেছিল—

রামচন্দ্র নিকেতনের ঠিক উল্টো দিকে, সাঁতরা রোডের ওপর ওই যে একটা হলদে রঙের দোতলা দেখা যাচ্ছে, ঘটনাটা ঘটেছিল ওই বাড়িতেই। আজ থেকে ঠিক একুশ বছর আগে।

তখন যুদ্ধের আবহাওয়াটা বেশ গা-সওয়া হয়ে এসেছিল কোলকাতার বাসিন্দাদের। তখনও পাড়ায় ভদ্রলোক ছিলেন প্রচুর। তবুও ঘটনাটা ঘটেছিল।

যুদ্ধের বাজারে মিলিটারীর শুভাগমন হলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, সেদিনকার ইংরাজ রাজার জাত তা ভাল করেই জানতো। তারা জানতো, সেদিন চাহিদার তুলনায় সহরে পণ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল কত। ম্যান-মেড মন্বন্তরের কল্যাণে কত হাজার হতভাগিনীকে পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। দরিদ্র মধ্যবিত্তদের ঘর থেকে কি পরিমাণ মেয়ে প্রলোভিত হতে পারে টাকার লোভে এবং আরও কত সাপ্লাই দিতে পারলে তবে সিভিল-মিলিটারির ভারসাম্য ঠিক থাকবে। তাই তারা নার্স, ওয়াকী, টুরিং গাইড, ক্যান্টিন সুপারিনটেনডেণ্ট প্রভৃতি হরেক রকমের বৃত্তির মাধ্যমেও মহিলাকর্মী আমদানী করেছিল সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে। কিন্তু, তবুও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, প্রয়োজনের তুলনায় সেদিনকার সাপ্লাইটা ছিল অকিঞ্চিৎকর—দেশটা সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হওয়া সত্ত্বেও।

সেদিন, আজকেকার এই হনুমান হাউসেও মিলিটারির কিউ পড়তো নিয়মিতভাবেই। কিন্তু, মেয়েগুলোর প্রাণ সংশয় হতো নতুন এবং পুরোন খদ্দেরের চাপে। তারপর একদিন সত্যিই একটা স্ত্রীলোক মরে গেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। সেদিনকার সেই মেয়েটাই ছিল, আজকেকার ওই রানীবালার গর্ভধারিণী জ্ঞানদা দাসী।

খবরটা চাপা রইল না। তাই, পরের দিন দুপুর বেলায়, আবার যখন একদল এসে হানা দিল সনকা-সদনে, তখন সামনের ওই পেট্রোল-পাম্পের গোটাকতক শিখ তৈরি হয়ে রইল ডাণ্ডা নিয়ে। যথাসময় মাথাও ফাটল জন দুয়েকের। মিলিটারি পুলিশ এল। এবং, এসে এমন কাণ্ড করল যে সনকাদাসীর গলিটা ফাঁকা হয়ে গেল রাতারাতি। পরদিন সকালে পাড়ার কিছু ভদ্রলোকও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রায় একশ বছরের পুরোন একটা আস্তাকুড়কে অকস্মাৎ সাফ হয়ে যেতে দেখলে কে আর অসন্তুষ্ট হয়! অবশ্য, পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদের জন্য তাঁদের মস্তিষ্কে সেদিন কোন পোকা ঢোকেনি; বরং, পাড়াটা চিহ্নিত হয়ে থাকার জন্যে তাঁরা একরকম নিশ্চিন্তই ছিলেন এতদিন। আরও নিশ্চিন্ত হলেন মিলিটারির কল্যাণে। এই ভদ্রলোকদের মধ্যেই একজন বয়স্থ কেরানী ছিলেন। তিনিই ভাড়াটে ছিলেন ওই হলদে বাড়িটার। সংসারে ছিল তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী, হবু গ্র্যাজুয়েট একটি ছেলে এবং সদ্য বিবাহিতা একটি মেয়ে। ভদ্রলোক সেদিন সকালে তো বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে অফিসে চলে গেলেন। কিন্তু, দুপুরবেলায় ঘটে গেল আর এক ঘটনা। মাত্র জন ছয়েক পদাতিকের একটা ছোট্ট দল খিদিরপুরে পাত্তা না পেয়ে—বেশী টাকা পকেটে করে সনকা-সদনে এসে হাজির হলো। তারপর, বাড়ি ফাঁকা দেখে হানা দিল পাড়ার অন্যান্য বাড়িতে।

এ সব কলঙ্কর কথা চেপে যাওয়াই রেওয়াজ। তাই অন্যান্য

বাড়িতে কি হয়েছিল সে ঘটনা জানা যায় নি! ও বাড়ির কথাটাও হয়তো জানা যেত না কোনদিন যদি কেরানীবাবুর কন্যাটি কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যবতী হতেন বা স্ত্রীটি কিল খেয়ে কিল হজম করে ফেলবার মতো বুদ্ধি রাখতেন। ব্যাপারটা জানা গেল পরদিন সকালে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান মেয়েটাকে বাঁচাতে পারে নি; রাত্তিরেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু, মা মরেন নি, মূর্ছা গিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর ধাতস্থ হতে সময় লেগেছিল দিন দুয়েক। তারপর, তিনিও নিপাত্তা হলেন। তৃতীয় দিনে তাঁর লাশ পাওয়া গিয়েছিল বাবুঘাটের এলাকায় একটা বয়ার শেকলে।

ইতিমধ্যে, দিন দুয়েক অন্ধকার থাকবার পর আবার আলো জ্বলতে আরম্ভ করেছিল সনকাদাসীর গলিতে। কিন্তু, হলদে বাড়ির কেরানীবাবুর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠল পাড়ার লোকের আহা উহুর ঠ্যালায়। অগত্যা, তিনি এ পাড়া ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেলেন। কিন্তু, তাঁর হবু গ্র্যাজুয়েট ছেলেটা কেমন যেন বিগড়ে গেল সেই সময় থেকেই। কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ার লোকেরা জানতে পারলেন, ছেলেটা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে একেবারে ছোটলোক হয়ে গিয়েছে।

ছোটলোকের খবর আর কোন ভদ্রলোক রাখেন! তাই তাঁরা জানতে পারলেন না ছেচল্লিশের সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে যারা তাঁদের মা-বোনের ইজ্জৎ বাঁচিয়েছিল, তাদের মোড়ল ছিল কে। খুনী আসামী হিসাবে কেমন করে সে ধুলো দিতে পেরেছিল পুলিশের চোখে। নিজে সাংঘাতিক রকমের আহত হয়েও, কেমন করে, কোথায় গিয়ে সে আত্মগোপন করেছিল। তারপর—

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর সে যখন আবার আত্মপ্রকাশ করল, তখন পাড়ার লোকেরা জানতে পারলেন,—সেদিন যাকে আশ্রয় দিতে কেউ ভরসা করে নি, তাকে আশ্রয় দিয়েছিল মেনকাদাসীর মতো একটা পতিতা। পতিতাদের সেবা গ্রহণ করেই সেদিন প্রাণ বাঁচিয়েছিল সেই সদ-ব্রাহ্মণের ছোটলোক ছেলেটা। তারপর,

বোধহয়, ওদের অন্নের ঋণ শোধ করবার জন্যেই কালীঘাটের একটা বামুন ডেকে এনে মালা বদল করেছিল মেনকাদাসীর দৌহিত্রীর সঙ্গে। এই ছোটলোকটার নামই অনাদি মুকুজ্জে।

নীলিমার অভিভূত ভাবটা হঠাৎ কেটে গেল অঞ্জলির গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজে। নিভাননীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল সে,—আপনার গোল্ডমেডেলকে বলে দেবেন ওঁর পায়ের তলায় বসে দশ বারো বছর ডাক্তারী শিখতে, তাহলে আর বৌয়ের পয়সায় পেট চালাতে হবে না। আর, হালদারকে ইনজেকশান দেওয়ার ফিস? তাকে বিল পাঠাতে বলবেন। চার আনা হারে তিন মাসের ফিস তক্ষুনি দিয়ে দেবেন উনি। ভয় নেই, তার জন্যে ভগবানবাবুর চাকরীটা তার কেড়ে নেবেন না উনি।

—ছি ছি, আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? নীলিমা তাড়াতাড়ি গিয়ে নিরস্ত করল অঞ্জলিকে। জোর করে তাকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, লোকে যে আপনাকেই নিন্দে করবে। দিব্যেন্দু বাবুও সব শুনেছেন নিশ্চয়ই!

—তার আক্কেলের জন্যেই তো মুখ খুলতে হলো আমাকে। অঞ্জলি চড়া গলায় বলল, বাড়িতে অমন একজন গোল্ডমেডেল থাকতে, কেন উনি অন্য ডাক্তার ডেকেছিলেন নিজের চিকিৎসার জন্যে! মেডেলের ওপর এতই যদি অশ্রদ্ধা, তাহলে কেন তার ঘাড়ে হালদারকে চাপানো হয়েছিল! পয়সা বাঁচাবার জন্যে কেন তখন বন্ধুত্বর অভিনয় করা হয়েছিল! কাজের বেলায় কাজী আর কাজ ফুরোলেই পাজী! কেমন ভদ্রলোক ওই দিব্যেন্দু চৌধুরী? জবাব দিতে পারেন এ সব কথার?

—আহা, কেন আপনি রাগ করছেন! নীলিমা বুঝিয়ে বলল, ডক্টর গুপ্তে যে একজন কেমিস্ট—চিকিৎসক নন—ওঁর কাছে

এসেছিলেন অন্য কাজে, সেটা নিভাননীকে বুঝিয়ে বললেই তো হতো! আপনিও তো ভাই কম মেয়েটি নন……

—উঃ, কি আমার স্বামী-দরদী রে! আমার সঙ্গে ওঁকে জড়িয়ে খোঁটা দেওয়া! তবু যদি না রাত বেড়ানী-হতেন……

—ছিঃ ভাই!

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অকস্মাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল অঞ্জলি। ছিঃ দিক আমাকে! নরকের কীটনুকীট আমি, দুনিয়ার লোক ছিঃ দিক আমাকে। আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু উনি? ওঁকে ছিঃ দেবে কেন? দুনিয়ার লোক ছিঃ দিক; কিন্তু এরা? আর কেউ না জানুক, এ বাড়ির সকলেই তো জানে ভাল করে—গোল্ডমেডেল তো ভাল করেই চাউর করে দিয়েছে—কিসের ইনজেকশান দেয় সে হালদারকে। কী সে অসুখ হালদারের! কে তার চিকিৎসার খরচ দিচ্ছে! আর কেউ না জানুক, এ বাড়ির সকলে তো জানে! তবুও ওঁকে নিয়ে টানাটানি! আমার সঙ্গে নোংরা সম্পর্ক ওঁর? তাই বুঝি উনি এত খরচ-পত্তর করে নিজের স্বার্থের পথে নিজেই কাঁটা দিচ্ছেন! উঃ মাগো—এরা কি……

—ছিঃ ভাই, কার ওপর রাগ করছো তুমি! নীলিমা অঞ্জলির চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, ওরা কি তা কি জান না?

—কিন্তু—সহানুভূতির সুনিবিড় স্পর্শে শুধু চোখের জলই বাঁধ ভাঙ্গে না, উন্মুক্ত হয় গহীন মনের গোপন কপাট—অঞ্জলির জীবন যন্ত্রণার অকপট কাহিনী। অনর্গল, অসংলগ্ন ভাষায় শুধু নিজের কথাটাই জানাতে চায় সে। একটা ভুলের জন্যে আজ সে কেউ নয় দিব্যেন্দুর। কিন্তু, যদি সে ভুল না করতো, তাহলে কি হতো আজ?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না নীলিমা মুখের ভাষায়; কিন্তু, বুকের ভাষাকে উদগ্র করে তোলে আর এক রকমের দুঃসহ দুর্বোধ্য সত্য।

ঘরে ফিরতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—কেন ? নীলিমা থমকে দাঁড়াল।

—হারামজাদী, কি ভেবেছিস তুই ? বৃদ্ধা এবার নিজমূর্তি ধরলেন। বললেন, দু' পয়সা ঘরে আনিস বলে একেবারে নির্মস্তক হয়ে উঠবি ? ভদ্র সমাজে মুখ দেখাবার উপায় রাখলি না ছেলেটার ? বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগে ধরেছে তোমায়—

—মা, চুপ করো ! নীলিমা বাধা দিয়ে বলল, তোমার কথার জবাব কাল দোব, আজ চুপ করো।

—জবাব দিবি ? জবাব আবার কিসের দিবি লা ?

—ওই তো বললাম। নীলিমা শান্তভাবেই বলল, আমার জন্যে তোমাদের মুখ যাতে না পোড়ে, তার ব্যবস্থা আমি কালই করবো।

—ব্যবস্থা করবি ? কিসের ব্যবস্থা করবি, শুনি ?

—এখন শুনে আর কি করবে ! কালই দেখতে পাবে।

—দেখতে পাবো ? কি দেখাবি আমাকে, শুনি ?

নীলিমা আর জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার খুঁত ধরবার মতো মনের অবস্থা তার আর তখন ছিল না ; মা-ভাইয়ের রুচি-প্রবৃত্তির কথা ভেবেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ—যদিও, চরম সিদ্ধান্তটা ইতিপূর্বেই গ্রহণ করে ফেলেছিল সে।

পিতৃহীন হয়েছিল সে সতের বছর বয়সে। বছর তিনেক কেটেছিল মাসী-পিসীদের সংসারে দাসীবৃত্তি করে। তারপর থেকে, কত কষ্ট সহ্য করে, কি অমানুষিক পরিশ্রম করে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে—নিশ্চিন্ত অন্নর বন্দোবস্ত করতে পেরেছে মা-ভাইয়ের জন্যে—সেই সব পুরোণ কথা মনে পড়তে লাগল তার। মনে পড়ল, স্কুলের খাটুনী ছাড়াও সকাল-সন্ধ্যা তিনটে ট্যুইশানী করতে হয় তাকে, ছোট ভাইটারই লেখাপড়া চালাবার জন্যে। অথচ, ভাই কি করছেন ? লুকিয়ে প্রাইভেট ট্যুইশানী করে মাইনের টাকাটা

ওড়াচ্ছেন লতিকা যূথিকাদের সিনেমা দেখিয়ে, হোটেলে খাইয়ে। প্রকাশ্যে, দলের দলী হয়ে সমালোচনা করছেন বড় বোনের নৈতিক চরিত্র নিয়ে।

আর, মা কি করেছেন? জিভের বিষে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পর করেছেন যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন ছিল। এখন দিবারাত্রি বিষোদ্‌গার করছেন তার উদ্দেশ্যে, ছেলেটার জন্যে আরও বেশী খরচ করতে না পারার জন্যে। ছেলেই তাঁর ভবিষ্যতের আলো—মেয়েটা তো—মেশিন!

আরে সে কী করেছে। ক্রমাগত ভয় করে এসেছে মায়ের জিভের ধারকে। দুর্বিনীত কনিষ্ঠের যাবতীয় উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছে, ওই মায়েরই বাক্যবানের ভয়ে।

তার অপরাধ? সে আজ চোর দায়ে ধরা পড়েছে, নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে দু' পয়সা উপার্জন করতে পারে বলেই।

একই মায়ের সন্তান তারা। কিন্তু, মায়ের কাছে সে একটা অর্থোপার্জনের মেশিন ছাড়া আর কিছুই নয়।···মেয়েটার যে বিয়ে হলো না। সে যে কোনদিন মা হতে পারবে না। সে যে নিজের ভবিষ্যৎ না ভেবে কেবল ওই ছোট ভাইটাকে মানুষ করবার জন্যেই প্রাণপাত করছে—এত সব ত্যাগ স্বীকারের কোন মূল্য নেই বৃদ্ধার কাছে। তিনি কেবল ছেলের খেয়াল-খুশী মেটাতেই ব্যস্ত মেয়ের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের বিনিময়ে। আর সেই জন্যেই তাঁর এত আতঙ্ক অবিবাহিতা কন্যার চরিত্র নিষ্ঠা সম্পর্কে। অথচ—

সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই সে যদি কঠোর হতে পারতো! যদি না ভয় করতো ওই স্বার্থপর কলহপ্রিয়া বৃদ্ধাটাকে, তাহলে আজ···

হয়তো আজ আর তার কোন মূল্য নেই নারী হিসাবে···কারুর কাছে। কিন্তু, পাঁচ বছর পূর্বে······

—মাঈজী!

—বাহাদুর ? নীলিমা আশ্চর্য হয়ে বলল, কি ব্যাপার ?

বাহাদুর একটা চিরকুট এগিয়ে ধরল ঃ একবার যদি ওপরে আসেন, অত্যন্ত অনুগৃহীত হবো। ইতি শয্যাশায়ী দিব্যেন্দু।

—কি হয়েছে ?

—ক্যা জানি। মালিক তো ফিন গড়বড়ায়া—

—আচ্ছা, তুমি যাও।

বাহাদুর চলে গেল।

কিন্তু, আবার ওপরে যাওয়াটা কি তার পক্ষে উচিত কাজ হবে! —নীলিমার ভাবনা ভিন্নমুখী হয়—সূচনাতেই মা যেটুকু ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার পরিণাম যে কি হবে তা সে ভাল করেই জানে। বিশেষতঃ অজয়টা যখন ওদের দলেরই একজন। কিন্তু, সত্যিই কি তার নিজস্ব সত্ত্বা বলে কিছু নেই! জীবন-ভোর সে কি কেবল ভয় করেই চলবে—ওরা ভয় দেখাতে পারে বলেই! তাকে কি কারুর ভয় করবার কিছু নেই! সে কি পারে না অঞ্জলির মতো চোখ রাঙ্গাতে! দিব্যেন্দুর মতো স্পষ্ট কথা বলতে! অবশ্য—

দিব্যেন্দুর কথাগুলো না শুনলে সে হয়তো মাথা গলাতো না এই বিশ্রী নোংরা ব্যাপারে। কিন্তু, ও ভদ্রলোক কি কেবল লাগ-সই কথা বলেই সামান্যকে অসামান্য প্রতিপন্ন করেছেন! তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তার মতো শিক্ষিতা মেয়েকে! যুক্তি দেখান নি! উনি কি সাধারণ লোক! অঞ্জলির অত কান্নার পরও সে কি অন্ধ হয়ে থাকবে, নিজের জানাটাকেই সর্বস্ব ভেবে! সত্যিকার মহৎকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে পারবে না!

বিষয়বস্তুটা নোংরা ? কিন্তু, একটা প্রকাশ্য ব্যবস্থাকে ধামা চাপা দেবার অজুহাতে অসংখ্য অপ্রকাশ্য নোংরামীকে আমদানী করাটা কি আরও নীচুস্তরের নোংরামী নয় ?

সঙ্কোচের কারণটা কি ? সে নিজে মেয়ে বলে ? ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মহিলার বাজার-চালু ঐতিহ্যটা নষ্ট হয়ে যাবে বলে ?

হায় রে! তবু যদি না সে স্কুল মিসট্রেস হতো—যদি না জানতো মেয়েদের বাজার-দরটা আসলে শিক্ষা-দীক্ষার না আর কিছুর!

আশ্চর্য! শিক্ষিতা হলেই কি ভুলে যেতে হবে আমি আসলে মেয়ে—পুরুষ নই! নিরীহদের অনাগত বিপদের কথাটা স্রেফ অগ্রাহ্য করতে হবে উঁচু সমাজের রঙচঙে ব্যবস্থাটা কায়েম করবার জন্যে! অন্ধ সেজে মনকে চোখ ঠারতেই হবে সব কিছু জেনে শুনেও! মনুষ্য সমাজের আদিম বৃত্তিরূপে যা প্রমানিত সত্য, তার প্রকাশ্য পরিচয়টাকে বে-আইনী করে দেওয়ার একমাত্র পরিণাম যে গুপ্ত ব্যবসায়ীদের বংশবৃদ্ধি করা, বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ঘরের শান্তিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা—এই সোজা হিসাবটা বোঝবার জন্যে কি খব বেশী চিন্তাশক্তির দরকার! দুয়ে দুয়ে যে চার হয়, এই সত্যি কথাটা মেনে নেবার পক্ষে অন্তরায় কি? মজাতন্ত্রের অনেক তান্ত্রিকের মুখোশ খুলে পড়বে বলে!

নেসেসারি ইভিল? নেসেসিটি থাকলে সেটা আবার ইভিল হিসাবে নিরঙ্কুশ হতে পারে কোন যুক্তিতে? দিব্যেন্দুর কথাগুলো আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পায় সে—

এই আইনটা যখন পুরোণ হয়ে গিয়ে ঘোলাটে হয়ে যাবে, দাসীরা যখন দেবী হয়ে গিয়ে হানা দেবে গেরস্থ বাড়িতে, যখন ʼ ারের মায়ের কান্না উঠবে ঘরে ঘরে, তখন সে কান্নার প্রতিবিধান করবে কে? বাণীদাতা বিধাতারা না বশংবদ সমাজসেবীরা?—সেদিন আমি শুধু শা।ন্ত পাবো এই কথা স্মরণ করে যে, এ হেন কর্মকাণ্ডে আমি কোন পার্ট নিই নি।

চিরকালের প্রমাণিত সত্যকে কেউ কি কখনও শ্লোগানের পালিশ মাখিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পেরেছে? যুগে যুগে, কালে কালে, অতি-মানব, মহামানব, ঈশ্বরের পুত্র, জাতীয় পিতা চেষ্টা বলে ফেং৷৲ই বৃত্তিটার উচ্ছেদ করে সমাজকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত ফলাতে এসেছো আ৲ হয়ে কি বলে? কেতাবী আদর্শকে কার্যকরী

করে ইতিহাসে স্মরণীয় হবার প্রলোভনে তাঁরা শুধু ভুলে গিয়েছিলেন, বৃত্তিটা রামরাজ্য স্বর্গরাজ্য—সব রাজ্যেই সর্বকালেই ছিল এবং প্রচেষ্টা তাঁদের প্রতিবারই বিপর্যয় ঘটিয়েছে প্রাসাদবাসী অভিজাতদের মধ্যে, আগুন জ্বেলেছে শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্তদের সংসারে, দলবদ্ধ ব্যাভিচারের উপকরণ জুগিয়েছে দরিদ্র ঘরের মা-মেয়েদের জীবনে। ফলে, বিপর্যস্ত মনুষ্য সমাজই আবার সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে এই মধ্যপন্থা, সমাজ-কল্যাণের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে। অবশ্য, এ পন্থা পুরুষশাসিত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থপরের পন্থা। কিন্তু, তার জন্যে দায়ী করবে সে কাকে? যে বিধাতা পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ধাতুতে সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টিকর্তার নাগাল পাবে সে কেমন করে! ক্যাশের বদলে কাইণ্ডস-এর প্রচলন করে বা তাড়াতাড়ি বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিগ্রী পাইয়ে দেওয়ার আইন প্রবর্তন করেও যে বৃত্তিটার উচ্ছেদ করা যায় না, তার প্রমাণও তো মেলে সাম্রাজ্যবাদী, সাম্যবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন তন্ত্রবাদী দেশগুলোর আইন পরিবর্তনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে। তবে কেন এই আদর্শবাদের প্রহসন—সাধারণের ঘরোয়া জীবনকে পণ্য করে! যারা পণ্যা নারীর বংশলোপ করতে চায়, তারা আসলে যে কি চায় তা কি সে জানে না? দেখেনি? শোনেনি?

নীলিমা ওপরে গিয়ে দেখল, ঘরের মধ্যে অঞ্জলি পায়চারী করছে উত্তেজিতভাবে। আর দিব্যেন্দু কেমন যেন অসহায়ের মতো বসে রয়েছে বিছানার ওপর। নীলিমাকে দেখেই বলল, এ আপনারা কি করে বসলেন বলুন তো? ব্যারাক বাড়ি যে বস্তিকেও ছাড়াবার উপক্রম করছে! আমি শুধু নিজে পার্টি হতে চাইনি এ ব্যাপারে। কিন্তু, আপনাদের তো কোনরকম অনুরোধ করিনি সই কেটে দে[illegible] জন্যে! ওঁরা ওদিকে— [illegible] এ ঘরের

—ইস! অঞ্জলি ফোঁস করে উঠ[illegible] পথে বসে যাবে বলে?

আমরা কাজ করবো! কেন, কি ভেবেছেন আমাদের? আমরা কি আপনার হুকুমের চাকর না কেনা দাসী! বিদ্যে বুদ্ধি বিবেচনা বলতে আমাদের নিজেদের কি কিছুই নেই যে আপনার হুকুম শুনেই নাম কেটে দিয়ে এসেছি আমরা! আমরা আগে বুঝিনি তাই সই করেছিলাম। পরে আপনাকে বোঝাতে এসে বুঝতে পারলাম, অন্যায় করেছি। তাই, নাম কেটে দিয়ে এসেছি। এর মধ্যে দল তৈরির কথা ওঠে কেন! গোটা কতক মতলববাজ মিলে কি দু' চার কথা বলেছে আর অমনি আপনিও ভয় পেয়ে গেলেন! মেগেঃ এই মানুষকে ওরা আবার বলে ষণ্ডা গুণ্ডা......

—যাচ্চোলে! দিব্যেন্দু মুস্কিলে পড়ে নীলিমার দিকে তাকাল। বলল, এ মেয়েকে নিয়ে আমি কি করি বলুন তো! আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন না!

—ও আবার কি বলবে? অঞ্জলি হেঁকে বলল, ও-ও আপনার হুকুমমতো নাম কেটে দিয়ে এসেছে বলতে চান? জানেন, ও একজন বি-এ বি-টি?

—হোপলেস।

—আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন! নীলিমা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল; একটু হেসেই বলল, স্বার্থে ঘা পড়লে, অনেকেই তো অমন বাজে কথা বলে! তাই বলে, আপনি—

—আমার কথা হচ্ছে না নীলিমা দেবী! দিব্যেন্দু বলল, ওরা যে আপনাকে নিয়েও টানাটানি করছে। আমি কি—কি সম্পর্ক আমার অঞ্জলিদের সঙ্গে—কেন আমি ওদের ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা গলাই, সে কথা কেউ বুঝবে না,—বোঝাতে চাইও না। কিন্তু, তবুও, অঞ্জলির স্বামী আছে। সে আমাকে বিশ্বাস করে...তার স্ত্রীর সম্পর্ক। কিন্তু, আপনি? আপনাকেও যে ওরা আজ নর্দমায় বলে ফেললেন, আজকের ব্যাপারটার জন্যে। আপনিও যে একটা ডন ফলাতে এসেছো অপদস্থ হয়ে গেলেন আজ!

বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বটা উপলব্ধি করেও নীলিমা কিন্তু গম্ভীর হতে পারল না। বস্তুতঃ দিব্যেন্দুর মতো মানুষও যে এমন অসহায়ের মতো এত করুণস্বরে কথা বলতে পারে, এ যেন সে ভাবতেই পারছিল না। তাই, সে হাসিমুখেই সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপনি ডন য়ুয়ান কি না, সে বিবেচনার ভারটা আমাদের ওপরেই থাক না! আপনি কেন কান দিচ্ছেন ওদের কথায়! কেন মন খারাপ করছেন!

—কিন্তু। দিব্যেন্দু অগত্যা নিজের বিশ্বাসের কথাটাই বলল, আপনারা তো সত্যিই এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করে কিছু করেন নি!

—কি করে জানলেন?—নীলিমা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলো।

—আপনারা তখন আমার সঙ্গে যে ভাবে তর্ক করছিলেন—দিব্যেন্দু বলল, তাতে তো মনে হয়, এ ব্যাপারের ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আপনারা কিছুই খবর রাখেন না। তাই…মানে, বড্ড অস্বস্তিবোধ করছি আমি।

—অস্বস্তিবোধ করছেন?—অঞ্জলি ভুরু কুঁচকে বলল, কি করলে স্বস্তিবোধ করবেন শুনি? আপনার খুশীমতো আবার গিয়ে সই করে দিয়ে এলেই বুঝি মান বাড়বে আমাদের!

—না, তা ঠিক বলছি না। তবে—দিব্যেন্দু আবার নীলিমার দিকে তাকাল অসহায়ের মতো।

—তবে! নীলিমা হাসিমুখেই বলল, বলুন কি বলছেন?

অগত্যা, দিব্যেন্দুও একটু হাসল উপযুক্ত কথা খুঁজে না পেয়ে। ঘরের আবহাওয়াটা এতক্ষণে আবার যেন একটু সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

—বাজে কথা ছেড়ে এবার একটু কাজের কাজ করুন দেখি! অঞ্জলি গম্ভীরভাবে বলল, তখন কি সব যেন সরোকিন ফর্দে আওড়ালেন…কোন আলমারীতে আছে বইগুলো এঘরের যাবে বলে? দিন।

—সরোকিন কি করবেন? দিব্যেন্দু সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল।

—বাঃ, পরের মুখেরই ঝাল খাব কেবল! নিজেরা একটু পড়ে শুনে দেখবো না?

—কী সর্বনাশ! দিব্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল, আচমকা ও সব পড়ে কি বুঝবেন আপনি? পরিণামের কথা জানতে হলে আগে যে ভাল করে জানতে হবে প্রয়োজনের প্রবলেমটা!

—কি সে প্রবলেম?

—সর্বকালের সব চাইতে বড় প্রবলেম।

—কি সে?

—সৃষ্টিতত্ত্বের মহাবীজ—জীবনীশক্তির একমাত্র উৎস—সুস্থ-সবল স্বাভাবিক প্রাণীর প্রাণধর্ম।

—কি সে?

—অসভ্যরা যার পূজা করে প্রকাশ্যে—সুসভ্যরা যার নৈবেদ্য জোগায় গোপনে—রুগ্নরা যার দুর্ণাম রটায় ক্লীবত্ব ঢাকতে—আর, শয়তানরা যার সুযোগ নেয় সমষ্টির সর্বনাশের জন্যে—

—কি সে?

—জীবনের মতোই রমণীয়—মৃত্যুর মতোই বাঞ্ছনীয়—শিবের মতোই কল্যাণীয়—কল্পকালের শাশ্বত সত্য······

—তুমি এখানে বসে মজা মারছো? ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকল বিভূতি। চীৎকার করে বলে উঠল, আর ওদিকে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি টিটকিরীর জ্বালায়!

—আস্তে। অঞ্জলি চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, চ্যাঁচামেচি করতে হয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে করো।

—কি? এতবড় স্পর্ধা তোমার—

—স্পর্ধা আমার না তোমার? অঞ্জলিও আত্মবিস্মৃত হলো। বলে ফেলল, গোটা কতক ঘেয়ো কুকুরের ঘেউঘেউ শুনে স্বামীগিরি ফলাতে এসেছো আমার ওপর? তুমি স্বামী? কি ভেবেছো তুমি?

—কি! বিভূতি একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কি বললে তুমি?

অঞ্জলি আর জবাব দিল না, প্রস্থানোদ্যত হলো।

—দাঁড়ান। দিব্যেন্দু উগ্রস্বরে বলল, যাবেন না দাঁড়ান। দাঁড়ান বলছি।

অঞ্জলি ফিরে তাকাল। কিন্তু, দিব্যেন্দুর মেজাজ দেখে চলে যেতেও ভরসা করল না; সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

—হয়েছে কি! দিব্যেন্দু এবার বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করল, কে আপনাকে টিটকিরি দিয়েছে?

উত্তেজনার আতিশয্যে নীলিমার উপস্থিতিটা প্রথমে লক্ষ্য করেনি বিভূতি; তাই, অভিভূতর মতো সে একবার খোলা দরজাটার দিকে তাকাল।

—বলুন? বিভূতিকে নীরব দেখে দিব্যেন্দু এবার ধমক দিল, কে কি বলেছে আপনাকে?

—দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে—বিভূতি গুনগুন করে বলল, ওরা এমন সব কথা বলছে যে শুনলে পাগল হয়ে যেতে হয়—

—পাগলটা পরে হলেও চলবে। আপাততঃ যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দিন। ওদের কথাগুলো আপনি নিজে বিশ্বাস করেন?

—তার মানে?

—আপনার স্ত্রীর নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আপনার নিজের বিশ্বাসটা কি তাই জানতে চাইছি!

—আপনি বলতে চান—বিভূতি বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল, অঞ্জুকে আমি অবিশ্বাস করি?

—করেন না যদি, তবে ক্ষেপে গেলেন কেন?

—ওরা যে আপনাকেও···মানে—বিভূতি ঢোক গিলে বলল, আপনাকেও ওদের মতো মনে করে কথা কইছে!

—কইলেই বা।

—বাঃ, আপনি আমাদের জন্যে যা যা করেছেন তার সব কিছুরই উলটো মনে করে, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে—

—হুঁ। দিব্যেন্দু এবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে আড় হয়ে পড়ল বিছানার ওপরে। বলল, আপনার পায়ে তখন জুতো ছিল না?

—অ্যা? ইঙ্গিতটা বুঝতে সেকেণ্ড দুয়েক সময় লাগল বিভূতির। বুঝে, মুখ নীচু করল।

—যাক, রাত এদিকে দশটা বাজে। কাল ভোরেই বেরুতে হবে তো আপনাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—বৌ নিয়ে যাবেন কবে?

—একটু গুছিয়ে নিয়েই—

—না—বাধা দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, কাল গিয়ে পরশুই আবার ফিরে আসতে হবে আপনাকে। সেখানকার সংসার গোছাবার দায়িত্ব নেবে—স্বামী নয় স্ত্রী। এখন যান, শুয়ে পড়ুন গে—

—যে আজ্ঞে। বিভূতি বেরিয়ে গেল।

—শুনুন!—বিভূতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিল। সিঁড়িতে পা দিয়ে নীলিমা জিজ্ঞাসা করল, ওরা…মানে…

—কি?

নীলিমার জিজ্ঞাস্য ছিল, বিষোদগারীরা তার সম্বন্ধেও কিছু বলছে কি না। কিন্তু, উত্তেজিত হলেও কথাটা মুখ দিয়ে বার করতে পারল না সে। বলল, না কিছু নয়—

দোতলায় নামতেই নজর পড়ল অজয়ের ওপর। সকলের সঙ্গে দাঁড়া-মিটিং করছিল সে। প্রফুল্ল বলছিল, ও সব ষণ্ডা মার্কা চেহারা দেখে আপনারা ভড়কাতে পারেন; কিন্তু প্রফুল্ল শর্মা অন্য মেটিরিয়ালে তৈরী, বুঝলেন? ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এ বাড়ির সকলেই বিভূতি হালদার নয়; পুরুষ মানুষও কিছু আছে। ওফ, শালা আমার গাছেরও খাবে আবার তলারও কুড়োবে। পরস্ত্রী নিয়েও

প্রেম চালাবে, আবার বাজারে গুলোকেও ছাড়বে না। আচ্ছা শালা' দেখি, তুমি কত বড় বাহাদুর!

জায়গাটাতে আলো ছিল না; কিন্তু, নীলিমা লক্ষ্য করল, বিভূতি তার বাঁ-পায়ের চটিটা খুলে ডান হাতে নিয়েছে।

—ওকি? নীলিমা আঁতকে উঠে অঞ্জলির গায়ে একটা ঠেলা দিল। অঞ্জলিও ঘাবড়ে গিয়ে বিভূতিকে জাপটে ধরল পেছন থেকে।

—ছেড়ে দাও বলছি! বিভূতি ঘড়ঘড়ে গলায় বলল।

—কি ছেলেমানুষী করছো! অঞ্জলি বলল, চল চল ঘরে চল—

ওদিকে, এদের সাড়া পেয়েই প্রফুল্লরা সুদর্শনের ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। অগত্যা, বারান্দা ফাঁকা দেখে বিভূতিও আর জবরদস্তি করল না ছাড়া পাবার জন্যে।

পরদিন, বেশ একটু বেলায় ঘুম ভাঙ্গল দিব্যেন্দুর। ইচ্ছা ছিল দুটি ভাত খাবার; কিন্তু, নাড়ীর অবস্থা দেখে সে ইচ্ছা ত্যাগ করতে হলো। গতদিনের উত্তেজনা আর অনিদ্রাটা বৃথা যায় নি; বেশ একটু জ্বর এসেছে। তবে, পায়ের ব্যথাটা প্রায় নেই বললেই হয়। সত্যি, অদ্ভুত এই মেওয়ারী টোট্‌কাটা!—একটা এম্‌ব্রোকেশান তৈরি করে ফেললে কেমন হয়!

বাথরুম থেকে ফিরে আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ল সে। দুধটাও চলবে না। কি করা যায়? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, বেলা প্রায় একটা। বাড়ি নিস্তব্ধ। অঞ্জলি অফিসে, নীলিমা স্কুলে—ভরসা কেবল বাহাদুর। ডেকে বলল, থিন্‌ এ্যারারুট বিস্কুট নিয়ে আয় দেখি এক পাউণ্ড।

বাহাদুর চলে গেল। মিনিট দুয়েক পরেই ঘরে ঢুকলেন নীলিমার মা। হাঁফাতে হাঁফাতে আরম্ভ করলেন, তুমি কেমন ভদ্দরলোকের ছেলে গো বাছা? আমি তোমার কি পাকা ধানে মই দিয়েছি যে আমার এতবড় সর্বনাশটা করলে?

অভিযোগ শুনে, দিব্যেন্দু একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। নীলিমা আজ সকালে মা-ভাইকে নোটিশ দিয়েছে—আজ থেকেই সে তাদের টিচার্স মেসে থাকবে। মায়ের খোরাকী অবশ্য সে দেবে, কিন্তু অজয় যেন নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেয়।

নীলিমার মতো নির্বিবাদী নরম প্রকৃতির মেয়ে হঠাৎ যে আজ এতবড় নিলর্জ নির্মম হয়ে উঠেছে, তার জন্যে অবশ্যই দায়ী তার নতুন প্রাণের বন্ধু দিব্যেন্দু।···বৃদ্ধা একতরফা বিষোদ্গার করে চললেন, আর দিব্যেন্দুর চোখে জল আসবার উপক্রম করল নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে।—অমন যে বাহাদুর,—মালিকের হুকুমে যে দশটা জওয়ানের শির নিয়ে নিতে পারে—সেও, বৃদ্ধার বচন শুনেই সরে পড়ল—কোন রকমে বিস্কুটের ঠোঙ্গাটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে।

মিনিট পনের পরে একটু যেন ভরসা পাওয়া গেল। পেটে যত কথা ছিল সব বলে ফেলবার পর বৃদ্ধার মনে পড়ল ছেলের উপদেশটা। অজয় তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল—ও লোকটাকে যেন ধমকাতে যেও না মা। তাতে হিতে বিপরীত হবে। বরং, বেশ করে নাকে কেঁদে অয়েলিং করে দিও, যাতে দিদিকে বুঝিয়ে বলে, মেসে যাবার মতলব ছাড়বার জন্যে।

—বুঝলে বাছা? বৃদ্ধা প্রস্থানোদ্যত হয়ে বললেন, ভগমান আছেন। তিনি তোমাদের এই আদিখ্যেতা অনাছিষ্টি সইবেন না! বুঝলে, হতচ্ছাড়ীকে বুঝিয়ে বলো, এ সব মতলব ছাড়তে।

—যে আজ্ঞে। দিব্যেন্দু খুব বিনীতভাবেই মাথা নাড়ল। তারপর বৃদ্ধা প্রস্থান করতেই শুয়ে পড়ল একেবারে। মাথার মধ্যে তার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছিল। কারণটা অনুমান করতেও বিলম্ব হলো না। কিন্তু, প্রতিবিধানের পন্থা কি?

এ্যাস্‌পীরিনের একটা বে-হিসাবী দাওয়াই খেয়ে একটু ধাতস্থ হলো সে আধঘণ্টা পরে। ভাবতে বসল,—সাময়িক ব্যবস্থা নয়, স্থায়ী

শান্তির কথা। মনের শান্তিকে বজায় রাখতে হলে, অর্থ সঞ্চয়ের আশা, অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে তাকে ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু, কঃ পন্থা?

এ বাড়ি ত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছে সে একাধিবার। কিন্তু, পারে নি। পারে নি বলেই তার আজ এই দুর্দশা। কিন্তু, আর মনকে চোখ ঠেরে লাভ কি? অঞ্জলি চলে যাচ্ছে দু-দিন পরেই। নীলিমাও পালাচ্ছে। তারপর—তার আর ভয় কি? কিন্তু, সত্যিই তখন কি সে টিঁকতে পারবে এই অঞ্জলি-নীলিমাহীন কারাগারে? মনে পড়ল—

ভগবানবাবুর কথা। বৈজুর মধ্যপন্থা অবলম্বনের জন্য অনুনয়।

ভাইজীর বিবাহ প্রস্তাবের অন্তরালে যে উদ্দেশ্যটা বিরাজ করছে, সেটাকে মেনে নিলে ক্ষতি কি? তাছাড়া—

অঞ্জলি কি সত্যিই তাকে ছেড়ে যেতে রাজি হবে? গেলে অবশ্য সে বুদ্ধিমতীর কাজই করবে। কিন্তু সত্যিই কি যাবে? বিশ্বাস তো হয় না। সুতরাং···

ভগবানবাবু অবশ্য তাকে ভালবাসেন। কিন্তু, তার চাইতেও বেশী ভালবাসেন নিজের মাথাটাকে। আপাততঃ ভাইজীর মাথাটার মর্যাদা একটু না হয় সে দিলেই! এ কাজটা তো সে স্বচ্ছন্দেই করতে পারে।—এক পাউণ্ড বিস্কুট উদরস্থ করে দিব্যেন্দু একটা ট্যাক্সী ডাকতে বলল বাহাদুরকে। সঙ্গে নিল চেক বইখানা।

সি. আই. টি. রোডের বাড়িখানা পাওয়া গেল না, ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। তবে, দিব্যেন্দুর আগ্রহ দেখে আর একটা সন্ধান দিলেন বাড়িওয়ালা, একডালিয়া প্লেসে। এ ফ্ল্যাটটাও তেতলার ওপর এবং সুমুখে ছাদও আছে একটুখানি। ভাড়াও বেশ সস্তা। মাসিক আড়াই শ' টাকা মাত্র। তবে, দেড় হাজার টাকা অগ্রিম আর দেড় হাজার টাকা ব্ল্যাক দিতে হবে দশ টাকার কারেন্সীতে। অর্থাৎ,

সাকুল্যে সাড়ে বত্রিশ শ' টাকা নগদ দিতে পারলে আজই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে।

টাকার অঙ্কটা শুনে দিব্যেন্দু বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল ট্যাক্সীর মধ্যে। ধরা মাথাটা আরও ধরে উঠতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে আবার ঠেলে উঠল সে তেতলায়। বাড়িওয়ালাকে ডেকে বলল, আমি যদি কাল এসে ক্যাশ দিয়ে যাই···

—কাল কেন, যেদিন খুশী আসবেন। বাড়িওয়ালা ভরসা দিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে আর কেউ না নিলে, আপনি নিশ্চয়ই পাবেন ফ্ল্যাটটা।

—যে আজ্ঞে।—বলে, দিব্যেন্দু আবার নেমে এসে বসল ট্যাক্সীতে। আবার ভাবতে বসল সে। না, বাড়িওয়ালার ওপর রাগ হলো না তার। ভাড়াটে এবং বাড়িওয়ালা, উভয় সম্প্রদায়কেই ছোটলোক করে দিচ্ছে যে আইনটা, সে আইনটার আদি-অন্ত সে বেশ ভাল করেই জানে। বাঙ্গালী ভাড়াটেকে বাড়ি ভাড়া দেবার পূর্বে যদি কোন বাড়িওয়ালা মামলার খরচটা অগ্রিম নিয়ে রাখেন, তার মধ্যে অন্যায় অবশ্যই কিছু থাকতে পারে না! কিন্তু, এ ক্ষেত্রে টাকাটা যে বার করতে হবে নিজের পকেট থেকে: কি করা যায়!

চমক ভাঙ্গল ড্রাইভারের কথায়। ওয়েটিং চার্জ দিয়ে তার পোষাবে না। সওয়ারী নেমে গেলেই ভাল হয়।

দিব্যেন্দু মিটার দেখল। তারপর দেখল ঘড়ি। ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে তিন ঘণ্টা পূর্বে। অবশ্য, বেয়ারার চেকের বিনিময়ে তাকে টাকা দেবার লোক অনেক আছে। কিন্তু, অঙ্কটা যে তিন হাজারের ওপর! তার ওপর দেড় হাজার আবার দশ টাকার কারেন্সীতে হওয়া চাই।···ওদিকে, জানতে পারলে, ভাইজীও লাফাতে আরম্ভ করবেন তাঁর মাথাখানার দাপটে···

দিব্যেন্দু যখন বাড়ি ফিরল তখনও সন্ধ্যে হতে দেরি ছিল। কিন্তু, তার চোখের সুমুখে ঘনিয়ে আসছিল নিকষ কালো অন্ধকার।

—কোথায় চরতে বেরিয়েছিলি খোঁড়া ঠ্যাং নিয়ে? বৈজু ছাদে পায়চারী করছিল, তেড়ে এসে বলল, আমি শালা এদিকে···

দিব্যেন্দুর তখন জামা-কাপড় ছাড়বার মতো অবস্থাও ছিল না। সব নিয়েই শুয়ে পড়ল সে।

—কি ব্যাপার রে? বৈজু বিস্মিত হয়ে বিছানার কাছে এগিয়ে এল।

—ঘাবড়াস্ নি। দাঁড়া একটু।

বৈজু এবার বিছানার ওপর বসল। কিন্তু, মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করবার পরও যখন দিব্যেন্দুর তরফ থেকে সাড়া মিলল না, তখন বিরক্ত হয়ে বলল, কি রে বাপু, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? হলো কি তোর?

—ভীষণ মাথা ধরেছে। দিব্যেন্দু চোখ বুজেই বলল, বল, কি বলছিলি!

—মামা জিগ্গ্যেস করতে পাঠালে, তোর কাকাকে চিঠি লিখবে কি না।

—কিসের কাকা? কিসের চিঠি?

—মানে, বরকর্তা হিসাবে তোর কাকার প্রায়োরিটিটা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না! অথচ, তুই আবার একদিন তাকে মারতে গিয়েছিলি! তাই মামা বললে—

—কিসের বর? কিসের কর্তা? দিব্যেন্দু একটু সচেতন হবার চেষ্টা করে বল্লল, আঃ, তুই কি কস্মিনকালেও মানুষ হবি না রে গাড়োল! কি সব বলছিস যা তা?

—বলছি, তোর বিয়ের কথা রে ট্যাঁড়স!

—বিয়ে? কার?

—কি রকমটা হলো। বৈজু এবার বিচলিত হলো। ভাবল, মামা আমার সঙ্গে বোট্‌কেরা করলে নাকি!

—মামা যে তোকে ঋষিবাবুর জামাই করবে! বৈজু দিব্যেন্দুকে একটা খোঁচা মেরে বলল, তুই জানিস না কিছু?

দিব্যেন্দুর আর সাড়া পাওয়া গেল না। দেখে, বৈজু এবার ভাল করে তার গায়ে হাত দিল। তারপরই—

ভয় পেল সে। এমন ভয় সে কখনও পায়নি। ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। ধন্বন্তরীর চিকিৎসার জন্যেও যে সর্বাগ্রে ডাক্তার ডাকতে হয়, সে কথাটা তার মাথাতেই এল না। একটা ট্যাক্সী নিয়ে সে সটান বাড়িমুখো হলো।

তখন মুস্কিলে পড়ল বাহাদুর। মালিকের যে ভীষণ কিছু একটা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তার সন্দেহমাত্রও ছিল না। কিন্তু, ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে। এ বাড়িতে যে দুটি মাঈজী তার মালিককে ভাল চোখে দেখে, তাদের কারুরই বাড়ি ফেরবার সময় হয়নি এখনও। ওদিকে বৈজুবাবু তো, যতদূর মনে হলো, পালিয়ে গেলেন। হে পশুপতিনাথ, এখন কি করবে সে!

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, মালিকের অচেতন দেহটার দিকে তাকিয়ে বাহাদুর আলো জ্বালতে ভুলে গেল। অন্ধকারে আগলে বসে রইল অসহায়ের মতো!

নীলিমা সেদিন কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই বাড়ি ফিরল। অন্যান্য দিন, স্কুল থেকে বেরিয়ে পরের পর দুটো ট্যুইশানী সারে সে। কিন্তু, মেসে যাবার উদ্যোগ আয়োজনের জন্যে সেদিন ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছিল সে ছাত্রীদের কাছ থেকে।

মেয়েকে অসময় ফিরতে দেখে মা বললেন, আজ যে বড় তাড়াতাড়ি ফিরলি?

—কাজ আছে। বলে নীলিমা কলঘরে ঢুকে গেল।

—কাজটা কি শুনি? মেয়ের সংক্ষিপ্ত জবাব শুনেই মা মেজাজ হারালেন। ভুলে গেলেন ছেলের উপদেশটা। কলেজ যাবার পূর্বে অজয় তাঁকে উল্টো চাপ দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, দেখ মা, স্রেফ্ তোমার জিভের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে দিদির মতো মেয়েও বিগ্ড়ে গেল এতদিন পরে। আমি তোমায় সাফ বলে দিচ্ছি, দিদিটা পালিয়ে বাঁচবে আর আমি শালা পেট মেরে তোমার বাক্যসুধা পান করবো, সেটি হবে না। মুখ সামলে কাজ বাগাতে না পারলে, তোমার হাড়ির হাল হবে জেনে রেখো।

মেয়ে বাথরুম থেকে বেরুতেই আর এক পর্দা গলা চড়ালেন বৃদ্ধা। কিন্তু, নীলিমা গ্রাহ্য করল না, নীরবেই তোরঙ্গ গোছাতে বসল।

—হারামজাদী চুপ করে আছিস যে? বৃদ্ধা কিছুক্ষণ পরে সন্দিগ্ধ হয়ে বললেন, বলি আমার কথাগুলো কানে যাচ্ছে?

নীলিমা এইবার মুখ তুলল। কানে গিয়েছিল তার—কিন্তু, মায়ের কথা নয়। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে বারান্দায়। তারপর, সন্তর্পণে তেতলার সিঁড়ি ধরলে সে কৌতূহল চাপতে না পেরে।

ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এল ভগবানবাবুর উৎকন্ঠিত কণ্ঠস্বর, কি বুঝলে হে ডাক্তার? সাংঘাতিক কিছু নাকি? ঠিক করে বলো বাপু!

—কেন ঘাবড়াচ্ছেন? ডাক্তার জবাব দিলেন, সাংঘাতিক কিছু হলে চৌধুরী কি আর চুপ করে থাকতো? নিশ্চয়ই প্রি-কশান নিতো!

—আরে বাপু, এখন তো দেখছি ও চুপ করেই রয়েছে! তুমি ঘোঁড়ার ডিমের তাহলে বুঝলেটা কি?

—আঃ এই—ঋষিবাবুর গলা শোনা গেল, অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যার যা ডিপার্টমেণ্ট তাকে কাজ করতে দে না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অত ব্যস্ত হলে কি চলে! ডাক্তার বললেন, বৈজ্ঞ

বাবু বরফ আর ব্যাগ নিয়ে এসে পড়লেন বলে! জ্বরটা নামিয়ে দিতে বেশী সময় লাগবে না। তারপর—

—তারপর নার্সিংয়ের কি হবে? তুমিই না হয় থেকে যাও রাত্তিরটা। কি যে মুস্কিলে পড়লাম আমি!···কাল সকালেই আবার যেতে হবে বম্বে।

নীলিমার পক্ষে আর আড়ালে থাকা সম্ভবপর হলো না; পিছনের চাপে আস্তে আস্তে ঘরের সুমুখে এসে পড়ল সে। ইতিমধ্যে খবরটা রটে গিয়েছিল। তাই, সকলেই ক্রোড়পতি বাড়িওয়ালার সম্মুখীন হবার চেষ্টা করছিল সপ্রতিভভাবে। কেবল, দেখতে পাওয়া গেল না অঞ্জলি আর বিভূতিকে। বিভূতি কোলকাতায় ছিল না। আর অঞ্জলি তখনও ছুটে বেড়াচ্ছিল সহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে— তার অতসীদির ঠিকানার জন্যে।

বৈজু ব্যাগ আর বরফ নিয়ে ফিরতেই রোগীর ঘরের তৎপরতা আরও বেড়ে গেল। বরফ ধুয়ে নিয়ে এল সুদর্শন। ব্যাগ ভর্তি করল নিভাননী। তারপর প্রফুল্ল বলল, আমাদের মধ্যেই তো একজন ট্রেন্‌ড্‌ এক্সপীরিয়ান্সড্‌ নার্স রয়েছেন! তাঁকে এন্‌গেজ করলে—

—কি দরকার অত সব করবার! উকীল গিন্নী লতিকাকে রোগীর শিয়রে বসিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা এতগুলো লোক রইছি—আবার খরচ-পত্র করে নার্স রাখবার কি দরকার!

নিভাননী সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থান করল। পিছনে গেল সুদর্শন।

—হ্যাঁ হে ডাক্তার—ভগবানবাবু বললেন, ফোঁড়াফুঁড়ি তো করলে না?

—করবো করবো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন!

—আরে, আমাকে উঠতে হবে যে!

—তা উঠুন না আপনি! আমি তো আছি।

—বৈজুও থাকবি নাকি রাত্তিরে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমি উঠি। ঋষি চল্। ভগবানবাবু প্রস্থানোদ্যত হয়েও আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন ডাক্তারকে, শুনেছি, যাদের কখনও অসুখ করে না, তাদের কিছু একটা হলে মারাত্মক হয়েই দেখা দেয়!

—কেন অত ভড়্কাচ্ছেন আপনি!

—আরে বাপু, ভড়কাচ্ছি কি আর সাধে! ভগবানবাবু উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, এতক্ষণ তাহলে আর শুনলেটা কি! শ্রাবণ মাসের শেষ লগ্ন আর ঠিক এক হপ্তা পরে। এ ক'দিনের মধ্যে ও যদি খাড়া না হয়, তাহলে বড্ড বে-কায়দায় পড়ে যাব আমরা। বুঝলে না, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই তিনটে মাসকে বাঙ্গালীরা বে-ফয়দা করে রেখেছে। ওদিকে, ঋষির বৌ আবার অতদিন টিঁকতে রাজি নয়!

—হয়েছে হয়েছে, আর বোঝাতে হবে না। শেষ পর্যন্ত ঋষি-বাবুই বন্ধুকে বার করে নিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অত সব রাজসিক কাণ্ড-কারখানার মধ্যে নীলিমার স্থান কোথায়! তবে, একটা বিষয় নিশ্চিন্ত হয়েই সে মেসে যেতে পারল। একজন বড় ডাক্তার সর্বক্ষণ পাহারা দিচ্ছেন রোগীকে।

কিন্তু, আজ বাদে কাল যার স্ত্রী হবে সতীর মতো মেয়ে, অঞ্জলির মতো পরস্ত্রী তার খবর নিতে যাবে কোন অধিকারে! সে নিজের ঘরেই নিজেকে বন্দিনী করে রাখল। তবে···একটা অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে—

অঞ্জলি ভট্চায্ একদিন ভুল করেছিল। সে ভুলের মাশুল জুগিয়ে এসেছে এতদিন অঞ্জলি হালদার। কিন্তু, আবার ভুল করবার জন্যে সে আর কোন অতসীদির সাহায্য নেবে না। প্রত্যাশা করবে না

কোন কিছু কারুর কাছ থেকে। নিশ্চিন্ত হবে এবার…তার নিজস্ব অধিকারে…

সেই অধিকার গ্রহণের সুযোগ সুবিধার কথাটাই ভাবতে থাকে সে দিন রাত্তির ঘরে বসে। কিন্তু, ওদিকে যে দ্বার বন্ধ!

রোগ ভোগের দ্বিতীয় দিন থেকেই, ডাক্তারের নির্দেশে সিঁড়ির দরজায় খিল লাগিয়েছিল বাহাদুর। বাড়ির লোকের আহা উহুর আতিশয্যে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছিল দিব্যেন্দুর।

পরিণামে, আবার দিব্যেন্দুর ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন প্রতিবেশী কল্যাণকামীর দল। তৃতীয় দিনটা কোন রকমে কেটে গেল। কিন্তু, চতুর্থ দিনে আর সামলাতে পারলেন না উকীল গিন্নী। অঞ্জলির ঘরে হানা দিয়ে সবিস্ময়ে বললেন, এ কি? বেলা প্রায় বারোটা বাজে, অফিস যাও নি?

অঞ্জলি কোন কথা কইল না। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

—ও হো বুঝিছি। তাড়িয়ে দিয়েছে, না? উকীল গিন্নী দরদ জানিয়ে বললেন, তা ভাই আর কি করবে বলো? অমন মনিবের সঙ্গে অমন করে শত্রুতা করলে চাকরি কি আর থাকে অফিসের মনিব আর বাড়ির মালিক যে একই লোক, এটা তোমার খেয়াল রাখা উচিত ছিল ভাই! তা, যাঁর পরামর্শ শুনে চাকরি গেল, তাঁর ব্যাপারখানা কি বলতো?

—আপনি ভুল করছেন! অঞ্জলি সংযত স্বরেই বলল, চাকরি আমার যায় নি, ছেড়ে দিলাম আজ থেকে।

—ও হো হো, মনে ছিল না। উকীল গিন্নী অপ্রস্তুত হতে গিয়েও সামলে নিলেন। বললেন, তোমরা তো আজই চলে যাচ্ছো দেশ ছেড়ে, না? কিন্তু, যাই বলো ভাই, ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি আজ পর্যন্ত, কিন্তু এমনটি কখনও শুনিনি! গাছে না উঠতেই এক

কাঁদি! বৌ না হতেই বান্ধবীর ভয়ে ভড়কে গেল? নেমন্তন্ন করেছে তো?

—আপনাকে করেছে তো?

—ওমা, আমার কি হবে! আমার ওপর তুমি রাগ করছো নাকি? উকীল গিন্নী সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়ে বললেন, কিন্তু, আমি তে' ভাই তোমার পাকা ধানে মই দিই নি! সে বরং নীলিমাকে বলতে পারো!

—আপনি বরং নীলিমার মায়ের কাছে যান, বেশী মজা পাবেন। আসুন—অঞ্জলি উকীল গিন্নীর একটা হাত ধরে ঘর থেকে বার করে দিল। তারপর সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল তাঁর মুখের ওপর।

কিন্তু, শান্তি কোথায়! দশ মিনিট যেতে না যেতেই বিভূতি এসে পৌঁছল এবং হৈহৈ করে উঠল ঘর-দোরের অবস্থা দেখে। বলল, কিস্যু গুছিয়ে রাখোনি? ট্রেণ যে পৌনে আটটায়। কি ব্যাপার? আবার শরীর খারাপ হলো নাকি? কি সর্বনাশ!

বিভূতির উৎকণ্ঠা দেখে অঞ্জলি মুখ তুলল। সত্যিই সে কোন ব্যবস্থা করে রাখেনি যাবার জন্যে। দরকার মনে করেনি। কিন্তু, ব্যাপার দেখে বিভূতি অন্য কিছু করার পরিবর্তে এতখানি উৎকন্ঠিত হয়ে উঠবে, তারই স্বাস্থ্যের কথা ভেবে, এটাও ভাবতে পারেনি সে।

—রাঁধতেও পারোনি নিশ্চয়ই! আচ্ছা দাঁড়াও। বিভূতি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

তবুও, পাঁচ মিনিটের জন্যও স্বস্তি পেল না অঞ্জলি। নীলিমা এসে ঘরে ঢুকল।

নীলিমা এসেছিল অজয়ের জবরদস্তিতে। গত কাল থেকেই সে তার মেসে গিয়ে ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেছিল: মাকে নাকি কিছুতেই

খাওয়ান যাচ্ছে না। হাঁপানিটাও বেড়ে গেছে ভয়ানক। তাই, দিদি যদি একবার বাড়ি যায়—

—আচ্ছা, যাবো'খন।

—অখন নয়, এক্ষুণি চল্। অজয় বলেছিল, আমি না হয় চলে যাব অন্য কোথাও। একটা পেট চালিয়ে নোব কোন রকমে। কিন্তু, তুই মাকে নিয়ে থাক দিদি। নাহলে, বুড়ো মানুষটা মরে যাবে।

গতকাল অজয়ের কথা বিশ্বাস করেনি নীলিমা। কিন্তু, আজ আর পারল না। বলল, আচ্ছা, যাচ্ছি আর একটু পরে। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েই চলে যাব ওখানে।

ছুটি নিয়েই এসেছিল সে এবং সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল বৃদ্ধার অবস্থা দেখে। অজয় তাকে একটি কথাও বাড়িয়ে বলেনি।

মেয়েকে দেখে বৃদ্ধা অবশ্য যথাসম্ভব বিষোদ্গার করলেন ধুঁকতে ধুঁকতে। বাক্যবাণ শুনে নীলিমারও চোখে জল এল। কিন্তু, সে অশ্রু বিতৃষ্ণার নয়—অনুতাপের। সে অনেক সাধ্য সাধনা করে মাকে খাওয়াল। খবর পেয়ে উকীল গিন্নীও এলেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনিই তাকে সংবাদ পরিবেশন করলেন বাড়ির আর সকলের। তাই, মাকে শান্ত করে, সে প্রথমেই দেখা করা দরকার মনে করল অঞ্জলির সঙ্গে।

—এলে? অঞ্জলি হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করল। কিন্তু হাসিটা একেবারেই ভাল লাগল না নীলিমার। মিনিট দুয়েক চুপ করে বসে রইল সে অঞ্জলির একটা হাত মুঠো করে ধরে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কেন এ ভাবে নিন্দে কুড়োচ্ছো?

—তুমি বুঝি তাই সুখ্যাতি কুড়োতে এলে দু'দিন মেসে কাটিয়েই? অঞ্জলি হাসিমুখেই বলল, যাক্‌গে, নেমন্তন্ন পেয়েছো তো?

এ কি রকম হাসি! নীলিমা রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ল।

মনের সন্দেহটাকে আর সন্দেহ বলে অগ্রাহ্য করতে পারল না সে। ব্যস্ত হয়ে বলল, উনি বিয়ে না করলেও কি তুমি সুখী হতে ভাই! সুখী হতে হবে তোমায় নিজের চেষ্টায়। যা হয়ে গেছে, তা হওয়া উচিত ছিল না। ঠিক কথা। কিন্তু, আরও অনুচিত কাজও তোমার করা উচিত নয়। আমার তো মনে হয়, দূরে গেলে ভুলতে পারা সহজ হবে তোমার পক্ষে।

—এ সব কি আরম্ভ করলে যা তা! বিষয়বস্তুর স্থূল রূপটা সহ্য করতে পারল না অঞ্জলি। বলতে গেল—

কিন্তু তার পূর্বেই ঘরে ঢুকল বিভূতি এক ঠোঙা খাবার নিয়ে। নীলিমাকে দেখে বিমর্ষভাবে বলল, দেখুন তো কি কাণ্ড! আজই ওর শরীর খারাপ হলো। রাঁধতে পর্যন্ত পারেনি। যাক্ গে, পরশু তো আবার আসতেই হবে আমাকে। তখন না হয়—

—ওমা, শরীর খারাপ হতে যাবে কেন ওর! অঞ্জলিকে চমকে দিয়ে নীলিমা বলল, রাঁধেনি হেঁসেল পাড়ার ভয়ে। সন্ধ্যের মধ্যেই তো বেরুতে হবে আপনাদের।

—তাই নাকি! বিভূতি তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। বলল, শরীর খারাপ হয়নি তাহলে? আমি এদিকে ঘরদোরের অবস্থা দেখে ভাবলাম—

—ঘরদোরে ক'টাই বা জিনিস আছে আপনার! নীলিমা হেসে বলল, সমস্ত দিনটা তো পড়ে রয়েছে! কতটুকু আর সময় লাগবে! না হয়, আমিও হাত লাগাবো'খন।

—ওঃ, তাহলে আজই যাচ্ছি আমরা! আমি তো ভড়কে গিয়েছিলাম ওর মুখ দেখে।

—কি মুস্কিল! নীলিমা আরও ভাল করে হেসে বলল, এত দিনের জানা-শোনা জায়গা ছেড়ে এতদিন পরে একটা অজানা জায়গায় যাচ্ছে, একটু মন খারাপ হবে না! এতক্ষণ সেই কথাই তো বলছিল আমাকে।

—যাক্ বাবা বাঁচা গেল। নাহলে, আবার দাঁতখিঁচুনি খেতে হতো দিব্যেন্দুদার কাছ থেকে। বিভূতি নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, এখন একবার দেখে আসি ওপরের কি ব্যাপার।

আমিও দেখি গে যাই, মা কি করছে। অঞ্জলিকে একলা রেখে দুজনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘণ্টা তিনেক নিজের ঘরে কাটিয়ে নীলিমা আবার গিয়ে উঁকি মারল অঞ্জলির জানলায়। দেখল, বিভূতির জিনিসপত্র গোছানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনে হলো, অঞ্জলিও যেন একটু সামলে উঠেছে। ঘুরছে ফিরছে ঘরের মধ্যে।

—তক্তাপোষ দুটো—নীলিমাকে দেখে বিভূতি বলল, বেচে দিলাম রমেশবাবুকে হাফ দামে। কি আর করা যায়—

—হ্যাঁ, ভারি তো দাম! নীলিমা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার ফিরে গেল নিজের ঘরে। দেখল, মা বেশ ঘুমোচ্ছে।

বৃদ্ধার অবশ্য তখনও শুয়ে পড়বার মতো অবস্থা হয় নি; কিন্তু, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বালিশে হেলান দিয়ে। নীলিমা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তাঁর ঘুমোন্ত মুখখানার দিকে। দেখতে দেখতে কেমন যেন করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। আহা!

নীলিমা আবার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আবার উঁকি মারল অঞ্জলির জানালায়। তারপর, যে একজনের কথা সে ভাবনা-চিন্তার বাইরে রাখবার চেষ্টা করছিল এতক্ষণ, তারই উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

সিঁড়ির দরজায় টোকা পড়তেই বাহাদুর হেঁকে উঠল ভেতর থেকে, কৌন?

—আমি।

—মাঈজী আপনি? আসুন আসুন! বাহাদুর ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। বলল, মালিকের বিছানা ছাড়া বারণ। চলুন তাঁর কাছে।

সাড়া পেয়ে দিব্যেন্দুও উঠে বসেছিল শয্যার ওপর। সাগ্রহে বলল, আসুন আসুন, দেখুন, এরা আমাকে কি করে রেখেছে!

নীলিমা বসল, অদূরে রাখা একটা কেদারায়। কিন্তু, দিব্যেন্দুর রুগ্ন মুখখানার দিকে, চেষ্টা করেও তাকাতে পারল না ভাল করে। এ কি সাংঘাতিক ব্যাধি! এমন একটা মানুষকে এমন করে বদলে দিলে মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে! হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয় তার। বলে, আপনি শুয়ে পড়ুন।

—এই যে। দিব্যেন্দু শুয়ে পড়ে বলল, আপনিও যে এমন রাগী মানুষ তা তো জানতাম না! উনি অবশ্য একটু ইয়ে…তা হলেও মা তো বটে!

—আমার কথা থাক, আপনার কথা বলুন। নীলিমা বলল, কেন এমন করে ভুগছেন?

—কেন? দিব্যেন্দু একটু যেন থমকে গেল। তারপর বলল, নিয়তি কিংবা বিপর্যস্ত পুরুষাকার! কি জবাব দোব এ কেন-র? ওই আসনখানা দেখছেন? ওতে বসে আমার বাবা আহ্নিক করতেন। দীক্ষার 'পর পেয়েছিলাম আমি উত্তরাধিকার সূত্রে। অনেক দিন, অনেক ভড়ং করেছি আমি ওটার ওপর নাক টিপে বসে। হঠাৎ দেখছি, ওটা পাপোষে পরিণত হয়েছে। করেছি আমিই, কোন অসতর্ক মুহূর্তে—অন্যমনস্ক হয়ে। কিন্তু, কে আমাকে দিয়ে এ কাজ করালে? কি করে বলবো! ওই যে প্যারালাল বার্ আর বারবেলগুলো দেখছেন? ওগুলোর কল্যাণেই একদিন আমি ভয়াবহ হয়ে উঠেছিলাম এ বাড়ির লোকজনের কাছে। হঠাৎ দেখছি, ওগুলো ঠিকই আছে, বেঠিক হয়ে গেছে আমার দেহটা। কেন? কি করে বলবো! আমার বাবার কথাটাই ধরুন না! পঁচিশ পর্যন্ত পুরুষাকারের উপাসক ছিলেন তিনি। নিজেকে বলতেন সো অহং। তারপর স্ত্রী বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে যেন মুখ থুবড়ে পড়লেন। স্রেফ যেন ত্বয়া হৃষিকেশের ইচ্ছাতেই বেঁচে

রইলেন—কাজ করতে লাগলেন। তাঁর মুখের ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং —নিয়তি কেন বাধ্যতে—এই সব শুনে শুনে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হয়েছিল। তারপর, পঞ্চান্ন পেরিয়ে কোথায় গেল তাঁর ত্বয়া হৃষিকেশ আর কোথায় রইল নিয়তি! তাড়াতাড়ি নাতির মুখ দেখবার বাসনায় পুরুষাকারের ভক্ত হয়ে পড়লেন। নিজের তৈরি কোষ্ঠির ফলাফল অগ্রাহ্য করে বিয়ে দিতে গেলেন ছেলের। আবার মত বদলে ফেললেন সেই বিয়ের রাত্রেই। কেন? কি করে বলবো? এ কি বুঝিয়ে বলবার মতো সহজ সরল ব্যাপার!

নীলিমার উৎকণ্ঠা যেন আর বাধা মানছিল না। এ সব কি বলছে দিব্যেন্দু? ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? সব কিছু ভুলে গিয়ে এগিয়ে এল সে রোগীর কাছে। নিঃসঙ্কোচে একটা হাত রাখল কপালে।

—ভয় নেই, জ্বর হয় নি। দিব্যেন্দু হাসিমুখেই বলল।

—তবে, কি হয়েছে! নীলিমা আবার ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

—কি হয়েছে! আমার তো ধারণা বিগড়ে গেছে নার্ভাস সিস্‌টেম্। কিন্তু, ডাক্তার বিশ্বাস করে না। আজই তো রক্ত নিয়ে গেল কলাই খোঁজবার জন্যে।

—কলাই?

—ওই হোল—কোলাই। কিন্তু—দিব্যেন্দুর মুখের হাসিটা আবার মলিন হয়ে যায়। বলে, আপনি না থেকেও এলেন। কিন্তু, ও ভদ্রমহিলার কি হলো বলুন তো? বিভূতি এসে প্রণাম করে গেল। বলে গেল, আবার দেখতে আসবে পরশুদিন। কি উৎসাহ নিয়ে, কত ছুটোছুটি করছে ও নতুন করে সংসার পাতবার আনন্দে। অথচ···অথচ···আমি কি ভুল করলাম! ভুল বকছি···

—না কিচ্ছু ভুল করেন নি আপনি।

—না, না, ভুল একটা হয়েছিল বইকি। মারাত্মক ভুল। কিন্তু, ভগবান জানেন, আমি তো···আমি তো···

—আমি জানি। আপনি চুপ করুন।

—জানেন আপনি? কি জানেন?

—যা জানবার সবই জেনেছি। কিন্তু, আর একটিও কথা নয়। চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ুন লক্ষ্মী ছেলের মতন।

—কেন? যেতে হবে বুঝি? থাকুন না একটু! কতদিন তো দেখিনি! ওঃ—ধড়মড় করে উঠে বসল দিব্যেন্দু।

—কি হলো? নীলিমা আবার ছুটে এল।

—খালি ভুল হয়ে যাচ্ছে। দিব্যেন্দু এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

—কি হলো? কি চাই, আমাকে বলুন না?

—মনে পড়েছে। তোষকের তলায় হাত দিয়ে একটা ছোট্ট শিশি বার করল দিব্যেন্দু। বলল, একটু জল দেবেন?

কুঁজো ঘরেই ছিল। জল গড়িয়ে এনে দিল নীলিমা। দিব্যেন্দু দুটো ট্যাবলেট গিলে ফেলল।

—ব্যস্, আর ভুল বকবো না। দিব্যেন্দু আবার শুয়ে পড়ে বলল, নির্ভরসায় বসুন আপনি।

—কি খেলেন ওটা? বিছানার তলায় লুকোন ছিল কেন?

—প্লীজ্ ডোণ্ট এক্স্পোজ মী! ডাক্তারকে বলবেন না যেন। ওটা একটা ইন্জীনিয়ার্—ডাক্তার নয়। আমাকে মেশিন মনে করে মেরামত করছে। কিন্তু, আমি তো একটা মানুষ—না, কি বলেন?

—কিন্তু ওটা কি খেলেন আপনি?—নীলিমা যেন আর্তনাদ করে উঠল।

—সত্যি বলছি, ঘুমের ওষুধের মতো একটা জিনিষ। দিব্যেন্দু বলল, ডাক্তার চায় আমাকে জাগিয়ে রাখতে। আমাকে নতুন বাড়িতে গিয়ে, নতুন বৌ নিয়ে, নতুন জীবন যাপন করতে হবে, তাই নতুন পদ্ধতিতে আমার চিকিৎসা করতে চায় ওরা। কিন্তু,

আপনিই বলুন, না ঘুমোলে কি করে আমি···মানে, কি করে আমি···

বাহাদুর ঘরে ঢুকে বলল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন। বলেছেন, বিশেষ দরকার, অনেক দূর থেকে আসছেন।

—ভদ্রলোক? দূর থেকে আসছেন? দিব্যেন্দু আশ্চর্য হয়ে নীলিমার দিকে তাকাল।

—তা হোক—নীলিমা ভুরু কুঁচকে বলল, এখন বরং ওঁকে—

—তা কি হয়! এসেছেন যখন দূর থেকে—দিব্যেন্দু উঠে বসে বলল, বাহাদুর নিয়ে আয় বাবুকে।

ঘরে ঢুকল একটি যুবক। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা যেন ফেটে পড়ছিল। নমস্কার করে বলল, আপনিই কি সামাধ্যায়ী মহাশয়ের ছেলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—একটু নির্জনে—মানে, গোপনে কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

নীলিমা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু, দিব্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গেই বাধা দিল। বলল, আপনি উঠছেন কেন, বসুন।

—আপনিও বসুন। যুবকের উদ্দেশে দিব্যেন্দু বলল, বলুন, কি বলতে চান গোপনে।

যুবকটি একবার জিভ বুলিয়ে নিল ঠোঁটের ওপরে। তারপর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে দিব্যেন্দুর হাতে দিল।

ছেলেদের খাতার পাতা ছেঁড়া কাগজ। দিব্যেন্দু বিস্মিত হয়ে পড়তে আরম্ভ করল। একাধিকবার পড়ল সে ছোট্ট চিরকুটখানা। তারপর কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যুবকটির দিকে। কাগজখানা তার হাত থেকে পড়ে গেল।

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে নীলিমা কুড়িয়ে নিল কাগজখানা।

বানান ভুলে ভর্তি, বড় বড় আঁকা বাঁকা অক্ষরের মর্মার্থটাও গ্রহণ করল সে :

বাবা দিব্যেন্দু,

আমার ছেলে নেই। তাই বড্ড ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে নিজের করে পাওয়ার। কিন্তু, তখন তো বুঝিনি, জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা না থাকলে একজন মহাপুরুষের সন্তানকে নিজের করে পাওয়া যায় না! বাবা, আমার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে পুণ্য কিছু নেই। কিন্তু, পাপকেও যে আমার বড্ড ভয়! আবার যে জন্ম নিতে হবে, আবার যে ভুগতে হবে এই নরক যন্ত্রণা। তাই যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না—একদিন তুমিও আমাকে মা বলে ডেকেছিলে! আমি যদি তোমার ভাল-মন্দর কথা না ভাবি, তাহলে আমার যে নরকেও স্থান হবে না। দিন আমার ঘনিয়ে এসেছে; কিন্তু, নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজতে পারছি না তোমাদের কথা ভেবে ভেবে। বাবা আমার একটামাত্র ব্যঞ্জনও নুনে পুড়ে গেছে। তবুও সন্তান তো বটে! তাই ওর ভাল-মন্দর দায়-দায়িত্ব আমি তোমাকেই দিচ্ছি বাবা! তুমি ওকে বাঁচাও! তুমি ছাড়া ওকে সুখী করবার আর যে কেউ নেই···

চিঠি পড়ে নীলিমা সবিস্ময়ে মুখ তুলল। দেখল দিব্যেন্দুর মুখের অবস্থা ইতিমধ্যে আরও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

দিব্যেন্দুও তখন আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, নিজেকে ঠিক রাখবার জন্যে। ব্যাপারটা যে কোন দুঃস্বপ্ন নয়, কষ্ট-কল্পনার বিষয় নয়, নিতান্তই একটা সাধারণ ঘটনামাত্র—কেবল সেই কথাটা প্রমাণ করবার জন্যেই সে যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু—

দেহটা আর যেন তার আয়ত্তের মধ্যে থাকতে চাইছিল না। অথচ—

শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে আবার যদি সে সেই শিশিটা বার করে বিছানা হাতড়ে, তাহলে—

নীলিমার দিকে তাকাল দিব্যেন্দু। চোখে মুখে তার অসীম উৎকণ্ঠা। তারই জন্যে—

আগন্তুকের দিকেও লক্ষ্য করল দিব্যেন্দু। চোখের ভাষায় তার প্রকট হয়ে উঠেছিল—আবেদন। প্রার্থনা পূরণের আবেদন। সে আবেদন প্রতিদ্বন্দ্বীর নয়—প্রার্থীর।

—আপনিই তো ঋষিবাবুর ভাইপোকে পড়াতেন? দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল যুবককে, নাম কি আপনার?

—ইন্দ্রনাথ রায়।

—রায়। কি রায়? কি গোত্র আপনার?

—গোত্র? তা তো জানি না—

—জানেন না? কোন শ্রেণীর আপনারা? রাঢ়ী না বারেন্দ্র?

—আমরা,—প্রামাণিক।

—বেশ। একটু থেমে দিব্যেন্দু আবার জিজ্ঞাসা করল, ট্যুইশানি ছাড়াও আর কিছু করেন নাকি?

—চাকরির চেষ্টা করছি।

—দেশে নিশ্চয়ই জমি-জায়গা বাড়ি-ঘর আছে?

—জমি নেই, তবে বাড়ি আছে একটা।

—বেশ। আবার একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল দিব্যেন্দু, আপনাদের ওখানে কোন স্পেশাল-ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছেন নাকি?

—আছেন একজন।

—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন?

—করেছি।

—তবে আর কি! বালিশের ওপর হেলে পড়ে দিব্যেন্দু বলল —এখন বলুন, আমি আর কি করতে পারি আপনাদের জন্যে?

ইন্দ্রনাথ কি যেন একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

—বলুন। সঙ্কোচ করছেন কেন?

—ওই চিঠিখানার···একটা জবাব যদি দেন···

—জবাব! জবাব দিতে হবে দিব্যেন্দুকে! বেশ, জবাবই দেবে সে! বলল, কলম আছে?

ইন্দ্রনাথ কলম দিল। তখন সেই চোতা কাগজটারই একাংশ ছিঁড়ে নিয়ে কাঁপা হাতে লিখল দিব্যেন্দু—নীলিমা দেখল—

শ্রীচরণেষু,

মা ভবিতব্য (ভবিতব্য কথাটা লিখেই আবার কেটে দিল) আপনার কন্যার সঙ্গে ইন্দ্রনাথবাবুর বিবাহ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করছি (মনে করছি কথা দুটোও আবার কেটে দিল) আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রণামান্তে, দিব্যেন্দু শর্মণঃ

—এই নিন। চিঠি দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, এখন তো আপনার অনেক কাজ! আসুন তাহলে। নমস্কার।

—নমস্কার। ইন্দ্রনাথ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ল দিব্যেন্দু।

ঘটনাটা যে কি ঘটল, বুঝেও বোঝবার চেষ্টা করল না নীলিমা। এগিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে বসে পড়ল দিব্যেন্দুর শিয়রে। বলল, শরীরটা কি বড্ড খারাপ করছে?

—না না, শরীর খারাপ করবে কেন? একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে চোখ খুলল দিব্যেন্দু। বলল, তবে, বড্ড যেন ঘুম পাচ্ছে—

—ঘুমিয়ে পড়ুন তাহলে। বলে, নীলিমা একটা হাত রাখল তার কপালে।

দিব্যেন্দু বোধহয় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। নীলিমা আরও কিছুক্ষণ বসে রইল তার মুখের দিকে তাকিয়ে।—চিঠির মর্মার্থটা সে বুঝেও

বুঝতে চাইছিল না ; কিন্তু দিব্যেন্দু যা করল তার সব কিছুই সে মর্মে মর্মে অনুভব করছিল—

বিচিত্র সে অনুভূতি। বড় কষ্টকর···বেদনার বিষে তার বিপ হয়···সর্বস্ব। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায় ভূত ভবিষ্যৎ—ব্যা হয় শুধু বর্তমান। কোলের কাছে পড়ে থাকা ওই বিরাট দেহা মধ্যে যে অজানা অচেনা দুর্বোধ্য জিনিষটা এখনও স্পন্দিত হ স্তিমিত গতিতে, তারই স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টায় বিপর্যস্ত হয় ও অন্তরাত্মা। বিকার দেখা দেয় নির্বিকার চিরকালিনীর মনে। শে ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে সে—

কিন্তু, পালানো হয় না তার। প্রতিবন্ধক হয় তার প্রবৃ দুর্ঘটনা নিরোধের প্রবৃত্তি। নীলিমা পালাতে গিয়েও থমকে দাঁড়া

সিঁড়ির প্যাসেজটাতে আলো ছিল না ; কিন্তু স্পষ্ট দেখ পেল সে, কে যেন চট্ করে সরে গেল ওদিক পা হাফ প্যাণ্ট পরা বাহাদুর নয়—অন্য কেউ।—কে ?

নীলিমা আগে গেল রান্নাঘরে। দেখল, বাহাদুর এক ম পোকার চালাচ্ছে ষ্টোভে। লাইব্রেরী ঘরের দরজা তালাব কেবল, ভেজান রয়েছে ল্যাবরেটারীর দরজাটা।

অন্ধকারে, অতি-সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে সে আচমকা সাপটে প ধরল শাদা মূর্তিটাকে।

—মাগো! সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলের ওপর থেকে সশব্দে ছিট পড়ল একটা পেতলের দাঁড়ি-পাল্লা।

আর্তনাদটা অস্পষ্ট হলেও, দাঁড়ি-পাল্লার পতন-শব্দটা বৃথা ে না। বাহাদুর যেন ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দোতলা থেকে ছু এল বিভূতি। দিব্যেন্দুও উঠে বসেছিল বিছানার ওপর।

—কী ব্যাপার? বিভূতি উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করল, কি শব্দ হলো? ও কি করছে এখানে?

—ও কিছু নয়, গেলাসটা পড়ে গেল হাত থেকে। নীলি

বিভূতির উদ্দেশে বলল, যাবার আগে অঞ্জু প্রণাম করতে এসেছিল ওঁকে। চলুন, নীচে যাই।

—আশ্চর্য বিবেচনা বটে! অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিভূতি বলল, সদরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, এদিকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সারা বাড়ি··· আর উনি প্রণাম করতে এলেন একেবারে শিরে সংক্রান্তি নিয়ে! সমস্ত দিনের মধ্যে প্রণাম করবার আর সময় হলো না? চলো চলো, শীগগীর চলো। দাদা, আমরা আজ আসি। আবার পরশু আসছি আমি।

অঞ্জলির আর প্রণাম করা হলো না; স্বামীর টানে তাকে নীচে নেমে যেতে হলো তাড়াতাড়ি।

নীলিমা যেতে পারল না দিব্যেন্দুর জন্যে। চোখদুটো তার তখন জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছিল।

দিব্যেন্দু হাত বাড়াল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, ওটা দাও—

অঞ্জলির হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সেই সাংঘাতিক এ্যাসিডের বাহারে বোতলটা তখনও আঁকড়ে ধরেছিল নীলিমা। এবার আঁচলের তলায় লুকোল। বলল, না—

—না?

—না।

—দেবে না?

—না—বলেই নীলিমা হুমড়ি খেয়ে পড়ল দিব্যেন্দুর ঢলে-পড়া দেহটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গেই—

সাড়া পড়ে গেল সারা হনুমান হাউসে—বাহাদুরের আর্তনাদে।

রাত ক্রমে গভীর হয়—

কালরাত্রি তার প্রহর অতিক্রম করে দণ্ড-পল-মুহূর্তের নির্দেশে কিন্তু ধৈর্য হারায় হনুমান হাউসের বাসিন্দারা—অসহ্য উৎকণ্ঠায়—।

ওপরওয়ালার অসাড় দেহটাকে ঘিরে অপেক্ষা করে ওরা।

আর কতক্ষণ ?

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় ওদের। তারপর—

সাড়া জাগে অসাড় দেহে। দিব্যেন্দু অনুভব করে, তার মাথার মধ্যে কেমন যেন কী একটা হচ্ছে। হেভি ডোজের মরফিন নিলে যেমন হয়।

চেষ্টা করে মাথায় হাত দেয় সে। হাত পড়ে আর একটা হাতের ওপরে। শিরা-সর্বস্ব সেই শীর্ণ হাতের স্পর্শ কোমল নয়—কিন্তু, বড় শীতল, বড় শান্তির। সাগ্রহে মুঠো করে ধরে সে হাতটা।—যেন একটা বানভাসি মানুষ তার নিশ্চিত পরিণামের সম্মুখীন হয়েও নিশ্চিন্ত হয় ক্ষণেকের তরে। হাঁফিয়ে উঠে বলে, তুমি···তুমিও চলে যাবে না তো ?

—না। রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হয়।

শুনে, সত্যিই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বোজে সে।

শেষ